ম্যাক্সিম গোর্কী

অনুবাদ—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পূরবী পাবলিশার্স

প্রকাশক :
গিরীন চক্রবর্তী
পুরবী পাবলিশার্স
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

জানুয়ারী—১৯৪৮

মূল্য— ৩৷৷০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭৷৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

পুস্তকটি গোর্কীর আত্মচরিত In the world-এর অনুবাদ। সাহিত্যক্ষেত্রে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম্-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ম্যাক্সিম গোর্কী। সোভিয়েট সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই গোর্কী এই সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী সাহিত্যাদর্শে পৌঁছেছিলেন। সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে রুশিয়ার জীবনাদর্শ এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হল—তা হল সমাজতান্ত্রিক সংগঠন সমস্যা। সমাজতান্ত্রিক জীবনের বনিয়াদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সাহিত্য হল সবচেয়ে বড় আয়ুধ।

সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যাদর্শ হল তাই এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু নতুন হলেও এ আদর্শ ভূঁইফোড় নয়। নবীন রচনাশৈলির স্রষ্টারা সবাই গত উনবিংশ শতকেই প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। বিদ্রোহী দলের অনেকেই উত্তরকালে বিভ্রান্ত ডেকাডেন্সের পরিপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—একথা সত্য। কিন্তু বিদ্রোহী গোর্কীর হৃদয়ে প্রাচীন সাহিত্যিকদের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা।

১৯৩৪ সালের নিখিল রুশ সোভিয়েট লেখকদের সম্মেলনে তিনি বলেছেন: "আর্ট শুধু প্রকৃতির প্রতিবিম্বই নয়। জীবনের গতি পরিবর্তনের পথে এর একটি সক্রিয় অংশও আছে। এ আর্টের সৃষ্টি তখনই সম্ভব—যখন স্রষ্টা—জীবনস্রোতে আত্মনিমজ্জন করে জনসাধারণের জীবনের ধারা পরিবর্তন করতে এগোন।" তাঁর নিজের জীবনে এ আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। রুশদেশের প্রত্যেকটি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ।

তাই তাঁর সাহিত্যাদর্শ মানবতার ছোঁয়াচে ভাস্বর। অথচ শ্রেণীগত সমাজে প্রতিপদে সেই মানবতা হচ্ছে ব্যাহত আর খণ্ডিত। দারিদ্র্য আর ব্যর্থ শ্রমের ভারে সে ন্যুব্জদেহ স্বল্লায়ু! বেদনাক্লিষ্ট ব্যথাতুর এই ধরণী। তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "দুঃখ কষ্টই হল এ জগতের চরম লজ্জা—তাকে রোমাঞ্চকর করে দেখায় নেই কোন সার্থকতা। মানুষ যেন তাকে ঘৃণা করতে শেখে আর প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঘটাতে পারে তার বিলোপ।"

রুশ রোমান্টিক কবিদের জীবনবিমুখ অসহায়তাকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন সর্বদাই। বুর্জোয়া সমাজের ধনৈশ্বর্যের ইন্দ্রজালে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বহু সাহিত্যিকই সে মোহবিচ্যুতি ঘটাতে অপারগ। সমাজসচেতন না হওয়াতেই তাঁদের এই অসামর্থ্য। মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশ করতে হলে এ বিভ্রান্তি ঘোচাতে হবেই। তাই তিনি কোন ক্ষেত্রেই সমাজবিমুখিতার প্রশ্রয় দেন নি। জীবনের প্রতিটি দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখিয়েছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের হাত থেকে মুক্তির উপায় রয়েছে বিপ্লবে—সংস্কারে নয়। তাই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের ঘুণেধরা সৌধের বিশ্লেষণে তিনি এত তীব্র, এত কঠোর। ন্যায় ও বুদ্ধির হাতিয়ার আছে মানুষের—তারই সাহায্যে সে স্থান করে নেবে মোহাচ্ছন্ন গলিত বুর্জোয়া সমাজে। ন্যায় ও বুদ্ধির সাহায্যেই তাকে অস্বীকার করতে হবে ডেকাডেন্সের আলিঙ্গন থেকে। আর্টের স্বাধীনতা তিনি স্বীকার করেছেন চিরদিন—

কিন্তু কোন দিন যা মানেন নি তা হল আর্টের নামে ব্যাভিচার।

তাঁর জীবনাদর্শের মূলে ছিল কায়িক পরিশ্রম—সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুইই। শোষণ মুক্ত পরিশ্রমী জীব দেখারই কামনা নিয়ে তিনি ১৯১৬ সালে বলেছিলেনঃ পৃথিবীকে উল্টে ফেলতে আর্কিমিডিস্ যে ভারক্রম চেয়েছিলেন তা হচ্ছে মুক্ত মানুষের শ্রমক্ষমতা!”

তাই তাঁর আত্মজীবনীতে রয়েছে একদিকে সমাজের মুখোস ছেঁড়বার দুর্নিবার প্রয়াস আর সেই সঙ্গে ফল্গু-ধারায় প্রবাহিত বিশুদ্ধ মানবপ্রেম ও মুক্ত শ্রম ক্ষমতার জয়গান!

অনুবাদের নামকরণ করেছেন সুসাহিত্যিক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। নানা কারণে পুস্তক প্রকাশের বিঘ্ন ঘটেছে। সেজন্য পাঠকবর্গের মার্জনা ভিক্ষা করছি। ইতি।

কলিকাতা
মাঘ ১৩৫৪

প্রকাশক

তাই আমি শহরের বড় রাস্তাটির ধারে একখানি শৌখিন জুতোর দোকানের "ছোকরা" হয়ে বেরিয়ে পড়লাম পৃথিবীর পথে।

আমার মনিবটি ছিলেন ছোট-খাট, গোলগাল মানুষটি। তাঁর মুখখানা ছিল লালচে, এবড়ো-থেবড়ো, দাঁতগুলো সবুজ, চোখ দুটো তরল, ঘোলাটে। প্রথমে মনে করলাম, তিনি অন্ধ। আমার অনুমান ঠিক কি না দেখবার জন্য মুখভঙ্গি করলাম।

তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "ভেংচি কেটো না।"

সেই নিস্প্রভ চোখ দুটো যে আমাকে দেখতে পায় এই চিন্তাই আমার কাছে হয়ে উঠলো অস্বস্তিকর। আমার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হচ্ছিল না যে, ব্যাপারটা সত্যই তাই। কিন্তু এটাও কি সম্ভব নয় যে, তিনি আমার মুখভঙ্গিটা অনুমান করেছেন?

মোটা ঠোঁট দুখানা এক রকম না নেড়েই তিনি আবার বললেন, "তোমাকে ভেংচাতে বারণ করলাম না?"

—"হাত চুলকো না। তুমি শহরের বড় রাস্তার ধারে একখানি সেরা দোকানে চাকরি করছো, একথা ভুলো না।

ছোকরাকে দরজায় মর্মর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।" তাঁর শুকনো কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে আমার কানে এলো।

মর্মর-মূর্তি কি রকম আমি জানতাম না; আর, আমার হাত না চুলকেও উপায় ছিল না। কেননা হাত দু'খানা ফুশকুড়ি ও ঘায়ে একেবারে ভরে গিয়েছিল। পোকায় তাদের আর কিছু রাখে নি।

আমার মনিব হাত দুখানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "যখন বাড়ি থাকতে তখন কি কাজ করতে?"

কি কাজ করতাম বললাম। একেবারে গোড়া-ঘেঁসে-ছাঁটা পাকা চুলে ভরা গোল মাথাটা ঝাঁকিয়ে তিনি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, "ন্যাকড়া কুড়োতে! আরে ও কাজটা যে ভিক্ষে কি চুরির চেয়েও খারাপ।"

জানালাম, বেশ গর্বের সঙ্গেই, "কিন্তু চুরিও করতাম।"

তাতে হাত দু'খানা টেবিলের ওপর রেখে ঠিক বিড়ালের মতো থাবা তুলে, শঙ্কিত মুখে, চোখ দুটো আমার মুখে নিবদ্ধ করে তিনি বলে উঠলেন, "কি—ই-ই-ই? কি রকম করে চুরি করতে?"

বর্ণনা করলাম কেমন করে কি চুরি করতাম।

বললেন, "আরে, ওগুলোকে আমি নষ্টামী ছাড়া আর কিছুই বলি না। কিন্তু তুমি যদি আমার জুতো কি টাকা চুরি করো তাহলে আমি তোমায় জেলে দেব। সেখানেই তোমাকে রাখবো সারা জীবন।"

কথাগুলি তিনি শান্তভাবে বললেন। আমার ভয় হলো। তখন থেকে তাঁকে আর আমার ভাল লাগে নি।

মনিব ছাড়া দোকানে ছিল শাসকা জাকব, আমার মামাতো ভাই। সে সেখানে চাকরি করতো। আর একজন ছিল। সে আমাদের ওপরওয়ালা। লোকটি ছিল দক্ষ, তেল চুকচুকে। তার মুখখানা ছিল লাল। শাসকার চেহারা ও পোশাক তখন বদলে গিয়েছিল। দেমাকে সে আমার দিকে ফিরেই তাকাতো না।

দাদামশায় যখন আমার মনিবের কাছে আমাকে আনেন তখন শাসকাকে বলেছিলেন আমায় দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে। সে তাতে ভ্রূকুটি করে ভারিক্কী চালে, শাসিয়ে বলে, "তাহলে আমি ওকে যা বলবো তাই করতে হবে।"

আমার মাথায় হাত দিয়ে দাদামশায় জোর করে আমার ঘাড় নুইয়ে বলেন, "ও তোমার চেয়ে বয়সে আর অভিজ্ঞতায় বড়। ওর কথা তোমায় শুনতে হবে।"

আর, শাসকাও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "দাদামশায় যা বললেন ভুলো না।"

সে অবিলম্বেই তার শ্রেষ্ঠতার সুযোগ নিতে লাগলো।

তার মনিব তাকে বলতেন, "কাশিরিন, অমন পেঁচার মতো চোখ করে তাকিও না।"

শাস্‌কা মাথা নিচু করে বলতো, "আমি—আমি কিছু করছি না।"

কিন্তু মনিব তাকে রেহাই দিতেন না। বলতেন, "গুঁতিও না। খদ্দেররা মনে করবে তুমি একটা ছাগল।"

আমাদের ওপরওয়ালা কর্মচারীটি মুচ্কি হাস্য করতো,

মনিবের ঠোঁট দু'খানা বিকট হাসিতে লম্বা হয়ে যেত, আর শাসকার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠতো। সে সরে পড়তো কাউনটারের পিছনে। আমি এইসব কথাবার্তার ধরনটা পছন্দ করতাম না।

তারা যেসব শব্দ ব্যবহার করতো সে-সবের অনেকেরই অর্থ ছিল আমার কাছে দুর্বোধ্য। কখন কখন মনে হত তারা অপরিচিত ভাষায় কথা বল্‌ছে। দোকানে কোন মহিলা ক্রেতা এলে মনিব পকেট থেকে হাত বার করে গোঁফে চাড়া দিয়ে মুখে মিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। তাতে তাঁর মুখখানা কুঁচকে যেত কিন্তু চোখের ভাব বদলাতো না। আমাদের ওপরওয়ালা কর্মচারীটি সোজা হয়ে দাঁড়াতো, কনুই দুটো লাগিয়ে রাখতো প্রায় তার গায়ের দুপাশ ঘেঁসে আর কব্জি দুটো সম্ভ্রমে দুলতো। শাস্‌কা তার ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো ঢাকবার জন্য পিট্‌ পিট্‌ করে তাকাতো। আর আমি দরজায় দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে হাত চুলকোতে চুলকোতে বিক্রয়-পর্ব দেখতাম।

ক্রেতাটির সামনে কর্মচারীটি হাঁটুগেড়ে বসে তার কৌশলী আঙুলগুলোর সাহায্যে জুতো পরাতো। সে এমন সন্তর্পণে স্ত্রী-লোকটির পা স্পর্শ করতো যে তার হাত দুখানা কাঁপতো, পাখানি ভেঙে যাবে যেন এই ভয়। কিন্তু সে পা ভাঙবার সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। তা দেখাতো গলা নিচের দিকে উল্টানো বোতলের মতো।

একদিন এই সব মহিলাদের একজন চীৎকার করে পা সরিয়ে নিতে নিতে বলে উঠলেন, "তুমি আমার পায়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছ।"

কর্মচারীটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, "আপনি খুব স্পর্শকাতর বলে এমন হল।"

তাকে এই সব ক্রেতাদের এমন সস্তা খোশামোদ করতে দেখতে মজা লাগতো।...

এমনটা প্রায়ই ঘটতো। কর্তা শাস্‌কাকে নিয়ে দোকানের ভেতরের দিকে ছোট ঘরটায় চলে যেতেন। তখন কর্মচারীটি ও খরিদ্দারটি দোকানে থাকতো, একা। একবার সে একটি ক্রেতার পায়ের কাছে বসে থাকতে থাকতে তার একখানি পা দু'আঙুলে তুলে তাতে চুমো দেয়।

স্ত্রীলোকটির মাথার চুলগুলি ছিল লাল। তিনি বলে ওঠেন, "কি স্পর্ধা তোমার!"

আর কর্মচারীটি গাল দুখানা ফুলিয়ে একটা লম্বা শব্দ করে, "ও—ও—ও—ও।"

তাতে আমি এত হাসি যে, যাতে পা ঠিক রাখতে পারি সেজন্য দরজার হাতল ধরে আমাকে ঝুলতে হয়েছিল। ঠিক তখনই দরজাটা যায় খুলে, আর আমার মাথা গিয়ে লাগে দরজার একখানা শার্সিতে। তাতে সেখানা যায় ভেঙে। কর্মচারীটি আমাকে তেড়ে আসে; মনিব আমার মাথায় তাঁর ভারি সোনার আংটিটা দিয়ে গাঁট্টা মারেন আর শাসকা আমার কান মলে দেবার চেস্টা করে। সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি যাবার পথে সে কঠোরভাবে বলে, "এই ধরনের কাজ করবার ফলে তুমি চাকরিটা হারাবে। বলতো শুনি, এর মধ্যে হাসির কি আছে!...মহিলাদের চোখে যদি কর্মচারীটি ধরে যায় তাহলে ব্যবসায় লাভ। এটা হল

বুটজুতোর দোকান। কোন মহিলার বুটজুতোর দরকার না হতে পারে, কিন্তু যাকে তাঁর ভাল লাগে তাকে দেখবার জন্যে তিনি দোকানে আসবেন আর যা তাঁর দরকার নেই তা কিনবেন। কিন্তু তুমি—তুমি বুঝতে পার না! একজন তোমার জন্যে খেটে সারা হয় আর—"

তার কথায় আমি জ্বলে উঠি—কেউই আমার জন্য খেটে সারা হত না—সে তো আদৌ নয়।

সকালে রাঁধুনীটা আমাকে শাস্কার আগে ডেকে তুলতো। এই স্ত্রীলোকটি ছিল রুগ্ন। তাকে আমার আদৌ ভাল লাগতো না। উঠে আমাকে মনিবের জুতো পরিষ্কার ও পোশাক বুরুশ করতে হতো; কর্মচারীটি ও শাসকা স্যামোভার প্রস্তুত করতো, সমস্ত স্টোভের জন্য জ্বালানী কাঠ আনতো, সব ধুয়ে-মুছে রাখতো। আমি দোকানে গিয়ে দোকান-ঘর ঝাঁট দিতাম, ধুলো ঝাড়তাম, চা তৈরি করতাম, খরিদ্দারদের কাছে মাল-পত্র নিয়ে যেতাম, বাড়ি গিয়ে খাবার আনতাম। তখন দরজায় আমার জায়গায় শাসকা দাঁড়িয়ে থাকতো। কিন্তু কাজটা তার মর্যাদার পক্ষে হীন বলে আমাকে ধমকাতো, "কুড়ে হতভাগা! তোমার সব কাজ আমাকে করে দিতে হয়।"

এই জীবনটি ছিল আমার পক্ষে ক্লান্তিকর, বৈচিত্র্যহীন। আমি অভ্যস্ত ছিলাম কুনাভিনের বালুময় পথে, কর্দমাক্ত ওকার তটভূমিতে, প্রান্তরে বা বনে প্রভাত থেকে রাত্রি অবধি বন্ধনহীন মুক্ত জীবন যাপনে। দিদিমা ও আমার সাথীদের সঙ্গ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কথা

বলবার মতো একটি লোকও আমার ছিল না ; জীবন আমার সামনে তুলে ধরছিল তার অলীকতাময় অংশ। এমন অনেক সময় হত যখন কোন ক্রেতা কিছুই না কিনে চলে যেত। তখন ওই তিন জন নিজেদের অপমানিত বোধ করতো। কর্তা তখন তাঁর মুখের মিঠে হাসি ঢেকে বলতেন, "কাশিরিন, জিনিসগুলো তুলে ফেল।" তারপর গজ গজ করতেন, "শূয়রণী কোথাকার! বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই আমাদের দোকানে এসে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। তুমি যদি আমার স্ত্রী হতে তোমায় দিতাম ঘা কতক!"

তাঁর স্ত্রীটির চেহারা ছিল শুকনো, চোখ দুটো কালো, নাকটা বড়। তিনি কর্তাকে করে রেখে ছিলেন পাপোষের মতো। তাঁকে এমন ভাবে বকতেন যেন তিনি চাকর।

কোন বাঁধা খরিদ্দারকে তিনি বিনম্র অভিবাদন ও মিষ্ট কথায় বিদায় করে এসে তিন জনে তাঁর সম্বন্ধে অতি কুৎসিৎ ও নির্লজ্জ আলোচনা করতেন। তখন আমার মনে হতো ছুটে পথে বেরিয়ে গিয়ে তাঁরা যেসব কথা বলছেন সে সব তাঁকে বলি। অবশ্য এটা জানতাম যে, লোকে আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করে। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকের সম্বন্ধেই বিশেষ অপমানজনক কথা-বার্তা বলতেন যেন তাঁরাই প্রথম শ্রেণীর মানুষ, পৃথিবীর আর সকলকে বিচার করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকেরই প্রতি ছিল তাঁদের ঈর্ষা। তাঁদের মুখে কারো প্রশংসা শুনি-নি। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু খারাপ তাঁরা জানতেন।

একদিন দোকানে এলেন এক তরুণী। তাঁর গাল দু'খানি প্রস্ফুটিত গোলাপ-রাঙা, চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়ে মখমলের ক্লোক, গলায় পশমের কলার। পশমের মাঝ থেকে তাঁর মুখখানি উঠেছিল একটি চমৎকার ফুলের মতো। তিনি ক্লোকটা খুলে শাসকার হাতে দিলে তাঁকে দেখাতে লাগলো আরও সুন্দর। তাঁর সুঠাম দেহটি নীল রেশমের পোশাকে ছিল আঁটা। কানে ঝলমল করছিল হীরার দুল···যেন তিনি একটি উজ্জ্বল আলো এমনি ভাবে সামনে নত হয়ে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে দোকানের সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তিন জনেই উন্মত্তের মতো দোকানের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কাবার্ডে তাঁদের প্রতিবিম্ব নাচতে লাগলো। কিন্তু তিনি যখন তাড়াতাড়ি এক জোড়া খুব দামী বুট কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন তখন কর্তা চুক্ করে ঠোঁটের শব্দ করে, শিষ দিয়ে বলে উঠলেন, "কুকুরের বাচ্চা!"

কর্মচারীটি অবজ্ঞাভরে বললেন, "অভিনেত্রী—এতেই ওর সব কিছু বোঝালো।" তারপর তাঁরা মহিলাটির প্রণয়ীদের সম্বন্ধে ও তিনি যে বিলাসিতার মধ্যে বাস করেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

খাওয়ার পর কর্তা গেলেন দোকানের ভিতর দিকে ছোট ঘরখানিতে ঘুমোতে, আর আমি তাঁর সোনার ঘড়িটি খুলে তার কলকব্জার মধ্যে ঢেলে দিলাম ভিনিগার। তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে ঘড়িটা হাতে নিয়ে দোকানের মধ্যে বলতে বলতে এলেন, "কি হতে পারে? আমার ঘড়িটা একেবারে

ভিজে গেছে। আগে এরকম কখন হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। এটা একেবারে ভিজে গেছে—একদম নষ্ট হয়ে যাবে।” তখন আমার কি আনন্দ!

দোকানের ও বাড়ির কাজের বোঝার সঙ্গে নিরুৎসাহের ভারে আমি নুয়ে পড়তাম। সময় সময় মনে হত যদি খুব খারাপ ব্যবহার করি তাহলে ভালই হবে। তাতে আমাকে কাজ থেকে দেবে ছাড়িয়ে। দেখতাম দোকানের দরজার সামনে দিয়ে নিঃশব্দে লোক চলেছে। তাদের গায়ে মাথায় তুষার। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা চলেছে কারো অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানে। তারা সংকল্প করেছিল দলের সঙ্গে একেবারে কবর অবধি যাবে কিন্তু কোন কারণে কোথাও আটকে পড়েছিল—মিছিলে যোগ দিতে দেরি হয়ে গেছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি চলেছে কবরস্থানে। তুষারপাতের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে ঘোড়াগুলো কাঁপছে। প্রত্যহ দোকানের পিছনদিকে গির্জা থেকে ঘন্টা বাজতো করুণ ধ্বনিতে। তখন লেনট-পর্ব! (বার্ষিক চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাস। খ্রীস্ট যে উপবাস করেছিলেন তারই স্মরণে।)…একদিন আমি যখন দোকানের সামনে চত্বরে সদ্য আগত একটি নূতন মালের বাক্স খুলছি গির্জার বুড়ো চৌকিদারটি সেখানে এলো। তার শরীরটা ছিল বাঁকা আর এমন নরম যেন ন্যাকড়ার তৈরী, পোশাকটাও এমন ছিন্ন-ভিন্ন যেন কুকুরে টেনে ছিঁড়েছে। সে আমার কাছে এসে বললে, “তুমি আমাকে কিছু অনুগ্রহ করবে? আমার জন্যে কয়েকটা গ্যালোশ (বর্ষার সময় জুতোর ওপরে যে জুতো পরা হয়) চুরি করবে?”

আমি চুপ করে রইলাম। সে খালি বাক্সটার ওপর বসে হাই তুললে···আবার বললে, "আমার জন্যে ওগুলো চুরি করবে কি ?"

জানালাম, "চুরি করা অন্যায়"।

—"কিন্তু তবুও লোকে চুরি করে। বুড়ো বয়সের কিছু খেসারৎ চাই বৈকি"।

আমি যাদের মধ্যে বাস করতাম সে তাদের চেয়ে ছিল পৃথক ধরনের। বুঝলাম, আমি যে চুরি করতে প্রস্তুত সে বিষয়ে তার মনে মনে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তাকে জানলা দিয়ে গ্যালোশগুলো দিতে সম্মত হলাম।

সে কোন উৎসাহ না দেখিয়ে শান্ত ভাবে বললে, "বেশ। তুমি তো আমাকে ঠকাচ্ছো না ? না, দেখছি ঠকাচ্ছো না।"

সে নোংরা, জোলো তুষারটা বুটের তলা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে খানিক নীরব রইলো। তারপর একটা লম্বা পাইপ ধরিয়ে হঠাৎ আমাকে চমকে দিলে, "কিন্তু ধর যদি আমিই তোমাকে ঠকাই ? ধর আমি যদি গ্যালোশ জোড়া তোমার মনিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলি, তুমি সে দুটো আমাকে আধ রুবলে বেচেছ! তখন কি হয় ? ওর দাম হচ্ছে দু রুবল আর তুমি বেচেছ আধ রুবলে! উপহারস্বরূপ, অ্যাঁ ?"

আমি বোবার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হলো, সে যা করবে বলেছে, তা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। সে তার বুটের দিকে তাকিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নাকি সুরে বলে যেতে লাগলো, "ধর,

যেমন, তোমার মনিব হয়তো আমাকে বলেছেন, ওই ছোকরাটা চোর কি না পরীক্ষা করে দেখতো। তখন কি হবে?”

আমি ভয়ে, রাগে বললাম, “তোমাকে গ্যালোশ দেব না।”

—“যখন প্রতিজ্ঞা করেছো তখন দিতেই হবে।”

সে আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে বললে, “তোমার ‘এটা নাও, ওটা নাও’, এ কথাগুলোর মানে কি?”

—“তুমি নিজেই আমার কাছে চেয়ে ছিলে।”

—“আমি তোমাকে অনেক কিছু করতে বলতে পারি। আমি তোমাকে গির্জা থেকে চুরি করতেও বলতে পারি। তুমি কি মনে কর, সকলকেই বিশ্বাস করতে পার?”

তারপর সে আমাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, “আমি চোরাই গ্যালোশ চাই না। আমি ভদ্রলোক নই, গ্যালোশ পরি না। আমি তোমাকে নিয়ে কেবল মজা করছিলাম। তুমি সরল। তোমার এই সরলতার জন্যে ঈস্টারের সময় আমি তোমাকে ঘণ্টাঘরে উঠে ঘণ্টা বাজাতে দেব। সেখান থেকে শহরটা দেখ।”

বললাম “আমি শহরটা দেখেছি।”

—“ঘণ্টাঘর থেকে আরও ভাল দেখায়।”

তুষারের ওপর দিয়ে বুট ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে সে গির্জার কোণের দিকে ঘুরে গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে নিরুৎসাহে ভাবতে লাগলাম, বৃদ্ধ সত্যই আমাকে নিয়ে মজা করছিল, না, আমার মনিব আমাকে পরীক্ষা করতে তাকে পাঠিয়ে

ছিলেন? দোকানে ফিরে যেতে আমার মন চাইলো না। শাসকা ব্যস্ত হয়ে এসে চীৎকার করে বললে, "তোমার কি হয়েছে?"

আমি হঠাৎ রাগে তার দিকে সাঁড়াশিটা ঝাঁকালাম। জানতাম সে ও সহকারীটি চুরি করতো। তারা এক জোড়া বুট বা চটি নিয়ে স্টোভের নলের মধ্যে লুকিয়ে রাখতো। তারপর দোকান থেকে বাড়ি যাবার সময় ওভারকোটের হাতার মধ্যে লুকিয়ে নিত। আমার এটা ভাল লাগতো না, ভয় হত। কারণ মনিবের শাসানি আমার মনে ছিল।

শাসকাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি চুরি করছো?"

সে বলে, "আমি না ও। আমি কেবল ওকে সাহায্য করি। ও বলে, 'যা বলি তাই কর।' আমি ওর কথামতো কাজ করি। যদি তা না করি ও আমার কোন ক্ষতি করবে। আর মনিবের কথা? উনি নিজেই এক সময় দোকানের ছোকরা ছিলেন, বোঝেন সব। কিন্তু তুমি, তুমি চুপচাপ থাক।"

আমাদের রাঁধুনীটাকে শাসকা ঘৃণা করতো। রাঁধুনীটি ছিল অদ্ভুত। সে মানুষটি ভাল কি মন্দ তা স্থির করা ছিল অসম্ভব।

কালো চোখ দুটো বড় বড় করে মেলে সে বলতো, "সংসারে যা আমি সব চেয়ে ভালোবাসি তা হচ্ছে লড়াই। কি রকমের লড়াই সে সম্বন্ধে আমার মাথাব্যথা নেই—মোরগের লড়াই, কুকুরের লড়াই বা মানুষের লড়াইও হতে পারে। আমার কাছে সবই সমান।"

চত্বরে মুরগী বা পায়রার লড়াই দেখলে সে কাজ-কর্ম ফেলে জানলায় বোবার মতো দাঁড়িয়ে লড়াইটার শেষ

অবধি দেখতো। সন্ধ্যায় সে আমাকে ও শাসকাকে বলতো, "তোমরা কিছু না করে চুপচাপ বসে আছ কেন? মারামারি কর না।"

সে কথা শুনে শাসকা রেগে উঠে বলতো, "আমি খোকা নই, বুঝলে বোকা? আমি দোকানের কর্মচারী।"

—"তাত আমার দেখবার দরকার নেই। যতক্ষণ না বিয়ে করছো আমার চোখে তুমি ততক্ষণ খোকা।"

—"বোকা! নিরেট"—

—"শয়তান চালাক কিন্তু ভগবান তাকে ভালোবাসেন না।"

শাসকার রাগের একটা বিশেষ কারণ ছিল স্ত্রীলোকটির কথাবার্তা। শাসকা তাকে তাই বিরক্ত করতো। কিন্তু সে অবজ্ঞাভরে শাসকার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলতো, "এই গুবরে পোকা, ভগবানের ভুল!"

কখন কখন রাঁধুনীটা যখন ঘুমোত শাসকা তখন আমাকে তার মুখে কালি বা ঝুল মাখিয়ে দিতে বলতো, তার বালিশে ছুঁচ গেঁথে রাখতো অথবা আরও নানা রকমের রসিকতা করতো। তা ছাড়া স্ত্রীলোকটির ঘুম ছিল পাতলা। সে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বেলে বিছানার ধারে বসে ঘরের কোণের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। কখন কখন সে আমার কাছে স্টোভের আড়ালে যেখানে আমি ঘুমোতাম সেখানে এসে ভাঙা গলায় বলতো "আমি ঘুমোতে পারছি না লেকসিয়েকা। আমার শরীর খুব ভাল নয়, আমার সঙ্গে একটু গল্প কর।"

আধঘুমঘোরে আমি কোন্ গল্প বলতাম। সে চুপ করে শুনতে শুনতে এপাশে-ওপাশে দুলতো। আমার কেমন ধারণা ছিল, তার গা থেকে মোমের ও ধূপের গন্ধ বার হয়, সে শীঘ্রই মরবে।···তার বক্ষঃস্থল ছিল না। এমন কি মোটা রাতের পোশাকেও তার পাঁজরার হাড়গুলো দেখা যেত যেন ভাঙা পিপের পাঁজরা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে থাকতে সে বলতো, "যদি আমি সত্যই মরি তাতে কি? এই বিপদ তো সকলেরই হয়।"···অথবা কোন অদৃশ্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতো, "যতকাল বাঁচার কথা বেঁচেছি, বাঁচিনি?"···

শাসকা তার অসাক্ষাতে তাকে বলতো "ডাইনী।"

আমি বলতাম, "ওর সামনে ওকে ও নামে ডাক না কেন?"

—"তুমি কি মনে কর আমি ওকে ভয় করি?" কিন্তু মুহূর্ত পরেই ভ্রূকুটি করে সে আবার বলতো, "না, ওর মুখের সামনে ওকে ও কথা বলতে পারি না। ও সত্যিই ডাইনী হতে পারে।"

রাঁধুনীটি সকলের প্রতিই সমান ভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করতো। কিন্তু রোজ ভোর ছটার সময় আমায় বিছানা থেকে টেনে তুলতো আর চীৎকার করতো, "তুমি কি চির-কাল ঘুমোবে? কাঠ আন। স্যামোভার ঠিক কর! দরজার গায়ের পাতগুলো পরিষ্কার কর।"

শাসকার ঘুম ভেঙে যেত। সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলতো, "অমন গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাচ্ছ কেন? আমি কর্তাকে বলে দেব। তুমি লোককে ঘুমোতে দাও না।"

রান্নাঘরখানার মধ্যে তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করতে করতে সে শাসকার দিকে জ্বলন্ত বিনিদ্র চোখ দুটি ফিরিয়ে বলতো, "ও, তুমি, ভগবানের ভুল! তুমি যদি আমার ছেলে হতে তোমাকে ঘা কতক দিতাম।"

শাসকা তাকে গালাগাল দিত, বলতো "অভিশপ্ত।" দোকানে যাবার পথে সে একদিন আমাকে বললে, "ওকে ছাড়াবার জন্যে আমাদের কিছু করতে হবে। ওর অসাক্ষাতে সব জিনিসে বেশি করে নুন দিয়ে রাখবো। বেশি নুন দিয়ে রাঁধলে ওকে ছাড়িয়ে দেবে। কিন্তু কেরোসিন দিলেও হয়। তুমি হাঁ করে আছ কেন?"

—"তুমি নিজেই কাজটা কর না কেন?"

সে রেগে উঠলো; বললে, "ভীরু!"

রাঁধুনীটি একদিন আমাদের একেবারে চোখের সামনে মারা গেল। সে স্যামোভারটা তোলবার জন্য নিচু হতেই একটি কথাও না বলে মেঝেতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়লো।...তারপর একপাশে ফিরে গেল, হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিল আর তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো।

আমরা দু'জনেই বুঝতে পারলাম সে মরে গেছে, কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তার দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। অবশেষে শাসকা রান্না ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে গেল, আর আমি কি করবো বুঝতে না পেরে জানলার গা ঘেঁসে আলোয় সরে দাঁড়ালাম। মনিব এলেন। ব্যস্ত হয়ে তার পাশে বসে একটা আঙুল দিয়ে তার কপাল স্পর্শ করলেন।

বললেন, "ও মরে গেছে, এ একেবারে নিশ্চিত। কিসে এমন হল?" তিনি ঘরের কোণে গিয়ে বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা করে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "কাশিরিন, শীগগির ছুটে গিয়ে পুলিশকে নিয়ে এস।"

পুলিশ এল। দপ্ দপ্ করে এধার-ওধার করলো, মদ খাবার জন্য টাকা নিল, চলে গেল। তারপর এল একখানা ঠেলা গাড়ি নিয়ে। তারা দেহটার মাথা ও পা ধরে রাস্তায় বার করে নিয়ে গেল। কর্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমায় বললেন, "মেঝেটা ধুয়ে ফেল।"

মনিব বললেন, "ও যে সন্ধ্যা বেলায় মরেছে এ ভালই হয়েছে।"

বুঝতে পারলাম না, কেন ভাল হয়েছে। শুতে গেলে শাসকা আস্তে আস্তে বললে, "আলো নিবিও না!"

—"তোমার ভয় করছে?"

সে কম্বল মুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইলো। গভীর স্তব্ধ রাত্রি, যেন সে কান পেতে কি শুনছে, কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমার মনে হল কোথায় ঘন্টা বেজে উঠলো। আর সারা শহর আতঙ্কে চীৎকার ও হট্টগোল করতে করতে ছুটছে।

শাসকা কম্বলের তলা থেকে নাকটি বার করে আস্তে আস্তে বললে, "চল, দুজনে একসঙ্গে স্টোভের ওপর শুই গে।"

বললাম, "ওখানে গরম।"

একটু চুপ করে থেকে সে বললে, "কি রকম হঠাৎ ও মারা গেল, তাই নয়! আমি নিশ্চিত যে ও ডাইনী ছিল —আমি ঘুমোতে পারছি না।"

—"আমিও পারছি না।"

সে মৃত লোকদের গল্প বলতে লাগলো। বর্ণনা করতে লাগলো তারা কেমন করে কবর থেকে উঠে গভীর রাতে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে বাস করতো সেই জায়গাটি খোঁজে এবং আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করে।

সে আস্তে আস্তে বললে, "মরা মানুষে কেবল শহরের কথাই মনে করতে পারে কিন্তু রাস্তা আর বাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যায়।"

রাত্রি স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হতে লাগলো এবং মনে হতে লাগলো অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। শাসকা মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলে, "আমার ট্রাংকে কি আছে দেখতে চাও?"

আমার অনেক দিন থেকে জানবার ইচ্ছা ছিল সে ট্রাংকে কি লুকিয়ে রেখেছে। ট্রাংকটা সে তালা-চাবি দিয়ে রাখতো আর খুব সাবধানে খুলতো। আমি যদি উঁকি দিতাম তো সে রুক্ষভাবে বলতো, "কি চাও, অ্যাঁ?"

আমি দেখতে চাইলে সে বিছানা থেকে না নেমে আমাকে ভারিক্কী চালে ট্রাংকটা এনে বিছানার ওপর তার পায়ের কাছে রাখতে বললে। চাবিটা ঝুলতো তার দীক্ষা-ক্রশের সঙ্গে গলায়।···কিন্তু ট্রাংকে একখানা চশমার ফ্রেম নানা রকমের বোতাম, কয়েকটি টিনের কৌটো, পেতলের

পিন, জুতোর বকলেশ, কাঁটা-পেরেক, দরজার হাতল, ছড়ির ভাঙা মাথা, মেয়েদের চিরুনি, বশীকরণের বই ও ঐ ধরনের জিনিস ছাড়া আর কিছু ছিল না। জিনিসগুলোর প্রায় সবই সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছিল।

আমি যখন ন্যাকড়া কুড়োতাম তখন একমাসে ওর দশগুণ ভাল জিনিস কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে পারতাম।

শাসকা চশমার ফ্রেমজোড়া চোখে দিয়ে ছিল। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, "এতে কাচের দরকার হয় না। এ বিশেষ ধরনের চশমা। তোমাকে মানাবে না"।

জিজ্ঞেস করলাম "তুমি এসব কেন রেখেছো ?"

সে ফ্রেমের ভেতর থেকে জ্বল্‌-জ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি কিছু চাও ?"

—"না, কিছুই চাই না।"

জিনিসগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে ট্রাংকে আবার রেখে বললে, "দাঁড়াও! বাগানটা শুকোলে তোমাকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যে, তোমার দম আটকে যাবে।"

আমি উত্তর দিলাম না, ঘুমে আমার চোখ ভরে এসেছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে দুহাতে দেওয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলতে লাগলো, "হে ভগবান, আমার ভয় করছে —আমার ভয় করছে। ওটা কি ?"

তার কথা শুনে আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মনে হল যেন রাঁধুনীটাকে চত্বরের দিকের জানলাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সে সার্সিতে কপাল ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে আছে যেমন করে দাঁড়িয়ে সে মোরগের

লড়াই দেখতো। শাসকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দেওয়াল আঁচড়াতে লাগলো। আমি উঠে বহু চেষ্টায় রান্নাঘরের এধার থেকে ওধারে গিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লাম। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে দুজনেই পড়লাম ঘুমিয়ে।

দিনকতক পরে একটি ছুটির দিন পাওয়া গেল। দুপুরে খাবার পর কর্তা গেলেন ঘুমোতে, শাসকা আমাকে চুপি চুপি বললে, "এস।"

বুঝলাম, সে আমাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে সেই অবাক-করা জিনিসটি দেখাতে চায়। দু'জনে বাগানে গেলাম। দু'খানা বাড়ির মাঝখানে একটি সংকীর্ণ জায়গায় দশটি প্রাচীন লাইম গাছ ছিল। গাছগুলোর মোটা গুঁড়ির গায়ে ছিল সবুজ শেওলা, পাতাগুলো কালো, ডালগুলো নির্জীবের মতো ছড়িয়ে। গাছগুলোকে মনে হচ্ছিলো গোরস্থানের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ। এই গাছগুলো ছাড়া বাগানে ঝোপ বা ঘাস কিছুই ছিল না।

শাসকা বেড়ার কোণে একটা লাইম গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। বেড়াটার ওধার থেকে আমাদের দেখা যাচ্ছিল না। সে উবু হয়ে বসে সেখানে যে পাতার স্তূপ ছিল সেটা সরাতেই একটা মোটা শিকড় বেরিয়ে পড়লো। তার পাশে ছিল মাটিতে বসানো দু'খানা ইট। ইট দু'খানা তুলতেই তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়লো খানিকটা টিন। টিনের তলায় ছিল একখানা চৌকো তক্তা। তক্তা সরাতেই দেখলাম একটি গর্ত। গর্তটা চলে গিয়েছিল শিকড়ের তলা অবধি।

শাসকা একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তাতে এক টুকরো মোমবাতি ধরিয়ে গর্তটার মুখে সেটা ধরে বললে, "ভেতরে তাকিয়ে দেখ, ভয় পেও না।"

মনে হলো, সে নিজেই ভয় পেয়েছে।…ভেতরে দেখলাম সেটা একটা খিলানের মত রয়েছে।…তার মধ্যে ছিল একটা মরা চড়ুই। খিলানটাকে সে তৈরি করেছিল একটা ছোট গির্জার মতো। জিজ্ঞেস করলাম, "ভেতরে ওসব জিনিস রেখেছো কেন?"

—"ওটা একটা গির্জা। গির্জার মতো দেখতে নয় কি?"

—"জানি না।"

—"ঐ চড়ুইটা হচ্ছে মরা মানুষ। যে ভাবে মরা উচিত ও সে ভাবে মরে নি। তাই ওর দেহকে ঐ ভাবে রাখতে হবে।"

—"তুমি কি ওকে মরা অবস্থায় পেয়েছিলে?"

—"না। ও ছাপ্পড়ের মধ্যে উড়ে এসেছিল। আমি ওকে টুপি চাপা দিয়ে টিপে মেরে ফেলেছি।"

—"কেন?"

—"আমার খুশি।

তারপর সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে, "ওটা ভাল?"

—"না।"

—"কেন ভাল নয়?"

—"চড়ুইটার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

সে আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমার বুকে মারলে ঘুষি। সেই সঙ্গে বললে, "বোকা

তোমার হিংসে হচ্ছে বলে ওটাকে খারাপ বলছো ; কানাৎনোর বাগানে তোমার যেটা ছিল সেটাই বুঝি ভাল মনে করছো ?”

সেই বাড়িটার কথা আমার মনে পড়ে গেল ; বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, “নিশ্চয়ই সেটা এর চেয়ে ভাল ছিল।”

শাসকা গায়ের কোট খুলে মাটিতে ফেলে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে হাতে থুতু দিয়ে বললে, “তাই যদি হয় আমরা এর জন্য লড়াই করবো।”

আমার মারামারি করবার ইচ্ছা ছিল না। তার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু সে ছুটে এসে মাথা দিয়ে আমার বুকে ঢুঁ মেরে আমাকে চীৎ করে ফেলে দিলে। তারপর আমার ওপর দু'পাশে পা দিয়ে বসে বলে উঠলো, “মরতে না বাঁচতে চাও ?”

কিন্তু তার চেয়ে আমার গায়ে জোর ছিল বেশি ; তার ওপর রাগ হয়েছিল খুব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে দু'হাতে ঘাড় চেপে ধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লো। তার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগলো। আমি ভয় পেয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করলাম। সে আমাকে হাত-পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল। আমি তাতে আরও ভয় পেলাম।

সে মাথা তুলে বললে, “তোমার কি দশা হবে জান ? আমি এমন সব কাজ করে রাখবো যাতে তোমার চাকরি যাবে।”

সে আমাকে অনবরত গালাগাল দিতে লাগলো। তাতে আমি খুব রেগে উঠলাম। ছুটে সেই গর্তটির কাছে গিয়ে

ইট দু'খানা তুলে, কফিনসমেৎ মরা চড়ুইটা টেনে বার করে বেড়া ডিঙিয়ে দিলাম রাস্তায় ফেলে। তারপর গর্তটার মধ্যে আর যা কিছু ছিল টেনে বার করে দু'পায়ে মাড়াতে লাগলাম।

শাসকা বিস্ময়ে আমার দৌরাত্ম্য দেখতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হলো না। আমার দৌরাত্ম্য শেষ হলে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে কোটটা কাঁধে ফেলে শান্ত ভাবে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, "এখন কি হয় দেখ। একটু থাম না! আমি তোমাকে জব্দ করতে ইচ্ছা করে এসব করে রেখেছিলাম। ওটা গুণ করা ছিল। টের পাবে!"

আমি দমে গেলাম যেন তার কথাগুলো আমার দেহে আঘাত করেছে। আমার ভেতরটা হিম হয়ে গেল। কিন্তু তাতে তার শান্ত ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে তুললে। আমি স্থির করলাম, পরদিন শহর থেকে, আমার মনিবের কাছ থেকে, শাসকা ও তার যাদুর কাছ থেকে সেই অসার, অর্থহীন জীবন ছেড়ে পালিয়ে যাব দূরে।

পরদিন সকালে নূতন রাঁধুনীটি আমাকে ডেকে তুলে বলে উঠলো, "ও ভগবান। তোমার মুখে এ কি করেছো?"

বুকখানা দমে গেল; ভাবলাম, "যাদুর গুণ আরম্ভ হয়েছে।"

কিন্তু রাঁধুনীটি এমন দিল খোলা হাসি হাসতে লাগলো যে আমিও অনিচ্ছায় একটু হেসে তার আয়না দিয়ে দেখলাম আমার মুখে পুরু করে ভূষো মাখানো।

জিজ্ঞেস করলাম, "শাসকা একাজ করেছে?"

সে হাসতে হাসতে বললে, "না আমি!"

যখন বুট পরিষ্কার করতে শুরু করলাম তখন তার মধ্যে হাত ঢোকাতেই ভেতরের আস্তরের গা থেকে আঙুলে একটা ছুঁচ ফুটে গেল।

"এই হ'ল তার যাদুবিদ্যা।"

সবগুলো বুটেই এমন কৌশলে পিন ছিল যে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো আমার হাতের তালুতে ফুটে যেতে লাগলো। তখন আমি একটা বড় বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে স্বয়ং যাদুকরের মাথায় দিলাম ঢেলে। তিনি হয় তখন জেগে ছিলেন না অথবা ঘুমের ভান করে ছিলেন।

কিন্তু তবুও আমার মন বিষণ্ণ হয়ে রইলো। সর্বদা আমার মনে পড়তে লাগলো কফিনের মধ্যে সেই মরা চড়ুইটাকে।...

ঠিক করলাম, সেদিন সন্ধ্যায় পালাবো। কিন্তু খাবার আগে তেলের স্টোভে খাবার গরম করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে স্টোভে আগুন ধরিয়ে দিলাম, এবং আগুন নেবাবার চেস্টা করতে গিয়ে পাত্রটাকে ফেললাম উল্টে। তাতে তার মধ্যে যা কিছু ছিল আমার হাতের ওপর পড়লো। ফলে আমাকে নিয়ে যেতে হল হাসপাতালে। হাসপাতালের সেই ভীষণ দৃশ্য ও ভাবটি আমার পরিষ্কার মনে আছে। যেন একটা পীতাভ ধূসর প্রান্তরে এক জায়গায় জড় হয়ে চাদর জড়ানো ধূসর ও সাদা মূর্তিগুলো আর্তনাদ করছে ও মিনতি জানাচ্ছে, আর, তাদের মধ্যে এক দীর্ঘাকার

পুরুষ তার ভ্রূ জোড়া গোঁফের মত ঘন ক্রাচেসের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার কালো ঘন দাড়ি গুলো টানতে টানতে হুংকার দিচ্ছে "আমি কর্তার কাছে নালিশ করবো।"

রোগীদের বিছানাগুলো দেখে মনে পড়লো সেই কফিনটার কথা। রোগীরা চিৎ হয়ে শুয়েছিল মরা চড়ুইয়ের মতো নাক উঁচু করে। ঘরের হলদে দেওয়ালগুলো দুলছিল, ছাদটা পালের মতো বাইরের দিকে গিয়ে ছিল বেঁকে, আমার খাটের পাশে মেঝেটা উঠছিল পড়ছিল। জায়গাটার চারধারে নৈরাশ্য ও নিরানন্দ। বাইরে জানলার গায়ে গাছের ডাল-গুলো কার যেন হাতের মতো খট্ খট শব্দে আঘাত করছিল।

দাদামশায়, দিদিমা এবং প্রত্যেকেই আমাকে বলেছিলেন, হাসপাতালে লোককে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলে। তাই মনে হতে লাগলো আমার জীবনের সেই শেষ। চশমা-পরা একটি স্ত্রীলোক, তারও গায়ে চাদর জড়ানো, আমার কাছে এসে মাথার দিকে দেওয়ালে যে শ্লেটখানা ঝুলছিল তাতে কি লিখলে। চকটা ভেঙে আমার গায়ের ওপর পড়লো।

সে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম ?"

—"আমার নাম নেই।"

—"নিশ্চয়ই তোমার একটা নাম আছে।"

—"না।"

—"বেয়াড়ামো করো না, বেত খাবে।"

আমার কমন বিশ্বাস হয়েছিল যে তারা আমাকে বেত মারবে। তাই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলাম না। সে

বিড়ালের মতো ফোঁস করে উঠলো এবং বিড়ালের মতোই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দুটি আলো জ্বেলে দেওয়া হ'ল। হলদে রঙের কাঠের গোল ফানুস দুটো ছাদ থেকে ঝুলতে লাগলো এক জোড়া চোখের মতো।

কোণের দিকে কে যেন বলে উঠলো, "হাত না থাকলে খেলবো কি দিয়ে?"

—"হাঁ, সত্যিই ওরা তোমার হাত কেটে দিয়েছে।"

তৎক্ষণাৎ আমি এই সিদ্ধান্ত করলাম, যে তাস খেলে এরা তার হাত কেটে ফেলে। না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবার আগে আমাকে করবে কি?

আমার হাত দু'খানা জ্বালা ও টন টন করতে লাগলো যেন কে তার হাড়গুলো টেনে খুলে ফেলছে। আমি ভয়ে যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগলাম, চোখ বুজে রইলাম যাতে চোখের জল দেখা না যায়। কিন্তু তা পাতার তলা দিয়ে বেরিয়ে রগ বেয়ে আমার কানে পড়তে লাগলো।

রাত্রি এল। সকলে কম্বলের তলায় ঢুকলো। প্রতি মুহূর্তে সব স্তব্ধতর হয়ে উঠতে লাগলো। কোণের দিকে কার যেন কথা শোনা যাচ্ছে।

আমি বেঁচে থাকতে থাকতে আমাকে যেন সেখান থেকে চুরি করে নিয়ে যান, এ কথা দিদিমাকে লিখতাম কিন্তু হাত দু'খানা হয়ে গিয়ে ছিল একেবারে কাজের বাইরে। পালাবার অন্য উপায় বার করে চেষ্টা করতে হবে।

রাত্রির স্তব্ধতা প্রতি মুহূর্তে গাঢ়তর হতে লাগলো যেন তা চিরস্থায়ী হতে চলেছে। আমি নিঃশব্দে মেঝেয় নেমে

জোড়া দরজাটার কাছে গেলাম। দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। বারন্দায় আলোর নিচে একখানা পিঠ দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে খোঁচা খোঁচা পাকা চুলভরা একটি মাথা দেখা গেল, মাথাটির চারধারে ধোঁয়া। মাথাটা আমার দিকে কালো কোটরগত চোখ দিয়ে তাকিয়ে ছিল। আমার পালাবার সময় ছিল না।

—"কে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এদিকে এস।"

গলার স্বরটা কঠোর নয়, কোমল। তার কাছে গেলাম। তার কোমর-বন্ধনিতে গোঁজা ছিল এক গোছা চাবি। যদি তার মাথার চুল ও দাড়িগুলো আরও লম্বা হত তাহলে তাকে দেখাতো ঋষি পিটারের মতো।

—"যার হাত পুড়ে গেছে তুমি সেই? রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? কে তোমায় অনুমতি দিয়েছে?"

সে আমার মুখে ও বুকে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে, তপ্ত হাত দু'খানা দিয়ে আমার গলা ধরে তার কাছে টেনে নিল।

—"তোমার ভয় করছে?"

—"হাঁ।"

—"যখন এখানে প্রথমে আসে তখন প্রত্যেকেরই ভয় করে কিন্তু ও কিছু নয়। আর বিশেষ করে আমাকে তোমার ভয় করবার কোন কারণ নেই। আমি কারো কোন ক্ষতি করি না। তামাক খাবে? না, খেও না। এত তাড়াতাড়ি ধরো না—আরও দু-এক বছর অপেক্ষা কর। তোমার মা বাবা কোথায়? কেউ নেই? ভালই। তোমার তাদের দরকার নেই। তাদের ছাড়াই তোমার চলবে। কেবল ভয় পেও না, বুঝলে?"

বহুকাল পরে এই একটি লোক পেলাম যে আমার সঙ্গে সহজ ভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বললে। তার ভাষা আমি বুঝতে পারলাম। তার কথাগুলি শুনতে আমার এত ভাল লাগছিল। সে আমাকে আমার খাটে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তাকে বললাম, "আমার পাশে বস।"

—"বেশ।"

—"তুমি কে ?"

—"আমি ? আমি একজন সৈনিক, সত্যিকারের সৈনিক, একজন কোজাক। আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম—সত্যিই গিয়েছিলাম। সৈনিকরা যুদ্ধ করতেই বেঁচে থাকে। আমি হাংগেরীয়, সিরকাসীয়, পোলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধ, বুঝলে বাবা, একটা মস্ত পেশা।"

আমি মিনিট খানেক চোখ বন্ধ করলাম। তারপর চোখ খুলেই দেখি, সৈনিকটির জায়গায় কালো ফ্রক গায়ে দিয়ে বসে আছেন দিদিমা। আর সে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, "হায় কপাল! ওরা সবাই মরে গেছে ?"

ঘরে রোদ খেলা করছে—কখন প্রত্যেকটি সামগ্রীকে উজ্জ্বল করে তুলছে, তারপরই লুকোচ্ছে, পর মুহূর্তেই আবার আমাদের সকলের দিকে উজ্জ্বল মুখে তাকাচ্ছে—ঠিক যেন একটি ছোট ছেলে লুকোচুরি খেলছে।

বাবুশকা আমার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে বাছা ? ওরা তোমাকে মারধোর করছিল ? আমি সেই বুড়ো শয়তানটাকে বলেছি"—

সৈনিকটা তখন যেতে যেতে বললে, "যা কিছু দরকার আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।"

দিদিমা গাল থেকে চোখের জল মুছে বললেন, "মনে হয় আমাদের এই সৈনিকটি বালাখ্‌নার লোক।"

আমার তখনও মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন দেখছি। তাই চুপ করে রইলাম। ডাক্তার এসে আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তার পরই দিদিমার সঙ্গে গাড়ি চড়ে শহরের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। দিদিমা বললেন, "আমাদের সেই দাদামশায়টি—উনি একেবারে বুদ্ধি-শুদ্ধি হারাতে বসেছেন। তিনি এমন লোভী হয়ে উঠেছেন যে, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। কিছুকাল আগে তাঁর নূতন বন্ধু সেই পশমওয়ালাটির অফিসের খাতা থেকে একখানা একশ রুবলের নোট নিয়েছিলেন। তাই নিয়ে কি গোলমাল! আঃ—।"

সূর্য উজ্জ্বল হয়ে কিরণ বর্ষণ করছে, সাদা পাখির ঝাঁকের মতো আকাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ। ভলগার ওপর সেতুটির পাশ দিয়ে আমরা চলেছি, আমাদের গাড়ির তলায় বরফ যেন আর্তনাদ করছে। হাটের ধারে গির্জাটির লাল গুম্বজটি ঝক্ ঝক্ করছিল।

একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে এক পাঁজা উইলো গাছের ডাল নিয়ে যাচ্ছিল। বসন্ত আসছে। শীঘ্রই ঈসটার পর্ব আরম্ভ হবে!

বললাম, "আমি তোমায় খুব ভালোবাসি দিদিমা।"

তাতে তাঁকে বিস্মিত বোধ হ'ল না। তিনি শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তার কারণ আমরা একই জাতের—আমি এ

কথা গর্ব করে বলছি না—আরও অনেক লোক আছে যারা আমাকে ভালোবাসে, ওগো মা !"

তারপরই মৃদুহাস্যে আবার বললেন, "শীগগিরই উনি আনন্দ করবেন—ওঁর ছেলেটির পুনর্জন্ম হবে ! আহা ভারুইকা—বাছারে তুই কোথায় ?"

তারপর তিনি নীরব হয়ে রইলেন।

দুই

চত্বরে দাদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে টাঙি দিয়ে কাঠ কাঠছিলেন। তিনি টাঙিখানা তুললেন যেন আমার মাথায় ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছেন। তারপর মাথার টুপিটা তুলে বিদ্রূপভরে বললেন, "হে ধর্মাত্মা! কেমন আছেন? আপনার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে? এখন আপনার খুশিমতো জীবন যাপন করতে পারবেন।..."

দিদিমা তাঁকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা সবই তো আমরা জানি, সবই জানি।"

তারপর তাঁর ঘরে স্যামোভারটা ঠিক করবার জন্য ঢুকে বললেন, "তোমার দাদামশায় একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। ওঁর ধর্মছেলে নিকোলাইকে সুদে টাকা ধার দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোন রসিদ নেন নি, আমি ব্যাপারটা ঠিক জানি না, কিন্তু উনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন—টাকাগুলো গেছে। এসব হয়েছে আমরা কাঙালকে সাহায্য করি নি, দুঃখীকে সহানুভূতি দেখাই নি বলে ভগবান মনে মনে বলেছেন, 'কেন আমি কাশিরিনদের ভাল করবো?' তাই তিনি আমাদের সব নিয়েছেন।"

তারপর চারধারে তাকিয়ে দেখে আবার বললেন, "আমাদের ওপর তিনি যাতে একটু সদয় হন, বুড়োকে যাতে এত বেশি কষ্ট না দেন সেজন্যে আমি ভগবানের

মন গলাবার চেষ্টা করছি। আমি যা উপায় করি তা থেকে রাতের বেলা গোপনে কিছু দান করবার চেষ্টা করি। যদি ইচ্ছা হয় তুমি আজ আমার সঙ্গে আসতে পার— আমার কাছে কিছু টাকা আছে—”

দাদামশায় চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি খেতে যাচ্ছ ?”

দিদিমা বললেন, “এ তোমার জিনিস নয়, আমাদের। যদি ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে বসে যেতে পার। অনেক আছে।”

তিনি টেবিলের ধারে বসে বললেন, “ঢাল…”

ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসই আগের জায়গায় আছে কেবল আমার মায়ের কোণটি খালি। দাদামশায়ের বিছানার ওপর একখানি কাগজ ঝুলছিল। তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল, “যীশু জগৎ-সংসারের জীবন রক্ষা করুন। আমার সারা জীবনের দিন-রাত্রিগুলি ভরে তোমার নামটি যেন সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে।”

জিজ্ঞেস করলাম, “ওটা কে লিখেছে ?”

দাদামশায় উত্তর দিলেন না, দিদিমা একটু পরে মৃদু হেসে বললেন, “ওই কাগজখানার দাম—একশ রুবল।”

দাদামশায় বলে উঠলেন, “তাতে তোমার দরকার নেই। আমি পরকে সব দিয়েছি।”

দিদিমা শান্ত ভাবে বললেন, “এখন দিচ্ছ ভাল কথা কিন্তু সময় ছিল যখন তখন দাও নি !”

—“চুপ করে থাক !”

যেমন হওয়া উচিত তেমনই হল—ঠিক সেই আগের মতো।

কোণে একটা বেতের ঝুড়িতে কোলিয়া জেগে উঠলো। তাঁর নীল চোখ দুটি পাতার তলায় প্রায় দেখাই যায় না। সে আরও কালো, ম্লান, পলকা হয়ে এসেছে। সে আমাকে চিনতে পারলে না, মুখ ফিরিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে। রাস্তায় বড় দুঃখের খবর ছিল। ভিয়াখির মারা গেছে; খাবি শহরে চলে গেছে; ইয়াজের পা দুখানা কেটে ফেলা হয়েছে। সে আর হাঁটতে পারে না।

সে যখন আমাকে এই সব খবর দিচ্ছিল, কোসট্রাম রেগে বললে, "ছেলেরা তাড়াতাড়ি মরে।"

কোসট্রাম বললে, "কিন্তু কেবল ভিয়াখিরই মারা গেছে।"

—"একই কথা। রাস্তা ছেড়ে গেলে সে মরারই সামিল। বন্ধুত্ব পাতাবার সঙ্গে সঙ্গে হয় তাদের শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাজ করবাব জন্যে কিম্বা তারা মারা যায়। তোমাদের চত্বরে নূতন লোক বাস করছে। তাদের নাম ইভসিয়েংকি। তাদের ছেলেটার নাম নিউশকা। সে সাধারণ ছাড়া আর কিছু নয়। তার দুটি বোন আছে। একটি এখনও ছোট, আর একটি খোঁড়া। সে ক্রাচেশে ভর দিয়ে হাঁটে। সে দেখতে সুন্দর।"

তারপর একটু ভেবে আবার বললে "চারকা আর আমি দুজনেই তাকে ভালবাসি। সেই জন্যে ঝগড়া করি।"

—"মেয়েটির সঙ্গে?"

—"মেয়েটির সঙ্গে কেন? আমাদের দুজনের মধ্যে। তার সঙ্গে—কদাচিৎ।"

সেই দিনই সন্ধ্যায় মেয়েটিকে দেখলাম। ক্র্যাচেসে ভর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে নামতে তার হাত থেকে ক্র্যাচেসটা পড়ে গেল। সে অসহায় ভাবে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ক্র্যাচেসটা তুলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাতে ছিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাই অসুবিধা হতে লাগলো। সে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হাসতে হাসতে কোমল কণ্ঠে বললে, "হাত দুখানা কি করেছো ?"

—"পুড়িয়ে ফেলেছি।"

—"আর আমি খোঁড়া। তুমি এখানে থাক ? হাসপাতালে অনেক দিন ছিলে ? আমি ছিলাম অ—নে—ক দিন।" দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার বললে, "অনেক দিন।"···তার চোখ দুটি ডাগর ও চিন্তা-মাখা। তার হাসিটুকু সুন্দর। কিন্তু আমার মনে কোন রেখাপাত করলো না। তার শীর্ণ ক্লিষ্ট দেহখানি যেন বলতে লাগলে, "ছুঁয়ো না আমায়।" আমার বন্ধুরা কেমন করে তাকে ভালোবাসতে পারে ?

সে স্বেচ্ছায় ও প্রায় গর্বের সঙ্গে আমাকে বললে, "আমি অনেক দিন থেকে খোঁড়া হয়ে আছি। আমাদের এক পড়শী আমাকে গুণ করে। আমার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। তারপর সে হিংসেয় আমাকে গুণ করেছিল। হাসপাতালে কি তোমার ভয় করতো ?"

—"হাঁ।"

তার কাছে থাকতে আমার কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগলো। আমি ভেতরে চলে গেলাম।

মাঝরাতে দিদিমা আমাকে আস্তে আস্তে ডেকে তুললেন।

বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তুমি যদি কারো ভাল কিছু কর তোমার হাত শীঘ্রই ভাল হবে।"

আমি যেন অন্ধ এমনিভাবে তিনি আমার হাত ধরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে চললেন। মসীঢালা ভিজে রাত। বাতাস অবিরাম বয়ে চলেছিল। তার টানে নদী বইছিল আরও বেগে, আমার পায়ে এসে সজোরে লাগলো বালুকণা। দিদিমা দীনের ছোট ছোট কুঁড়েগুলির অন্ধকার জানলার কাছে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে জানলার ওপর পাঁচটি করে কোপেক ও তিনখানা করে বিস্কুট রাখলেন। এবং নক্ষত্রহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "এদের সাহায্য কর মা। মাগো, তোমার চোখে আমরা সকলেই পাপী।"

আমরা বাড়ির কাছ থেকে যত দূরে যেতে লাগলাম অন্ধকার ও স্তব্ধতা হয়ে আসতে লাগলো ততই গাঢ়। রাতের আকাশ জমাট তমসাবৃত, অতল যেন চন্দ্র ও নক্ষত্র চিরতরে লুপ্ত। কোথা থেকে একটা কুকুর লাফ দিয়ে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগলো; তার চোখ দুটো জ্বলছিল। আমি ভয়ে দিদিমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

তিনি বললেন, "ভয় নেই। ওটা কুকুর। ভূত আর আসবার সময় নেই। মোরগ ডাকতে আরম্ভ করেছে।"

কুকুরটাকে ভুলিয়ে কাছে এনে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন, "দেখ বাপু কুকুর! আমার নাতিকে ভয় দেখিও না।"

কুকুরটা আমার পায়ে গা ঘষলো। তারপর তিনটিতে এক সঙ্গে চলতে লাগলাম। দিদিমা বারো বার জানলায়

গোপন ভিক্ষা রাখলেন। ক্রমে আলো ফুটতে আরম্ভ করলো, অন্ধকারের মাঝ থেকে ধূসর রঙের ঘর-বাড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।...

দিদিমা বললেন, "বুড়ী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চল, এখন বাড়ি যাই। স্ত্রীলোকগুলি জেগে দেখবে আমাদের জননী ওদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে কিছু রেখেছেন। যখন একেবারে কিছুই থাকে না তখন সামান্যতেই উপকার হয়। আচ্ছা ওলেশা, আমাদের দেশের লোকেরা এমন দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়, কিন্তু কেউ তাদের জন্যে মাথা ঘামায় না। ধনী যারা তারা ভগবানের কথা ভাবে না; গরীবেরা তাদের বন্ধু নয়, ভাইও নয়। তাদের লক্ষ্য কেবল ধন-দৌলত জড় করবার দিকে। কিন্তু এই ধন-দৌলত নরকে হবে তাদের আগুন। ভগবান যখন আমাদের সকলের জন্যে তখন আমাদের পরস্পরের জন্যে বাঁচা উচিত। তোমাকে আবার আমার কাছে পেয়ে আমি খুশি হয়েছি।"

আমিও সুখী হয়েছিলাম। কেমন অস্পষ্ট ভাবে বুঝেছিলাম, আমি এমন একটি কাজে অংশ গ্রহণ করেছি যা আমার কখনই ভোলা উচিত নয়। আমার কাছেই কুকুরটা দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। কোমল চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কুকুরটা আমাদের সঙ্গে থাকবে?"

—"কি? যদি খুশি হয় থাকতে পারে। এই যে, ওকে একখানা বিস্কুট দিচ্ছি। এখনও দু'খানা বাকি রয়েছে। এস এই বেঞ্চিখানাতে বসি। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

একটা ফটকের পাশে একখানা বেঞ্চিতে আমরা বসলাম। কুকুরটা আমাদের পায়ের কাছে শুয়ে বিস্কুট খেতে লাগলো… আমি দিদিমার তপ্ত দেহটিতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার আমার জীবন ত্বরিত গতিতে বয়ে যেতে লাগলো। আমার অন্তরে প্রতি দিন বয়ে আসতে লাগলো ঘটনা-প্রবাহ। তা আমাকে দিয়ে যেতে লাগলো নূতন অভিজ্ঞতা। কখন তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠি, কখন বিচলিত হয়ে পড়ি, কখন বা বেদনা জাগে। কিন্তু যেদিক দিয়েই হোক আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। অল্পকালের মধ্যেই আমিও সেই খোঁড়া মেয়েটির সঙ্গে দেখা করবার জন্য যথাসাধ্য করতে লাগলাম। ফটকের পাশে বেঞ্চিতে তার সঙ্গে বসে গল্প করতাম বা চুপচাপ থাকতাম। তার পাশে চুপ করে থাকতে ভাল লাগতো। সে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতো। তার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। ডন-নদীর ধারে কোজাকেরা কেমন ভাবে জীবন কাটায় সে আমাকে তার গল্প বলতো। তার গল্প বলবার ভঙ্গি ছিল ভালই। সেও কিছুকাল ডন-তীরে কোজাকদের দেশে তার কাকার সঙ্গে ছিল। তার কাকা সেখানে তেলের কারখানায় কাজ করতো। তারপর তার বাবা গিয়েছিল নিজ্‌নিতে তালা-তৈরির কারখানায়। সে তালা-চাবির কারিগর ছিল। লাডমিলা বলেছিল, "আমার আর এক কাকা আছে। সে জারের একেবারে কাছে থাকে।"

আগে আমাদের ছোট দলটি খেলায় একই পক্ষে থাকতো কিন্তু এখন দেখলাম, কোসট্রাম ও চারকা পরস্পরের বিপক্ষে থাকে, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দু'জনের মধ্যেই দেখা

যায় রেষারেষি। একদিন তাঁরা দু'টিতে এমন মারামারি করেছিল যে, বয়োজ্যেষ্ঠদেরও তাদের মাঝে এসে পড়তে হয়েছিল। দুজনেরই মাথায় জল ঢালতে হয়েছিল যেন দুটো কুকুর ঝগড়া করছে। লাডমিলা তখন একখানা বেঞ্চিতে বসে তার সুস্থ পা খানা মাটিতে ঠুকছিল। যোদ্ধা দুজন যখন গড়াতে গড়াতে তার কাছে এল সে তাদের ক্রাচেস দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে সভয়ে বলে উঠলো, "ছাড়!"...

আর একবার কোসট্রাম খেলতে খেলতে চারকার কাছে গেল হেরে। তাতে সে মুদির দোকানে একটা সিন্দুকের পিছনে লুকিয়ে বসে এমন কাঁদছিল যে, আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে, "দাঁড়াও না! ইট মেরে তোমার মাথা ভাঙবো তখন দেখো।"

চারকা হয়ে উঠেছিল গম্ভীর। তার চালচলন হয়েছিল বিবাহযোগ্য যুবকের মতো। সে একদিন বললে, "আমি তামাক, সিগারেট খেতে শিখবো, দুবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মাথা ঘুরেছিল।"

এই সব ব্যাপার আমার কাছে লাগছিল খারাপ। দেখলাম, বন্ধুদের আমি হারাতে বসেছি। মনে হ'ল এসবের জন্যে লাডমিলাই দায়ী, তাই একদিন সন্ধ্যার দিকে যখন হাড়, ন্যাকড়া ও নানারকমের আবর্জনা কুড়োতে যাচ্ছিলাম চত্বরে লাডমিলার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আসছিল দেহটি দুপাশে হেলিয়ে দুলিয়ে ডান হাতখানি দোলাতে দোলাতে।

তিনবার মাথা নুইয়ে সে বললে, "কেমন আছ? কোসট্রাম আর চারকা তোমার সঙ্গে ছিল?"

—"চারকা এখন আর আমাদের বন্ধু নয়। এ সব তোমার দোষ। ওরা দুজনেই তোমাকে ভালোবাসে। তাই ঝগড়া করেছে।"

সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, কিন্তু বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর দিলে, "তারপর! কেমন করে আমার দোষ?"

—"কেন তুমি তাদের প্রেমে পড়াও?"

—"আমি তাদের আমার প্রেমে পড়তে বলি নি!" সে রাগত কথাগুলি বললে। তারপর সেখান থেকে চলে যেতে যেতে আবার বললে, "এ সবের কোন মানে হয় না। আমি তাদের দুজনের চেয়ে বয়সে বড়। আমার বয়স চৌদ্দ বছর। ছেলেরা বড় মেয়েদের প্রেমে পড়ে না।"

তার মনে আঘাত দিতে ইচ্ছা হ'ল; বললাম, "তুমি ভারি জান! ঐ দোকানদার জ্লিসটভের বোনের কি হয়েছে? সে তো বুড়ী হয়ে গেছে তবুও ছোঁড়ারা তার পেছনে ছোটে।"

লাডমিলা আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো; চত্বরের বালুতে ক্রাচেসটা পুতে সজল কণ্ঠে সুন্দর চোখ দুটিতে আলো বর্ষণ করে তাড়াতাড়ি বললে, "তুমি নিজেই কিছু জান না! ঐ স্ত্রীলোকটা খারাপ আর আমি—আমি কি? আমি এখনও ছেলেমানুষ। কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু, 'কামচাদালকা, নামে উপন্যাসখানার দ্বিতীয়ভাগ তোমার পড়া উচিত। তখন, তুমি বলবার মতো কিছু পাবে।"

সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তার জন্যে আমার দুঃখ হ'ল। তার কথায় যে সত্যের সুর ছিল সে

বিষয়ে আমি ছিলাম অজ্ঞ। আমার সাথীদের কেন সে জড়িয়ে ফেলেছে? কিন্তু তারা দু'জনেই পড়েছে প্রেমে—আর কি বলবার আছে?

পরদিন তার সঙ্গে ভাব করবার উদ্দেশ্যে আমি লজেনস্ কিনলাম। জানতাম সে তা ভালোবাসে। লজেনস্গুলো নিয়ে গিয়ে বললাম, "খাবে?"

সে ভীষণ রাগের সঙ্গে বলে উঠলো, "চলে যাও, তোমার সঙ্গে আমার ভাব নেই!" কিন্তু পরক্ষণেই সেগুলো নিয়ে মন্তব্য করলে, "এগুলো কাগজে মুড়ে আনা উচিত ছিল। তোমার হাতগুলো এমন নোংরা।"

—"আমি হাত দুখানা ধুয়েছি কিন্তু ময়লা ওঠে না।"

সে আমার হাতখানা তার শুষ্ক তপ্ত হাতে ধরে লক্ষ্য করতে লাগলো।

—"কি রকম নষ্ট করে ফেলেছো।"

—"কিন্তু তোমার হাতও খসখসে।"

—"আমার ছুঁচের জন্যে হয়েছে। আমি কত সেলাই করি।" তারপর খানিক চুপ করে থেকে চারধারে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললে, "চল না কোথাও লুকিয়ে কামচাদালকা-খানা পড়ি, পড়বে?"

বহু সন্ধানের পর লুকোবার একটি জায়গা পাওয়া গেল। সেটি হচ্ছে ধোবিখানাটা। দুজনে বিবেচনা করে দেখলাম, এই জায়গাটাই সব চেয়ে ভাল। তবে ভেতরটা অন্ধকার কিন্তু আমরা জানলায় বসতে পারি। জানলাটা ছাপ্পড় ও কসাইখানাটার মাঝে নোংরা জায়গাটার দিকে। লোকে

কদাচিৎ সেদিকে আসে। সেই ঘরে জানলায় পাশ ফিরে বসে বইখানা সে পড়তো আর আমি মেঝেয় বসে শুনতাম। কুকুরটা আমার হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমোত। আমি তার নাম দিয়েছিলাম, "বাতাস।" কারণ তার লোমগুলো ছিল কর্কশ, শরীরটা ছিল লম্বা, সে ছুটতোও খুব জোরে, আর শরতের বাতাস যেমন চিমনির মধ্যে গম্ গম্ করে তার ডাকও ছিল তেমনি।

মেয়েটি পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করতো, "তুমি শুনছো?"

আমি নীরবে ঘাড় নাড়তাম।

বইখানির জানা-অজানা শব্দের মিশ্রণ ক্রমেই আমাকে অনুপ্রাণিত করে তুলতো আর আমার মধ্যে জাগিয়ে দিত সেগুলিকে এমন ভাবে গাঁথবার বাসনা যেমন গানে বাজে প্রত্যেকটি শব্দ, আকাশের গায়ে নক্ষত্র উজ্জ্বল হয়ে লেগে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উঠছিল প্রবলতর হয়ে। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো লাডমিলা তার পাংশু হাতখানি বইএর ওপর এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতো, "বইখানা ভাল নয় কি? দেখো।"

প্রথম সন্ধ্যাটির পর আমরা দুজনে প্রায়ই সেখানে গিয়ে বসতাম। লাডমিলা শীঘ্রই "কামচাদালকা" পড়া ছেড়ে দিল। তাতে খুশি হলাম, সেই অফুরন্ত বইখানিতে সে যা পড়তো আমাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করতো কিন্তু আমি তার উত্তর দিতে পারতাম না। বইখানা অফুরন্ত এই জন্যে যে, তার তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ছিল। আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগতো বাদলা-দিন। সেদিন কেউই সেদিকে আসতো না।

আমাদের অন্ধকার কোণটিতে কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকাতো না, কিন্তু লাডমিলার বড় ভয় হত যে লোকে আমাদের "দেখে ফেলবে"।

সে একদিন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "লোকে তখন আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববে জান ?"

আমি জানতাম। আমারও ভয় হত যে আমাদের লোকে "দেখে ফেলবে।" আমরা কখন কখন সেখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম, দিদিমার গল্প করতাম। আমি বলতাম তাঁর কাছে শোনা গল্পগুলো, সে বলতো মেডভিয়েডিয়েৎ নদীর ধারে কাজসাকাসদের জীবন-যাত্রার কথা।

সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলতো, "সেখানে কি চমৎকার ছিল সব। এখানে—এ কি ?—এখানে কেবল ভিখিরীরা থাকে।"

শীঘ্রই আর আমাদের ধোবিখানায় যেতে হ'ল না। লাডমিলার মা এক পশমব্যবসায়ীর কাছে কাজ পেলেন। সকালে উঠেই তিনি কাজে বেরিয়ে. যেতেন। লাডমিলার বোন ছিল স্কুলে, ভাই কাজ করতো একটা টালির কারখানায়। বাদল দিনে আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে তার রান্নার কাজে, বসবার ও রান্নাঘর ঝাঁট দেওয়ার সাহায্য করতাম। সে হেসে বলতো, "আমরা দুজনে একসঙ্গে আছি ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতো। কেবল আমরা শুই আলাদা। বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাদের চেয়ে ভাল আছি—কোন স্বামী স্ত্রীর কাজে সাহায্য করে না।"

হাতে টাকা থাকলে আমি কেক কিনতাম। তারপর খেতাম চা। কখন কখন দিদিমা আমাদের দেখতে আসতেন।

তিনি বসে বসে লেপ তৈরি বা সেলাই করতেন আর বলতেন চমৎকার গল্প। দিদিমা শহরে গেলে লাডমিলা আমাদের বাড়ি আসতো।

দিদিমা বলতেন, "আমরা কি সুখে আছি! আমাদের নিজের টাকা দিয়ে আমরা যা খুশি করতে পারি!"

আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব যাতে আরও বাড়ে তিনি সেজন্য আমাদের উৎসাহিত করেছিলেন। বলেছিলেন, "ছেলে-মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া ভাল। কেবল তাদের মধ্যে 'নষ্টামো' না থাকে।" এবং "নষ্টামো" কথাটির দ্বারা কি বলতে চান তা অতি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যেন অনুপ্রাণিত হয়েছেন এমন ভাব নিয়ে অতি সুন্দর করে কথাগুলি বলেছিলেন। আমাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফোটবার আগে ফুল তোলা অন্যায়। কারণ তখন তার গন্ধ থাকে না, তাতে ফলও ফলে না।

আমাদের "নষ্টামো" করবার দিকে ঝোঁক ছিল না, কিন্তু তাতে যে বিষয়ে নীরব থাকা উচিত বলে ধারণা করা হয়, সে বিষয়ের আলোচনায় বাধা ঘটতো না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা বাধ্য হতাম। কারণ যৌনসম্পর্কটা অমার্জিত আকারে বড় ঘন ঘন আর বিরক্তিকর ভাবে আমাদের চোখে পড়তো। আমাদের কাছে ব্যাপারটা লাগতো অতি বিশ্রী।

লাডমিলার বাবা ছিলেন সুপুরুষ, বয়স চল্লিশ বছর। তাঁর মাথায় ছিল কোঁকড়া চুল, মুখে গোঁফ। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে চোখ ও ভ্রূ ঘোরাতে পারতেন। তিনি অদ্ভুত ভাবে

নীরব থাকতেন—তাঁর মুখে কোনদিন একটি কথা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

রবিবার সন্ধ্যায় ও উৎসবের দিনে ফিকে নীল রঙের শার্ট পরে, ফিতে দিয়ে পিঠে একটা হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে শাস্ত্রী যেমন করে পাহারা দেয় তেমনি করে তিনি ফটকে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফটকের সামনে দিয়ে যেতো বয়স্কা নারী ও তরুণীর দল। তারা ইভসিয়েংকোর দিকে চোরা চাহনি হানতো। তিনিও নিচের ঠোঁটটি বার করে এক একজনকে লক্ষ্য করতেন। কেবল চোখে চোখে এই নীরব কথার মধ্যে ছিল বিশ্রী রকমের একটা শ্বা-সুলভতা।...

লাডমিলার মা বলতেন, "মাতাল পশু! বেহায়া!" তিনি ছিলেন লম্বা, রোগা; তাঁর মুখখানি ছিল লম্বা, গায়ের রঙ ময়লা। তাঁর মাথায় ছিল ছোট ছোট চুল—টাইফাস জ্বরের পর কেটে ফেলা হয়েছিল। তাঁকে দেখাতো একটা "মুড়ো খ্যাংরার" মতো।

লাডমিলা তাঁর পাশে বসে নানা প্রশ্নে রাস্তার দিক থেকে তাঁর মনোযোগ ফিরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতো।

মা তাকে ধমক দিতেন, "চুপ কর্ রাক্ষুসী।"

উত্তরে লাডমিলা বলতো, "রাগ করো না, মা। দেখ মাদুর-কারিগরের বিধবাটা কি রকম সেজেছে।..."

তিনি চোখের জলের ভেতর দিয়ে নির্মম ভাবে বলে উঠতেন, "তোদের তিন জনের জন্যে না হলে আমি ওর চেয়ে ভাল করে সাজ-গোছ করতে পারতাম। তোরা আমাকে খেয়ে ফেলেছিস্, গিলেছিস।" বলতে বলতে তিনি

মাচুর-কারিগরের বিধবাটির দেহটির দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

বিধবাটি দেখতে ছিল ছোট-খাটো বাড়ির মতো। তার লাল মুখখানা একখানা সবুজ রুমালে জড়িয়ে বাঁধা থাকতো। তাতে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়তো এবং মুখখানাকে দেখাতো ছাদের গায়ে রোদ-মাখা জানালার মতো। ইভসিয়েংকো পিঠ থেকে হারমোনিয়ামটা বুকের ওপর এনে বাজাতে শুরু করতেন। তাতে বেজে উঠতো নানা সুর। সে সুর ভেসে যেত দূরে। ছেলে-মেয়েরা চারধারের রাস্তা-গুলো থেকে ছুটে আসতো এবং আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পায়ের কাছে বালিতে বসে পড়তো।

ইভসিয়েংকোর স্ত্রী শাসাতেন, "দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি মজা!" তিনি কোন উত্তর না দিয়ে আড়চোখে তাকাতেন। আর সেই বিধবাটি সেখান থেকে একটু দূরে জ্লিসটভের বেঞ্চি-খানার ওপর বসে একমনে বাজনা শুনতো।

দেখতাম তখন মাঠের বুকে সমাধি-স্থানের ওধারে সূর্য রাঙা হয়ে অস্ত যাচ্ছে। পথে, যেন নদীর বুকে রঙচঙে পোশাক পরে বড় বড় মাংসখণ্ড বেড়াচ্ছে ভেসে। ছেলে-মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘূর্ণি বাতাসের মতো, বাতাস তপ্ত ও উন্মাদনা জাগানো। দিবসের রৌদ্রতপ্ত বালুরাশি থেকে উঠছে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। বিশেষ করে নাকে লাগছে কসাইখানা থেকে একটা অদ্ভুত ভারী ও মিষ্ট গন্ধ—রক্তের গন্ধ। যেখানে পশম কারিগরটি থাকতো সেই চত্বর থেকে আসছে চামড়া পাট করবার লোণা, তিক্ত গন্ধ। নারীদের কল-কাকলি,

পুরুষদের উন্মত্ত চীৎকার, শিশুদের ছোট ছোট ঘণ্টার মতো কণ্ঠধ্বনি, হারমোনিয়ামের মধুর তান—সব এক সঙ্গে গভীর ধ্বনিতে যাচ্ছে মিশে। চির ঘূর্ণিতা ধরণী সুগভীর প্রবল শ্বাস ত্যাগ করছে। সবই রূঢ়, রুক্ষ ও নগ্ন। কিন্তু তা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, অভব্য পাশবিক জীবনের প্রতি অন্তরে গভীর আশা ভরে দিচ্ছে। আর সময়ে সময়ে এই কোলাহলের ওপর দিয়ে সোজা অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করছে কতকগুলি বেদনাময়, চিরস্মরণীয় কথা "একজনের ওপর একসঙ্গে সকলের চড়াও হওয়া উচিত নয়—পালা কর।" "আমরা যখন আমাদের নিজেদের ওপর অনুকম্পা দেখাব না তখন অন্যে দেখাবে কেন?" "ভগবান নারীদের কি কেবল উপহাস করবার জন্যেই জগতে এনেছেন?"

ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, বাতাস হয়ে উঠছে আরও নির্মল, শব্দগুলি হচ্ছে আরও চাপা। মনে হচ্ছে কাঠের বাড়িগুলোর গায়ে ছায়া জড়িয়ে সেগুলো ফুলে উঠে আরও লম্বা হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের চত্বর থেকে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা কেউ কেউ বেড়ার ধারে বা মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইভসিয়েংকো অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়েছেন যেন গলে গেছেন! মাদুর কারিগরের বিধবাটিকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সমাধির ওধারে দূরে যেন কোথা থেকে হারমোনিয়ামের গম্ভীর সুর শোনা যাচ্ছে। লাডমিলার মা বেঞ্চিতে গুটিশুটি হয়ে বিড়ালের মতো পিঠ ফুলিয়ে বসে আছেন। দিদিমা গেছেন এক পড়শী ধাত্রীর সঙ্গে চা খেতে। এই ধাত্রীটির দেহ ছিল বিশাল,

নাকটি হাঁসের মতো। তার পুরুষের মতো চাপা বুকে সর্বদা ঝুলতো একটি সোনার পদক। পদকটি সে পেয়েছিল "জীবন রক্ষার জন্য।" সেই রাস্তার বাসীন্দারা সকলেই তাকে ভয় করতো। মনে করতো সে ডাইনী। কিন্তু তার সঙ্গে দিদিমার খুব ভাব ছিল।

ফটকের ধারে কোসট্রাম, লাডমিলা ও আমি বেঞ্চিখানাতে বসে আছি। তার সঙ্গে কুস্তি করবার জন্য লাডমিলার ভাইকে চারকা চেপে ধরলে। দুজনে পরস্পরকে জাপটে ধরে বালির ওপর ঠেলাঠেলি করতে করতে ক্রমেই তেতে উঠছে।

লাডমিলা সভয়ে বললে, "ছেড়ে দাও!"

কোসট্রাম তার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে শিকারী বুড়ো কালিনিনের একটি গল্প বললে। লোকটির বদনাম ছিল। সারা শহরের লোকে তাকে চিনতো। অল্পদিন আগে সে মারা যায়, কিন্তু তাকে গির্জার কবরখানার মাটিতে গোর দেওয়া হয় না। তার কফিনটা অন্য গোরগুলোর কাছ থেকে তফাতে মাটির ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। কফিনটা ছিল কালো রঙের, তলায় ছিল লম্বা পায়া। তার ঢাকনার ওপর সাদা রঙ দিয়ে আঁকা ছিল একটি ক্রশ, একটি সড়কি, একটি বাঁশি ও দুটি হাড়। প্রতি রাতে অন্ধকার হতেই বৃদ্ধ কফিন থেকে উঠে গোরস্থানের মধ্যে ভোর অবধি ঘুরে বেড়ায় কি যেন খোঁজে।

লাডমিলা মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে উঠলো, "ও সব ভয়ের কথা বোলো না।"

চারকা কুস্তি ছেড়ে এসে বললে, "বাজে কথা! মিছে

বল্‌ছো কেন? আমি নিজে তাকে কবর দিতে দেখেছি। ওপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভ। মরামানুষ ঘুরে বেড়ায় এ কথাটা ছড়িয়েছে ঐ মাতাল কামারটা।"

কোসট্রাম তার দিকে না তাকিয়েই বললে, "গোরস্থানটাতে গিয়ে শুয়ে থাক না। দেখবে কি হয়!"

তারা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। লাডমিলা মাথা ঝাঁকিয়ে বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলে, "মা, মরা মানুষ রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় কি?"

প্রশ্নটি যেন তাঁকে দূর থেকে ফিরিয়ে আনলে এমনি ভাবে বললেন, "বেড়ায়।"

আমাদের তর্ক শুনে দোকানদারটার ছেলে ভালেক এল। যুবকটির বয়স হবে বিশ বছর, লম্বা-চওড়া জোয়ান। বললে, "তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে ওখানে গিয়ে ভোর অবধি কফিনটার ওপর বসে থাকতে পারবে তাকে তিনটে গ্রেভেন আর দশটা সিগারেট দেব। আর যার ভয় করবে তার কান ধরে টানবো।"

আমরা তিনজনেই হতভম্বের মতো চুপ করে রইলাম। লাডমিলার মা বললেন, "ছেলেদের এইরকম কাজে অনর্থক কেন লাগাচ্ছো?"

চারকা গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, "আচ্ছা আমাকে এক রুবল দাও আমি যাব।"

কোসট্রাম নষ্টামো করে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু দু গ্রেভেন পেলে তোমার ভয় করবে? দেখ ওকে একটা রুবল দাও। কিন্তু ও যাবে না, কেবল দেখাবে যেন যাবে।"

—"এই নাও রুবল !"

চারকা উঠলো। এবং একটিও কথা না বলে, বেড়াটার কোলে কোলে ধীরে-সুস্থে চলে গেল।

কোসট্রাম মুখের ভেতর আঙুল পুরে সুতীক্ষ্ণ শব্দে শিষ দিলে।...

ভালেক বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, "কোথায় যাচ্ছ, কাপুরুষ? আর তুমি বল পথের ছেলেরা কেউ তোমার সঙ্গে মারামারিতে পারে না।"

তার ঠাট্টাটা শুনতে বিশ্রী লাগছিল। এই অতিরিক্ত খাদ্যপুষ্ট যুবকটিকে আমরা কেউই পছন্দ করতাম না। সে সর্বদা ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে অন্যায় কাজ করাতো, তাদের কাছে মেয়ে ও বয়স্কা নারীদের সম্বন্ধে অশ্লীল গল্প বলতো, কেমন করে তাদের উত্যক্ত করতে হবে তা শেখাতো। সে যা বলতো ছেলেরা তাই করতো। তার জন্য তাদের শাস্তি পেতে হত যথেস্ট। কোন কারণে সে আমার কুকুরটিকে দেখতে পারতো না। তাকে ইট মারতো এবং একদিন একখানা পাঁউরুটির মধ্যে ছুঁচ পুরে তাকে দিয়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ লাগলো ভয়ে লজ্জায় চারকাকে উঠে যেতে দেখে।

আমি ভালেককে বললাম, "আমাকে রুবলটা দাও, আমি যাব।"

সে আমাকে ঠাট্টা করলে এবং ভয় দেখাবার চেষ্টা করে রুবলটা দিতে গেল লাডমিলার মাকে। কিন্তু তিনি সেটা নিতে চাইলেন না, কঠোর কণ্ঠে বললেন, "আমার দরকার নেই। আমি নেব না।"

রুবলটা নেবে কি না লাডমিলাও মন স্থির করতে পারলে না। তাতে ভালেক আরও বেশি করে ঠাট্টা করতে লাগলো। আমি রুবলটা না নিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে দিদিমা সেখানে এলেন। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি রুবলটা নিয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বললেন, "তোমার ওভার-কোটটা গায়ে দাও। একখানা কম্বল সঙ্গে নাও। কারণ ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।"

তাঁর কথায় উৎসাহ পেলাম। বুঝলাম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে না।

ভালেক আমার সঙ্গে একটি শর্ত করে নিলে, যতক্ষণ না আলো ফোটে ততক্ষণ আমাকে কফিনটার ওপর শুয়ে বা বসে থাকতে হবে, এমন কি, বুড়ো কালিনিন যখন তার ভেতর থেকে বার হবে তখন সেটা নড়লেও উঠতে পাব না। আমি যদি তার ওপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামি তাহলেও আমার হার হবে।

ভালেক বললে, "মনে রেখ, আমি সারারাত তোমার ওপর নজর রাখবো।"

গোরস্থানে যাবার জন্য আমি রওনা হতেই দিদিমা আমাকে চুমো দিয়ে বললেন, "যদি কোন কিছুর ছায়া তোমার চোখে পড়ে নড়ো না, কেবল বলো, মা মেরী।"

আমি তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। আমার তখন একমাত্র ইচ্ছা সমস্ত কাজটা শীঘ্রই শেষ করে ফেলা। ভালেক, কোসট্রাম ও আর একটি যুবক আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। আমি ইটের প্রাচীরটা ডিঙোতে গিয়ে কম্বলে জড়িয়ে গেলাম

পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলাম যেন মাটি আমাকে ঠেলে তুলে দিয়েছে। দেওয়ালের ওধার থেকে শোনা গেল হাসির খিল্ খিল্ শব্দ। আমার বুকটা মুষড়ে গেল; শিরদাঁড়া শির শির করে উঠলো।

আমি হোঁচট খেতে খেতে কালো কফিনটার কাছে গেলাম। বালি উড়ে এসে তার গায়ের একধারে স্তূপাকারে জমেছিল আর একধারে দেখা যাচ্ছিল তার ছোট মোটা পায়া দুটো। আমি কফিনটার ধারে বসে চারধারে তাকিয়ে দেখে নিলাম। গোরস্থানটা কালো রঙের ক্রুশে একেবারে ঠাসা।

এখানে-সেখানে কবরগুলোর মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে শীর্ণ উইলো গাছ। তাদের ডালগুলো ছড়িয়ে দিয়ে পাশের কবরগুলোকে যুক্ত করে রেখেছে।

গির্জাটা আকাশে উঠেছে তুষারস্তূপের মতো। নিশ্চল মেঘভারের মাঝে ঝক ঝক করছে অস্তোন্মুখ ছোট চাঁদখানি। দূর থেকে ভেসে আসছে গির্জার তীক্ষ্ণ ও বিষাদখিন্ন ঘন্টাধ্বনি। ঘণ্টা বাজাচ্ছিল ইয়াজের বাবা। মনে পড়লো তার কথাগুলি, "ভগবান আমাদের শান্তি দিন।" ঠাণ্ডা রাত তবুও আমি খুব ঘামছিলাম। বুড়ো কালিনিন যদি সত্যিই কবর থেকে উঠে আসে! ছুটে চৌকিদারটার ঘরে যাবার সময় পাবো তো?

গোরস্থানটাকে খুব ভাল করে চিনতাম। গোরগুলোর মধ্যে ইয়াজ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বহুবার খেলা করেছি। ওই ওখানে গির্জার পাশে আমার মাকে কবর দেওয়া হয়েছে।

তখনও অনেকে ঘুমোয় নি। কারণ গ্রাম থেকে মাঝে

মাঝে হাসির গমক ও গানের টুকরো ভেসে আস্‌ছিল। কোথা থেকে যেন হারমোনিয়ামের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। প্রাচীরের পাশ দিয়ে অন্য দিনের মতোই গান গাইতে গাইতে চলেছে মায়াচফ নামে সেই মাতাল কামারটা।

প্রাণের শেষ নিশ্বাসধ্বনি শুনতে লাগছিল চমৎকার। কিন্তু গির্জার ঘণ্টার প্রত্যেকটি ধ্বনির সঙ্গে সব ক্রমেই স্তব্ধ হয়ে আসছিল। স্তব্ধতা প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে সবকিছু ডুবিয়ে ও ঢেকে নদীর মতো বয়ে চলেছে।...গায়ে কম্বলখানা জড়িয়ে, পা দুখানা গুটিয়ে, গির্জার দিকে মুখে করে কফিনটার ওপর বসে আছি। যখনই একটু নড়ি কফিনটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ওঠে, বালিতে খস্‌ খস্‌ শব্দ হয়।

আমার কাছে মাটিতে কি যেন বার দুই খট্‌ খট্‌ করলো। তারপর কাছেই পড়লো একটি ঢিল। ভয় পেলাম। কিন্তু পরক্ষণেই অনুমান করলাম আমাকে ভয় দেখাবার জন্য ভালেক ও তার বন্ধুরা প্রাচীরের ওধার থেকে ঢিল ছুড়্‌ছে। কিন্তু তবুও মানুষের সান্নিধ্যে স্বস্তি বোধ হল।

কেন যেন মায়ের কথা ভাবতে লাগলাম। একবার সিগরেট খাবার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি তখন দেখে ফেলেন এবং আমাকে মারতে থাকেন। কিন্তু আমি বলে উঠি, “আমার গায়ে হাত দিও না। এম্নিতেই আমার খুব খারাপ লাগে।”

তারপরে শাস্তিস্বরূপ আমাকে স্টোভের পিছনে দাঁড় করিয়ে তিনি দিদিমাকে বলেন, “ছেলেটা পাষাণ। ও কাউকেই ভালোবাসে না।”

সে কথা শুনে আমার মনে বড় লাগে। মা যখন আমাকে শাস্তি দিতেন তখন তাঁর জন্য আমার কষ্ট হত; তাঁরই জন্য অস্বস্তি বোধ করতাম। কারণ তিনি ন্যায় বা অন্যায় করেই হোক আমাকে কদাচিৎ শাস্তি দিতেন। জীবনে মোটের ওপর প্রচুর দুর্ব্যবহার পেয়েছি। উদাহরণ-স্বরূপ, প্রাচীরের ওধারে যারা ছিল তারা নিশ্চয়ই জানে গোরস্থানে আমি একা বলে আমার ভয় করছে, তবুও তারা আমাকে ভয় দেখাতে চায়। কেন?

চীৎকার করে তাদের বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, "তোমাদের শয়তানে ধরুক"। কিন্তু তাতে ফলটা হত খুবই খারাপ। কে জানে শয়তান সে কথায় কি ভাববে? কারণ সে যে কাছেই কোথাও আছে সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না। বালিতে যথেষ্ট অভ্র ছিল। জ্যোৎস্নায় সেগুলো ম্লান ভাবে চিক চিক করছিল। তাতে মনে পড়ে গেল, একদিন ওকা-নদীর ওপর একখানি ভেলায় শুয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ একটি ব্রীমমাছ প্রায় আমার মুখ লক্ষ্য করে সাঁতার দিয়ে আসতে আসতে পাশ ফিরলো। তার ফলে তার কানকোটাকে দেখাতে লাগলো মানুষের গালের মতো। সে আমার দিকে পাখির মতো গোল গোল চোখ দিয়ে তাকাতে তাকাতে গাছ থেকে খসাপাতার মতো লটপট করে জলে ডুবে গেল।

আমার স্মৃতিপথে উদিত হতে লাগলো জীবনের নানা ঘটনা। যেন সেগুলো আমার মনে ভয়ে যে-সব কল্পনার উদয় হচ্ছিল সেগুলোকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল।

একটা সজারু বলের মতো গড়াতে গড়াতে এল। তাকে দেখে মনে পড়লো ভূতের কথা।...

দূরে শহরের মাথায় ফুটছিল আলো। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এসে আমার গালে ও চোখে লাগছিল। কম্বলখানা গায়ে বেশ ভাল করে জড়িয়ে বসলাম—যা হয় হোক।

দিদিমা আমাকে জাগালেন। আমার পাশে দাঁড়িয়ে গা থেকে কম্বলখানা খুলতে খুলতে বললেন, "ওঠ। শীত করছে? ভয় পাও নি?"

—"ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু কাউকে বলো না—অন্য ছেলেদের বলো না।"

তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বলবো না? তুমি যদি ভয় না পেয়ে থাক তবে তোমার বড়াই করবার কি আছে?"

দুজনে বাড়ি চললাম। পথে যেতে যেতে তিনি বললেন, "এ সংসারে নিজেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে, বাছা। তুমি যদি নিজেকে না শিক্ষা দিতে পার আর কেউ তোমাকে শিক্ষা দিতে পারবে না।"

সন্ধ্যার মধ্যেই হয়ে উঠলাম বীর। প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "একি সম্ভব যে তুমি ভয় পাও নি?"

যখন বললাম "ভয় পেয়েছিলাম" তখন তারা মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "হাঁ! দেখলে তো!"

দোকানদারটা বলে বেড়াতে লাগলো, "এটা সম্ভব যে, লোকে যখন বলে কালিনিন ঘুরে বেড়ায় তখন বাজে কথাই বলে থাকে। কিন্তু সে যদি সত্যিই ঘুরে বেড়ায়, তাহলে

কি মনে করো, সে ওই ছেলেটাকে ভয় দেখাতে পারতো না? তাহলে সে ওকে গোরস্থান থেকে তাড়িয়ে দিত।”

লাডমিলা আমাকে দেখতে লাগলো বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঝরে পড়তে লাগলো তার অন্তরের স্নেহ। দিদিমাও আমার ওপর খুশি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই আমাকে বেশ একটু খাতির করতে লাগলেন। কেবল চারকা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, “ওর পক্ষে কাজটা ছিল খুবই সহজ—ওর দিদিমা যে ডাইনী!”

তিন

আমার ভাই কোলিয়া ভোরের ছোট তারাটির মতো সবার অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেল। দিদিমা, সে আর আমি একটি ছোট ছাপ্পড়ে ছেঁড়া কাপড় ও নানারকমের ন্যাকড়া ঢাকা কতকগুলো তক্তার ওপর ঘুমোতাম। বাঁ'র দিকের সেই ঘরখানার জোড়-দেওয়া দেওয়ালের ওধারে ছিল হাঁস-মুরগীর ঘর। সন্ধ্যার পর শুনতে পেতাম, তন্দ্রালু, হৃষ্ট-পুষ্ট মুরগীগুলো ঝটপট করছে ও ডাকছে। ভোরবেলা তারা সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে আমাদের জাগিয়ে দিত।

দিদিমাকে জাগালে তিনি রাগে গুমরে বলে উঠতেন, "তোদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বো।"

আগেই আমার ঘুম ভেঙে যেত। দেখতাম, দেওয়ালের জোড়ের ফাঁক দিয়ে আমার বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। তাতে যে সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি নাচতো সেগুলিকে আমার মনে হত ঠিক রূপকথার শব্দের মতো। ইঁদুরে দেওয়ালের তক্তাগুলো কেটে ফেলেছিল। সেগুলোর ওপর গায়ে কালো ছিট-দেওয়া লাল রঙের গুবরে পোকা ছুটে বেড়াতো।

মুরগীর ঘর থেকে আসতো তার বিষ্ঠার বোটকা গন্ধ। কখন কখন তা সইতে পারতাম না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতো। তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমাদের কাঠের ঘরখানা থেকে বেরিয়ে তার ছাদে গিয়ে উঠতাম। দেখতাম

লোকে তখন ঘুম থেকে উঠছে।...তাদের সবাইকে মনে হত কোন পাখি, পশু বা বন্য জন্তুর মতো।

এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল প্রভাতও আমাকে করে তুলতো বিষণ্ণ। ইচ্ছা হত কোন প্রান্তরে চলে যাই যেখানে কেউ যায় না। কারণ সেই বয়সেই আমার জ্ঞান হয়েছিল যে, মানুষই উজ্জ্বল দিনকে সর্বদা মাটি করে দেয়।

একদিন যখন ছাদে শুয়ে আছি দিদিমা আমাকে ডাকলেন। তিনি তখনও শুয়েছিলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "কোলিয়া মারা গেছে।"

দেখলাম বালিশ থেকে তার মাথা গড়িয়ে পড়েছে কম্বলের ঢাকাখানার ওপর। সে পড়ে আছে পাংশু, শীর্ণ; তার শার্টটা উঠে গিয়ে গুটিয়ে আছে তার গলার কাছে; তার ফোলা পেটটি ও বাঁকা পা দুখানি আছে বেরিয়ে; মাথাটি আছে একদিকে বেঁকে।

দিদিমা চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে ও চলে গেছে। যদি বেঁচে থাকতো তাহলে হতভাগা টার কি হত?"

যেন নাচছেন এম্নি ভাবে পা ফেলতে ফেলতে দাদামশাই এলেন। এবং খুব সাবধানে কোলিয়ার চোখ দুটো দু আঙুলে ছুঁলেন।

দিদিমা রাগের সঙ্গে বলে উঠলেন, "হাত না ধুয়ে ওকে ছোঁয়ার মানে কি?"

তিনি বললেন, "দেখ ব্যাপার! ও জন্মালো, বেঁচে রইলো, খেল—একেবারে শুধু শুধু।"

দিদিমা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "তোমার ঘুম এখনও ভাঙে নি।"

দাদামশাই তাঁর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং যেতে যেতে বললেন, "আমি ওকে গোর দেব না ; ওর সম্বন্ধে তুমি যা খুশি করতে পারো।"

—"হতচ্ছাড়া !"

আমি বেরিয়ে গেলাম এবং সন্ধ্যার আগে ফিরলাম না। পরদিন কোলিয়াকে গোর দেওয়া হল মায়ের কবরের পাশে। কবরের মধ্যে মায়ের কফিনের কালো তক্তাগুলো দেখা যাচ্ছিল। ইয়াজের বাবা কবরটা খুঁড়ে ছিল সস্তায়। তার জন্য সে আমার সামনেই আত্মপ্রশংসা করছিল। আমার কুকুরটিকে নিয়ে আমি কবরটার পাশে বসে ছিলাম। ইয়াজের বাবাও বসে ছিল। কোলিয়ার কফিনটাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দেওয়া হল সেই কালো তক্তাগুলোর পাশে। ইয়াজের বাবা লাফ দিয়ে উঠে কোদাল ও পা দিয়ে তার ওপর মাটি ফেলতে লাগলো। দিদিমা ও দাদামশাই নীরবে তাকে সাহায্য করতে লাগলেন। পাদ্রি নেই, ভিখারী নেই, সেই ক্রশের বনে কেবল আমরা মাত্র চারজন রয়েছি। দিদিমা ইয়াজের বাবাকে টাকা দিতে দিতে ভৎ'সনার সুরে বললেন, "তুমি ভারিয়ার কবরের খানিকটা কেটে ফেলেছো।"

—"তা ছাড়া আর কি করতে পারি ? ওটা না কাটলে অন্য কারোটার খানিকটা কাটতে হত, কিন্তু ওর জন্যে ভাবনার কিছু নেই।"

দিদিমা কবরটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন,

তারপর উঠে গেলেন। দাদামশাই চললেন তাঁর পিছন পিছন।...

পথে যেতে যেতে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কবরের মধ্যে সেই কালো জিনিসটা মায়ের কফিন ?"

তিনি সক্রোধে বললেন, "হাঁ। হতভাগা কুকুর! এখনও বছর ঘুরলো না আমাদের ভারিয়ার আর কিছু নেই। বালিতে এ রকম করেছে। বালির ফাঁক দিয়ে জল চোঁয়ায়—"

—"আমরাও ওই রকম নষ্ট হয়ে যাবো ?"

—"সবই। কেবল ঋষি-তপস্বীদেরই কিছু হয় না।"

—"তুমি—তুমিও নষ্ট হয়ে যাবে ?"

তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমার মাথার টুপিটা ঠিক করে বসিয়ে গম্ভীর ভাবে আমাকে বললেন, "এ কথা আর ভেব না—না ভাবাই ভাল। শুনছো ?"

কিন্তু আমি ভাবতেই লাগলাম। মৃত্যু কি বিশ্রী! তার কথা মনে করতেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমার খুব খারাপ বোধ হতে লাগলো।

আমরা বাড়ি গিয়ে দেখি, দাদামশাই চায়ের আয়োজন করেছেন। বললেন, "এস একটু চা খাও। আমার চা-ও এর সঙ্গে দিয়েছি।"

তিনি দিদিমার কাছে গিয়ে তাঁর কাধে আস্তে আস্তে চাপড় মারলেন।

দিদিমা হাত তুলে বললেন, "এর মানে ?"

—"মানে, ভগবান আমাদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে সব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছেন।

হাতের আঙুলগুলোর মতো যদি পরিবারের সকলে মিলে-মিশে থাকতো—”

অনেক দিন পরে তিনি আবার নম্র, শান্তভাবে কথা বললেন। শুনতে শুনতে আশা হতে লাগলো বৃদ্ধ আমার ক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবেন আর সকালে কবরের মধ্যে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা ভুলিয়ে দেবেন। কিন্তু দিদিমা রুক্ষভাবে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, “ছেড়ে দাও ও কথা। সারা জীবন ধরে তুমি এই কথা বলছো, কিন্তু কে তাতে শুধরেছে? সারাটা জীবন তুমি সবকিছুকে লোহার গায়ে মরচের মতো কুরে খেয়েছো।”

দাদামশাই অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সকালে যা দেখেছিলাম সন্ধ্যায় ফটকে দাঁড়িয়ে লাড-মিলাকে ব্যথিত কণ্ঠে সে কথা বললাম, কিন্তু তাতে তার মনে বিশেষ রেখাপাত করলো বলে বোধ হল না। সে বললে, “যাদের বাপ-মা নেই তারাই বেশ আছে। আমার মা-বাবা যদি মারা যান তাহলে আমার বোনটিকে রেখে যাব আমার ভাইটিকে দেখবার জন্যে, আমি চলে যাব এক আশ্রমে। সেখানেই সারা জীবন কাটাবো, আর কোথায় যাবো? আমি খোঁড়া, কাজ করতে পারি না। আমার বিয়ে হবে না। তাছাড়া, আমার খোঁড়া ছেলে-মেয়েও হতে পারে।”

আমাদের রাস্তায় যে-সব স্ত্রীলোক ছিল তারা সকলে যেমন বলতো সে তেম্নি বিজ্ঞের মতো কথাগুলি বললে। সেই সন্ধ্যাটি থেকেই তার ওপর আমার যে অধিকার

ছিল সব দূর হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবন ঘুরলো ভিন্ন পথে। . ফলে তার সঙ্গে আমার দেখা হত কদাচিৎ।

আমার ভাইটি মারা যাবার কয়েকদিন পরে দাদামশাই বললেন, "আজ সকাল সকাল শুতে যাও। আমি তোমাকে ডেকে তুলবো। আমরা বনে গিয়ে কতকগুলো কাঠ আনবো।"

দিদিমা বললেন, "আর আমি সঙ্গে গিয়ে সেখান থেকে ওষুধের গাছ-গাছড়া তুলবো।"

ফার ও বারচের বনটা ছিল গ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটা জলা জায়গায়। তার এক দিকে ছিল ওকা-নদী আর একদিকে মস্কো যাবার বড় রাস্তাটি। বনটা ছিল শুকনো ও উপড়ানো গাছে ভরা। তার ওধারে সাভে-লোভের দাঁড়ার ওপর উঠেছিল ফারগাছের বন। কোমল সূক্ষ্ম পাতাভরা সেই গাছগুলোকে দেখাতো কালো তাঁবুর মতো।

সম্পত্তিটা ছিল কাউণ্ট শুভালভের। কিন্তু তার পাহারা দেবার ব্যবস্থা ভাল ছিল না। কুনাভিনের লোকেরা সেটাকে মনে করতো তাদেরই নিজের সম্পত্তি। তাই সেখানে যে-সব গাছ পড়ে থাকতো সেগুলো ও শুকনো কাঠ কেটে নিয়ে যেত। কখন কখন জীবন্ত গাছ কাঠতেও তাদের বাধতো না। লোকে শরতে যখন শীতের কাঠ মজুত করে রাখতো তখন তারা পিঠে কুড়ুল ও দড়ি নিয়ে দলে দলে যেত ওই বনে।

তাই আমরা তিনজনে ভোরে শিশিরভেজা রুপালি-

সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে চললাম। আমাদের বামে ওকা-পারে ভিয়াৎলোভের পাহাড়টির রাঙা গা ছাড়িয়ে সাদা নির্জন নোভোগোরোদের ওপর, বনভূমির মাথায়, গির্জার সোনালি গুম্বজগুলির চূড়ায় উঠছে রুষদেশের অলস সূর্যটি তার অলস মন্থর চালে। মলিন ওকার দিক থেকে তন্দ্রাভরে বয়ে আসছে মৃদু সমীর। শিশিরভারানত সোনালি রঙের ফুলগুলি দুলছে, সাদা রঙের ঘণ্টাফুলের দল মৌনভাবে মাটিতে পড়ছে নুয়ে। আরও যে-সব ফুল অনুর্বর বনপ্রান্তরে শুষ্কভাবে আটকে ছিল তারা এবং যে ফুলটির নাম "রাতের সুন্দরী" তার রক্ত রাঙা কুঁড়িগুলি বিকশিত হচ্ছে নক্ষত্রের মতো। বনটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো একটি কালো বাহিনীর মতো। ফারগাছগুলো প্রকাণ্ড পাখির মতো ডানা মেলে আছে, বারচ গাছগুলোকে দেখাচ্ছিল তরুণীর দলের মতো। মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলা জায়গাটির ঝাঁঝালো গন্ধ। আমার কুকুরটা লাল জিভ বার করে পাশে পাশে ছুটছে। সে মাঝে মাঝে থামছে, বাতাস শুঁকছে আর তার শিয়ালের মতো মাথাটা বিমূঢ়ের মতো নাড়ছে। দাদামশাই দিদিমার ছোট কোটটা গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা চাপা টুপি পরে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে, হাসতে হাসতে খুব সাবধানে চলেছেন যেন চুরি করবার মতলব। দিদিমা একটি নীল ব্লাউস ও একটি কালো সায়া পরে মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে বেশ আরামে থপথপ করতে করতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে গেলে জোরে চলা কষ্টকর।

আমরা বনটার যত কাছে যাই দাদামশাই ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "বন হচ্ছে ভগবানের বাগান। ভগবানের বাতাস ছাড়া আর কেউ গাছগুলোকে রোপন করে নি···যৌবনে আমি যখন নৌকোয় কাজ করতাম তখন জোগুলায়াতে যাই। বুঝলে লেকসি, আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তুমি কখন তা পাবে না। ওকার তীর ধরে কাসিমভ থেকে মৌরো অবধি, ভলগার তীরেও উরাল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে বন। অসীম, সুন্দর !"

দিদিমা আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চোখ ঠারলেন। আর দাদামশায় একটা ঢিপিতে হোঁচট খেতেই কতকগুলো কথা তাঁর মুখথেকে বেরিয়ে পড়লো। কথাগুলো অসংলগ্ন নিরস কিন্তু সেই থেকে আমার স্মৃতিতে লেগে আছে।

"ইয়ামারকা দিয়ে আমরা সারাটভ থেকে মাকারায় কতকগুলো তেলের খালি পিপে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের জাহাজের ক্যাপটেন ছিল পোরেশকার কিরিল। আর তার সহকারী ছিল একজন তাতার। লোকটার নাম আসফ বা ওই ধরনের কিছু হবে। আমরা যখন জোগুলায়াতে পৌছলাম তখন ঠিক বিপরীত দিক থেকে ঝড়ের মতো বাতাস বয়ে আসছিল। তার মোড় ঘুরলো না, জাহাজখানাও খুব দুলছিল দেখে আমরা তীরে নেমে গেলাম রান্না করতে। তখন মে মাস। ডাঙাটার চারধারে সমুদ্রের জল ছিল তীর সমান। ঢেউগুলো তার ওপর ভাসছিল পাখির ঝাঁকের মতো, যেমন করে কাশ্যপীয় সাগরের বুকে হাজার হাজার বুনো হাঁস খেলা করে থাকে। বসন্তকালে জোগুলায়ার

পাহাড়গুলো হয়ে ওঠে সবুজ, নবারুণ পৃথিবীতে ঢালে সোনার ধারা। আমরা নেমে বিশ্রাম করলাম। সকলের মধ্যে ভাব বেশ জমে গেল, বোধ হল যেন পরস্পরের দিকে পরস্পর আকৃষ্ট হচ্ছি। নদীতে সব কেমন ম্লান, ঠাণ্ডা কিন্তু ডাঙায় সব তপ্ত, সুগন্ধভরা। বেলা শেষে আমাদের কিরিল—লোকটা ছিল রুক্ষ মেজাজের আর বয়সও হয়েছিল—উঠে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুলে বললে, 'দেখো, বাবারা, আমি আর সর্দারও নই, চাকরও নই। তোমরা এখন নিজে নিজে চলে যাও। আমি যাবো বনে।' আমরা সকলে চমকে উঠলাম। লোকটা বলে কি? আমাদের ওপর একজন দায়িত্বশীল লোক না থাকা উচিত নয়—দেখ, একজন সর্দার না থাকলে লোকে ঠিকমতো চলতে পারে না। ভলগা দিয়ে চলবার সময় নয়। ওটা হচ্ছে সোজা রাস্তার মতো। পথ হারানোও সম্ভব। কারণ লোকেরা যখন একা থাকে তখন তারা জড়-বুদ্ধি পঙ্গুর মতো। তাদের কপালে কি হচ্ছে তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমাদের তো ভয় হল। কিন্তু জনকতক বললে, 'থামো!' তারপর সেই তাতারটি ধুয়ো তুললে, 'আমিও যাব।' তার পক্ষে কাজটা সুখের ছিল না। জাহাজের মালিকেরা তাকে দু'বার যাতায়াতের টাকা তখনও দেয় নি। সে বড় কম টাকা নয়। সে কালে সে টাকা ছিল অনেক। আমরা রাত অবধি তাদের সঙ্গে তর্ক করলাম। তারপর আমাদের দলের সাত জন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমরা বাকি রইলাম ষোলো কি চৌদ্দো জন। বন লোকের যা করে তা এই।"

—"তারা গিয়ে কি ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ?"

—"হতে পারে, আবার সন্ন্যাসীও হয়ে যেতে পারে। আমরা সে বিষয়ের আর খোঁজ নিই নি।"

দিদিমা বললেন, "হায় মা! লোকের কথা ভাবতে গেলে দুঃখিত না হয়ে থাকতে পারা যায় না।"

আমরা একটা স্যাঁতসেঁতে পথে কতকগুলো টিলা ও শীর্ণ ঝাউগাছের মাঝ দিয়ে বনে ঢুকলাম। মনে করেছিলাম, কিরিলের মতো বনে গিয়ে বাস করতে বেশ ভালই লাগবে। সেখানে মানুষের কচকচি নেই, দাঙ্গা-মারামারি বা মাতলামো নেই। সেখানে থাকলে দাদামশাইয়ের নক্কারজনক লোভ আর আমাদের মায়ের কবরটা ভুলে যাব। এগুলো আমাকে পীড়া দিত; মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখতো। একটা শুকনো জায়গায় পৌঁছলে দিদিমা বললেন, "এখন কিছু খেয়ে নিতে হবে। বোস।"

তাঁর ঝুড়িতে কাপড়ে জড়ানো ছিল রুটি, পেঁয়াজ, নুন আর জমাট দই। দাদামশায় তাঁর মুখের দিকে চোখ মিট মিট করে তাকাতে তাকাতে বললেন, "কিন্তু আমি তো খাবার কিছু আনি নি।"

—"ওতে আমাদের সকলেরই কুলিয়ে যাবে।" আমরা একটা ঝাউগাছের মাস্তুলের মতো গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলাম।...

পাইনের ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঠ থেকে বয়ে আসছে মৃদু বাতাস। লম্বা ঘাসের বন দুলছে। দিদিমা ওষুধের গাছ-গাছড়া তুলতে লাগলেন আর আমাকে

সেগুলোর গুণাগুণ বলতে লাগলেন। দাদামশায় পড়া গাছ-গুলো টুকরো করে টুকরো কাটতে শুরু করলেন। আমার কাজ ছিল সেগুলোকে এনে একজায়গায় জড় করা। কিন্তু আমি তাঁদের অলক্ষ্যে দিদিমার পিছু পিছু সেখান থেকে সরে পড়লাম। দিদিমাকে দেখাচ্ছিল, তিনি যেন গাছের মোটা গুঁড়িগুলোর মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। চলতে চলতে তিনি নিজের মনেই কথা বলছিলেন—"আমরা আবার অনেক আগেই এসেছি। এখন একটা ব্যাঙের ছাতাও পাওয়া যাবে না। ভগবান! তুমি গরিবদের কি রকম খবরদারী কর! ব্যাঙের ছাতা হল গরিবের খাবার।"

তিনি যাতে না বুঝ্‌তে পারেন, আমি খুব সাবধানে চুপি চুপি চল্‌তে লাগলাম,...ভগবান, গাছ-গাছড়া ও ব্যাঙের সঙ্গে তাঁর কথা-বার্তায় আমায় বাধা দিতে ইচ্ছা হল না। কিন্তু তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। বললেন, "দাদামশাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছ ?"

ফুলে ঢাকা কালো মাটি যেন একখানি কাপড়। তিনি মাটির দিকে নুয়ে বললেন যখন ভগবান মানুষের ওপর রাগ করে বন্যায় চরাচর ডুবিয়ে ধ্বংস করেছিলেন তখনকার কাহিনীটি। "কিন্তু ভগবানের মা তার আগেই সব-কিছুর বীজ সংগ্রহ করে একটি ঝুড়িতে সেগুলো রেখে ঝুড়িটা লুকিয়ে রেখে ছিলেন। তারপর বন্যা যখন শেষ হল, তিনি বললেন, সব জায়গা শুকিয়ে দাও। লোকে তোমার সুখ্যাতি করবে। সূর্য মাটি শুকিয়ে দিল। তিনি তখন বীজ ছড়ালেন। ভগবান দেখলেন। আবার পৃথিবী জীবজন্তু, গাছ-গাছড়া, গরু-ভেড়া,

মানুষে ভরে উঠলো। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কাজ কে করলে?' মা বললেন, 'আমি।' শূন্য পৃথিবী দেখে ভগবানেরও দুঃখ হয়ে ছিল। তাঁকে বললেন 'ভালই করেচো।'

গল্পটি ভাল লাগলো, কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "কিন্তু সত্যিই কি তাই হয়েছিল? ভগবানের মা বন্যার অনেক পরে জন্মে ছিলেন।"

এবার দিদিমার আবাক হবার পালা। বললেন, "ওকথা তোমায় কে বলেছে?"

—"স্কুলের বইতেই লেখা আছে।"

তিনি আশ্বস্ত হলেন; তারপর আমাকে উপদেশ দিলেন। "ও কথা ছেড়ে দাও—ভুলে যাও ও কথা! কেবল বই থেকে—ও সব মিছে কথা। বইগুলো মিছে কথায় ভরা।" তারপর সহাস্যে, সানন্দে বললেন, "দেখ একবার! ভগবান ছিলেন—আর তাঁর মা ছিলেন না? তাহলে তিনি জন্মালেন কোথা থেকে?"

—"জানি না।"

—"বেশ! 'জানি না' বলবার মতো শিক্ষা তোমার হয়েছে।"

—"পাদ্রি বলে ছিলেন, ভগবানের মায়ের জন্ম হয়েছে জোয়াকিম আর অ্যানা থেকে।"

দিদিমা রেগে উঠলেন। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন।

"তোমার মনে যদি এ রকম ধারণা থাকে তাহলে তোমার

গালে মারবো চড়।" কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই বুঝিয়ে দিলেন, "মেরী চিরকাল আছেন—সকলের আগে, সব কিছুর আগে থেকেই। ভগবান জন্মেছেন তাঁর কাছ থেকেই। তারপর—"

—"আর খ্রীস্ট—তাঁর বিষয় কি বল ?"

দিদিমা চুপ করে রইলেন। এবং বিমূঢ়ের মতো চোখ দুটি বন্ধ করলেন।

"—খ্রীস্টের সম্বন্ধে কি বল ? অ্যাঁ ? অ্যাঁ ?"

দেখলাম আমিই জয়ী হয়েছি। আধ্যাত্মিক রহস্যটি হয়ে উঠলো তাঁর ফাঁদ। কিন্তু তা আমার ভাল লাগলো না।

আমরা ক্রমে গিয়ে পৌঁছলাম বনের অন্তরে। কেমন একটা আবছায়া অন্ধকারে সব ঢাকা। সূর্যের সোনালি রশ্মি তাকে ভেদ করে এখানে-সেখানে লেগে আছে। কেমন এক বিচিত্র স্বপ্নালু মর্মরতায় সারা বন ভরা। তাতে মনকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে তুলছিল। নানা রকমের পাখি নানা সুরে ডাকছে — ক্রশবিল কিচির-মিচির করছে, টিটমাইসগুলো টুং টুাং ঘন্টা বাজাচ্ছে, গোল্ডফিনচ শিষ দিচ্ছে, কোকিল হাসছে, চ্যাফিনচের গান শোনা যাচ্ছে অবিরাম আর সেই অদ্ভুত পাখিটা, হফিনচ্, গেয়ে চলেছে গম্ভীর সুরে। আমাদের পায়ের চারধারে সবজে ব্যাঙগুলো লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কতকগুলো শিকড়ের মধ্যে সোনালি রঙের মাথাটি তুলে শুয়েছিল একটা সাপ। কাঠবিড়ালীরা কুট্ কুট্ শব্দে বাদাম ভাঙছিল। ঝাউগাছের মাঝে দেখা যাচ্ছিল তাদের লোমশ লেজ। বনের যত ভেতরে যাওয়া যায়, দেখা যায় ততই বেশি করে।

ঝাউগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রূপ ধরে দাঁড়াচ্ছে স্বচ্ছ বায়বীয় মূর্তি যেন বিরাটকায় মানুষ। তারা দেখতে দেখতে বনের সবুজের গায়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে শৈবালের চমৎকার কার্পেট। ঘাসের বনে রক্তের ফোঁটার মতো চক্ চক্ করছে লাল বিলবেরিগুলো। নাকে লাগছে ব্যাঙের ছাতার গন্ধ।

দিদিমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

বনের মধ্যে তাঁকে দেখাচ্ছিল গৃহকর্ত্রীর মতো। যেন তাঁর চারধারে রয়েছে পরিবারের সকলে। তিনি ভালুকের মতো চলেছেন। সবকিছু দেখছেন, প্রশংসা করছেন, ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। যেন তাঁর অন্তর থেকে স্নেহ-ভালোবাসা নির্গত হয়ে সারা বনে ছড়িয়ে পড়ছে।...

বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমার মনে হতে লাগলো যদি দস্যু হতাম তাহলে কি চমৎকারই না হত। লোভী লোকগুলোর কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। তাদের সুখী করতাম। তাহলে তারা বদমেজাজী কুকুরগুলোর মতো আর পরস্পরকে হিংসা করতো না; নিজেদের মধ্যে মারামারি কামড়াকামড়ি করতো না। এম্নি সব কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে চলেছি।

একটি গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার পাঁজরায় আঘাত লাগলো, ঘাড় ছড়ে গেল। গর্তটার তলায় আঠালো মাটির ঠাণ্ডা কাদায় বসে মনে হল, আমি নিজের চেষ্টায় সেখান থেকে উঠতে পারবো না। কথাটা মনে করে বড় লজ্জা বোধ হল। কিন্তু সেখান থেকে চীৎকার

করে দিদিমাকে ডেকে সন্ত্রস্ত করে তুলতেও ভাল লাগলো না। তবুও শেষ অবধি তাঁকেই ডাকতে হল। তিনি এসেই আমাকে টেনে তুলে বললেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ। ভাগ্য ভাল যে ভালুকের গর্তটা এখন খালি। যদি ঘরের মালিক ওখানে শুয়ে থাকতো তাহলে তোমার কি হত?"

হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এল।

তিনি আমাকে ছোট নদীটিতে নিয়ে গিয়ে আমার যে সব জায়গা কেটে ও ছড়ে গিয়েছিল সে-সব জায়গা ধুয়ে তাঁর সেমিজ ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে গেলেন রেল লাইনের ধারে গুমটিঘরে। নিজে নিজে আমার বাড়ি যাবার শক্তি ছিল না।

তারপর থেকে আমার এমন হল যে, আমি দিদিমাকে প্রত্যহ বলতে লাগলাম, "চল বনে যাই!"

দিদিমাও তাতে রাজি হতেন। আমরা বনে গিয়ে গাছগাছড়া তুলতাম, ফল ও বাদাম পাড়তাম, ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতাম।

যদিও আমরা তাঁর কাছ থেকে কখন এক টুকরোও খাবার পেতাম না, তবুও দাদামশায় বলতেন, "কুড়ে ভিক্ষুকের দল।"

বনভূমিটি আমার অন্তরে জাগিয়ে তুলতো শান্তি ও সান্ত্বনা। তাতে আমার সকল দুঃখ তলিয়ে যেত, যা-কিছু অপ্রীতিকর সব যেত মুছে। সে সময়ে আমার ইন্দ্রিয়গুলিও এক অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাভ করেছিল; আমার চক্ষু ও কর্ণ হয়ে ছিল আরও তীক্ষ্ণ, স্মৃতিশক্তি আরও প্রবল এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি হয়ে ছিল আরও বিস্তৃত।

দিদিমাকে আমি যত দেখছিলাম ততই তিনি আমার মনে জাগিয়ে তুলছিলেন বিস্ময়। আমি তাঁকে মনে করতাম উচ্চস্তরের মানুষ; মনে করতাম, এই পৃথিবীতে তিনিই সকলের চেয়ে ভাল, সকলের চেয়ে বুদ্ধিমতী। আর এই বিশ্বাসটি তিনি আমার মনে অনবরত দৃঢ় করে তুলছিলেন। একদিনের ঘটনা বলছি। শেষ বেলার দিকে ব্যাঙের ছাতা তুলতে তুলতে আমরা বনের ধারে বাড়ির পথে এসে পড়লাম। দিদিমা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমি গাছ-গুলোর ওধারে গিয়ে খুঁজে দেখতে লাগলাম, আরও ছাতা আছে কিনা। হঠাৎ দিদিমার কথা শুনতে পেলাম এবং যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো তা এই, তিনি পায়ে-চলা পথের ধারে বসে শান্তভাবে ব্যাঙের ছাতাগুলোর গোড়া কেটে ফেলে দিচ্ছেন। আর তাঁর কাছে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধূসর রঙের রোগা কুকুর।

দিদিমা তাকে বল্‌ছেন, "তুমি এখন যাও! যাও! যাও! ভগবান তোমার সহায় হোন।"

কিছুদিন আগেই ভালেক আমার কুকুরটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল। তাই কুকুরটিকে আমার নেবার বড় ইচ্ছা হল। আমি ছুটে পথটার কাছে গেলাম; কুকুরটা কিন্তু ঘাড় সোজা করে অদ্ভুতভাবে উঁচু হয়ে বসলো। এবং আমার দিকে সবুজ, ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে পিছনের পা দুখানার মধ্যে লেজ গুটিয়ে এক লাফে বনে ঢুকলো। তার চাল-চলন কুকুরের মতো নয়। আমি শিষ দিতেই সে চট্ করে ঝোপের মধ্যে সরে গেল।

দিদিমা সহাস্যে "তুমি দেখেছো ? প্র আমিও ঠকে ছিলাম। মনে করেছিলাম ওটা কুকুর। তারপর আবার দেখে বুঝলাম ভুল করেছি। ওর দাঁতগুলো, ঘাড়টাও নেকড়ে বাঘের মতো। আমার খুব ভয় হয়েছিল। ওকে বললাম, 'যদি নেকড়ে বাঘ হও সরে পড়।' গ্রীষ্মকালে নেকড়ে বাঘগুলো যে ভয়ঙ্কর থাকে না এটা ভালো।..."

বনে তিনি কখন ভয় পেতেন না, ঠিক পথ চিনে বাড়িও যেতেন। ঘাসের গন্ধে তিনি বুঝতে পারতেন কোন জায়গায় কি রকমের ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যাবে। সে বিষয়ে আমাকে তিনি মাঝে মাঝেই পরীক্ষা করতেন।

গাছের গুঁড়িতে সামান্য দাগ থেকেই তিনি আমাকে দেখিয়ে দিতেন কাঠবিড়ালী কোন্ কোটরে বাসা করেছে। আমি গাছে উঠে তার বাসাটি ভেঙে তার শীতের সঞ্চয় সমস্ত বাদাম লুঠ করতাম। কোন কোন বাসায় কখন কখন সের পাঁচেকও বাদাম থাকতো। একদিন আমি যখন একটা বাসা ভেঙে বাদাম লুঠ করছি এক শিকারী গুলি করে আমার পাঁজরায় সাতাশটি ছররা ঢুকিয়ে দিলে। দিদিমা ছুঁচ দিয়ে এগারটি ছররা বার করে দিয়েছিলেন। বাকীগুলো আমার গায়ে ছিল বহুকাল। সেগুলো দু-একটি করে বেরিয়ে ছিল।

শান্তভাবে বেদনা সহ্য করেছিলাম বলে দিদিমা আমার ওপর খুশি হয়ে ছিলেন। তিনি আমার প্রশংসা করে ছিলেন, "বীর! যে সব চেয়ে সহিষ্ণু সেই হয় সব চেয়ে বুদ্ধিমান।"

ব্যাঙের ছাতা ও বাদাম বেচে তিনি যখনই কিছু জমাতে

পারতেন তখনই তা থেকে লোককে গোপনে দান করতেন আর নিজে পরতেন ছেঁড়া ময়লা পোশাক। এমনকি রবিবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটতো না।

দাদামশাই গজ গজ করতেন, "ভিখারীর চেয়েও অধম পোশাকে তুমি বেড়াও। আমাকে লোকের কাছে লজ্জা দাও।"

উত্তরে দিদিমা বলতেন, "তোমার তাতে কি? আমি তোমার মেয়ে নই। আমি বরও খুঁজে বেড়াই না।"

তাঁদের মধ্যে ঝগড়াটা হত ঘন ঘন।

দাদামশাই ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলতেন, "অন্যের চেয়ে বেশি পাপ আমি করি নি, কিন্তু আমার শাস্তি হচ্ছে সকলের চেয়ে বেশি।"

দিদিমা তাঁকে উত্যক্ত করতেন, বলতেন, "কার কি মূল্য তা শয়তান জানে।" তারপর আমাকে গোপনে বলতেন, "বুড়োর ভারী ভূতের ভয়! দেখ, কি রকম তাড়াতাড়ি উনি বুড়ো হচ্ছেন। এসব হচ্ছে ভয়ে—বেচারী!"

গ্রীষ্মকালে আমি খুব কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম এবং বনে বনে ঘুরে বেড়াবার ফলে হলাম বন্য। আমার সঙ্গীদের জীবনের সম্বন্ধে আমার কোন রকম আগ্রহ থাকলো না; লাডমিলাকেও আর ভাল লাগলো না। তাকে এমন বুদ্ধিমতী বোধ হতে লাগলো যেটা আমার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন দাদামশাই শহর থেকে আগাগোড়া ভিজে বাড়ি এলেন। তখন শরৎকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল। দরজায় চড়ুইয়ের

মতো গা ঝাড়া দিয়ে তিনি সদর্পে বললেন, "এই শয়তান, কাল তোমাকে একটা নতুন চাকরিতে যেতে হবে।"

দিদিমা রাগত জিজ্ঞেস করলেন "এবার কোথায় ?"

—"তোমার বোন মাত্রেনার কাছে—তার ছেলের কাছে।"

—"কাজটা খুব খারাপ করেছো।"

—"চুপ করে থাক নির্বোধ। তারা ওকে ড্রাফট্‌সম্যান করে তুলবে।"

দিদিমা মাথা নিচু করে রইলেন, আর কিছু বললেন না।

সন্ধ্যায় লাডমিলাকে বললাম, "শহরে যাচ্ছি। সেখানে থাকবো।"

সে গম্ভীর ভাবে বললে, "আমাকেও ওরা শিগগিরই সেখানে নিয়ে যাবে। বাবা আমার পাখানা একেবারে কেটে ফেলতে চান। তা হলে আমি ভালই থাকবো।"

গ্রীষ্মকালে সে খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। তার মুখের চামড়া হয়ে এসেছিল নীল, চোখ দুটি আরও বড়।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভয় হচ্ছে ?…"

—"হ্যাঁ।" সে নীরবে কাঁদতে লাগলো।

তাকে সান্ত্বনা দেবার কোন উপায় আমার ছিল না। কারণ শহুরে জীবন সম্বন্ধে আমারও ভয় হয়ে ছিল। দুজনে ঘেঁসাঘেঁসি করে অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলাম। নীরবতা আমাকে বড় পীড়া দিতে লাগলো। যদি তখন গ্রীষ্মকাল হত তাহলে দিদিমাকে আমার সঙ্গে যেতে বলতাম। তিনি যখন বালিকা ছিলেন তখন যেমন করে পথে বেরিয়ে পড়ে ছিলেন তেমনি করে আমার সঙ্গেও যেতেন। তাহলে

আমরা লাডমিলাকেও সঙ্গে নিতাম। তাকে একখানি ছোট গাড়িতে বসিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু তখন শরৎ কাল। পথের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভিজে বাতাস; আকাশ মেঘভারাক্রান্ত, পৃথিবী ম্লান। সবই বিশ্রী, নিরানন্দ দেখাতে শুরু করেছে।

চার

আবার শহরে এলাম। থাকতে লাগলাম একখানি শাদা রঙের দোতলা বাড়িতে। বাড়িখানি কে দেখে মনে পড়তো একটি কফিনের কথা। কফিনটা যেন তৈরী হয়েছে একসঙ্গে অনেকগুলো লোককে রাখবার জন্য। বাড়িখানা নূতন। তবুও মনে হত যেন অসুস্থ। সেটাকে দেখে মনে হত, একটি ভিখারী যেন হঠাৎ ধনী হয়ে উঠে খুব খেয়ে ফুলে উঠেছে। সেটা রাস্তার দিকে পাশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং যেখানে সম্মুখভাগ থাকবার কথা সেখানে প্রত্যেক তলায় ছিল চারিটি করে জানালা। নিচের তলার জানালার সামনে ছিল একটা সরু গলি, তার এধারে উঠোন; ওপরের জানালাগুলো থেকে দেখা যেত ধোপানীর ছোট বাড়িখানা।

রাস্তা বলতে আমি যা বুঝতাম সেখানে তা ছিল না। বাড়িখানার সামনে দিয়ে দুদিকে চলে গিয়েছিল একটা নোংরা গলি। সেটাকে দুভাগ করেছিল একটা সরু নালা। গলিটা শেষ হয়েছিল বাঁ দিকে গারদখানাতে গিয়ে। তার ওপর ছিল রাবিশ ও লম্বা কাঠের গাদা। শেষ দিকে ছিল ঘন পচা সবুজ জলের একটা পল্বল। গলিটার ডান দিকের শেষে ছিল জিয়েজদিন পুকুর। একটা হড়হড়ে ডোবা। গলিটার মাঝখানটা ছিল বাড়িখানার ঠিক সামনে। তার

অর্ধেকটা ছিল আবর্জনা, বিছুটি ও আগাছায় ভরা, বাকি অর্ধেকটাতে পাদ্রি ডোরিয়েডোনট একখানি বাগান তৈরী করে ছিল।

জায়গাটাতে মন নিরুৎসাহে, নিরানন্দে ভরে যেত। সেটাকে লোকে নিঃসঙ্কোচে, নিতান্ত নির্লজ্জের মতো নোংরা করে রেখে ছিল। তখন শরৎকাল। বৃষ্টিতে সেই পচা নোংরা মাটিকে ভেঙে-চুরে একরকম লাল আঠায় রূপান্তরিত করে ছিল। সেটা পায়ে লেগে থাকতো, কিছুতেই মুছতো না। এরকম ছোট জায়গায় এত নোংরা আমি আগে আর কোথায় দেখি নি। বন-প্রান্তরের পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত ছিলাম বলে শহরের এই কোণটি আমার মনে ঘৃণা জাগাতো।

গলিটার ওপারে চলে গিয়েছিল কালো, ভাঙা বেড়া। যখন দোকানে চাকরি করতাম তখন যেখানে থাকতাম সেই ছোট বাড়িটিকে দেখা যেত দূরে। বাড়িখানার সান্নিধ্য আমাকে আরও বেশি করে নিরুৎসাহ করতো। আমার মনিবটিকে আগেই চিনতাম। উনি আর ওঁর ভাই আমার মায়ের কাছে আসতেন। ওঁর ভাইটিই সেই গানটি গেয়েছিল—

"আদ্রিঁ পাপা—আদ্রিঁ পাপা।"

গান শুনে সকলেই হেসেছিল।

তাঁদের কারোই পরিবর্তন হয় নি।···বড়টির বিবাহ হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীটি ছিলেন চমৎকার, পাঁউরুটির মতো সাদা, চোখ দুটি বড় ও কালো। প্রথম দিনেই তিনি আমাকে দুবার বললেন, "আমি তোমার মাকে একটি লম্বা রেশমের জামা দিয়েছিলাম।"

কি জানি কেন, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হল না তিনি জামাটি দিয়েছিলেন আর মা সেটি নিয়ে ছিলেন। তিনি কথাটি আবার মনে করিয়ে দিতে বললাম, "আপনি তাঁকে দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল। এতে বড়াই করবার কিছু নেই।"

তিনি আমার কাছ থেকে চমকে সরে গেলেন।

—"কি—ই—ই? তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছো?"

তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো, চোখ দুটো ঘুরতে লাগলো। তাঁর স্বামীকে ডাকলেন।

তিনি এলেন, হাতে কমপাস, কানে পেনসিল। স্ত্রীর কাছে সব শুনে বললেন, "ওঁর সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে তুমি ভদ্রভাবে কথা বল্‌বে। ধৃষ্টতা দেখিও না।" তারপর স্ত্রীকে সহিষ্ণু ভাবে বললেন, "তোমার এই সব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমার কাজে বাধা দিও না।"

—"বাজে ব্যাপার মানে? যদি তোমার আত্মীয়েরা—"

- "গোল্লায় যাক আমার আত্মীয়েরা।" বলে তিনি বেগে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁরা যে দিদিমার আত্মীয় একথা ভাবতে আমার মন চাইছিল না। অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু শিখে ছিলাম যে, নিঃসম্পর্কীয়দের চেয়ে আত্মীয়-স্বজনেরাই পরস্পরের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করে। কারণ নিঃসম্পর্কীয়দের চেয়ে তারা দোষ-ক্রুটির কথা জানে বেশি। এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ লাগে বেশি করে।

গৃহে শাশুড়ী-বধূতেও বনিবনা ছিল না। দুজনের মধ্যে

প্রায়ই ঝগড়া হত। শাশুড়ী কিছু রান্না করলে বধূ বলতেন, "আমার মা এটা এরকম ভাবে রাঁধেন না।"

শাশুড়ী বলতেন, "তাই যদি হয় তাহলে সে জিনিসটা রাঁধতো খারাপ করে।"

—"ঠিক উল্টো—তিনি আপনার চেয়ে এটা ভাল করেই রাঁধতেন।"

—"এ বাড়ির গিন্নী আমি।"

—"তাহলে আমি কি ?"

এইখানে আমার মনিব বাধা দিয়ে থামিয়ে দিতেন ; বলতেন, "থাম…থাম। তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা কি পাগল হলে ?"…

আমার মনিবের স্ত্রী তাঁর দেবরটির প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। স্বামী ও দেবরে লম্বা টেবিলের ধারে কাজ করতেন। কিন্তু ঘরের অনুপাতে টেবিলখাখানা ছিল অনেক বড়। একদিন তিনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সের সঙ্গে টেবিলের গা ঘেঁষে যাবার সময় দেবরটি বললেন, "এখানে এসে গোলামাল করো না।"

তিনি স্বামীকে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, "ভাসিয়া ওকে চেঁচাতে বারণ কর।"

তাঁর স্বামী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা। কিন্তু এখানে এসে টেবিল নাড়িও না।"

—"আমি মোটা, ঘরখানা খুব ছোট।"

—"আচ্ছা। আমরা গিয়ে বড় বৈঠকখানাটাতে কাজ করবো।"

কিন্তু তিনি রুষ্ট হয়ে উঠে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "বড় বৈঠকখানাতে তোমরা কাজ করবে কিসের জন্যে ?"

ঠিক সেই সময় দরজায় দেখা দিলেন শাশুড়ী। তিনি সেখান বললেন, "ওর আক্কেলটা দেখলে ভাসিয়া ও জানে যে তোমরা কাজ করছো। তবুও অন্য চারখানা ঘর নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।"

দেবর হাসলেন। হাসিতে নষ্টামি ফুটে উঠলো। কিন্তু স্বামী বললেন, "হয়েছে !"

কিন্তু বধূ অঙ্গ-ভঙ্গি করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর হাব-ভাবে ফুটে উঠলো বিষ। তিনি বললেন, "আমি মরবো। মরবো !"

স্বামী হুঙ্কার দিলেন, "আমার কাজে বাধা দিও না··· এটা হল পাগলের বাড়ি। আমি তোমাদের সকলকে খাওয়াবার জন্যে খেটে সারা হচ্ছি আর···"

এই সব কলহে প্রথম প্রথম আমার ভয় হত। বিশেষ করে বধূটি যেদিন ছুরি হাতে ছোট কুঠরিটাতে ঢুকেই দুটি দরজাই বন্ধ করে পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগলেন, সেদিন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মিনিট খানেকের জন্য বাড়িখানা চুপ-চাপ হয়ে গেল। তারপর আমার মনিব জোর করে কুঠরিটার দরজা খোলবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তখন তিনি নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে বললেন, "আমার পিঠে উঠে ওপর থেকে ছিটকিনিটা খুলে দাও।"

আমি এক লাফে তাঁর পিঠে উঠে দরজার মাথার সার্সি ভেঙে সেখান দিয়ে ঝুঁকতেই আমার মনিবের স্ত্রী আমার

মাথায় ছুরির ফলা দিয়ে মারতে লাগলেন! তবুও আমি ছিটকিনিটা এক রকম করে খুলে ফেললাম। আমার মনিব তাঁর স্ত্রীকে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তার আগে দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা ধস্তাধস্তি হল। রান্না ঘরে গিয়ে তিনি ছুরিখানা কেড়ে নিলেন। আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসে আমার মাথার যেখানে ছড়ে গিয়েছিল সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে বুঝতে পারলাম, আমি অনেক কষ্ট করেছি। ছুরিখানা এমন ভোঁতা যে ওটা দিয়ে এক টুকরো রুটিও কাটা যায় না। কাজেই কেউ ওটা দিয়ে তার গায়ে একটু আঁচড়ও কাটতে পারবে না। তা ছাড়া আমার মনিবের পিঠে ওঠবারও দরকার ছিল না। আমি চেয়ারে উঠেই দরজার কাচখানা ভেঙে ফেলতে পারতাম। তবে বয়স্ক লোকের পক্ষে কাজটা করা ছিল খুব সহজ। কারণ তার হাত আরও লম্বা। সেই ঘটনাটির পর থেকে তাদের কলহে আর আমি ভয় পেতাম না।...

আমার মনিবরা লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। সে সব আলোচনা শুনে আমার সেই বুট জুতোর দোকানের কথা মনে পড়তো। তাঁদের কথাবার্তাও ছিল সেই রকম। তাঁদের ধারণা ছিল সেই শহরের যে কোন লোকের চেয়ে তাঁরাই উৎকৃষ্ট মানুষ। তাঁরা ভদ্রতার নিয়ম-কানুনগুলোর একেবারে খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত জানতেন এবং নির্মমভাবে লোকের সমালোচনা ও বিচার করতেন। আমার মনিবদের সেই সব নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে আমার অন্তরে জেগে উঠতো প্রচণ্ড ক্রোধ ও বিদ্রোহ। সেগুলো ভাবতে বড় আনন্দ পেতাম।

আমাকে বহু কাজ করতে হত। পরিচারিকার যা কাজ সে সবই আমি করতাম। প্রত্যেক বুধবার রান্নাঘর ধুতাম, পেতলের যত বাসন-পত্র ছিল সব মাজতাম, প্রতি শনিবারে দোতলা-একতলার ঘরগুলো ও সিঁড়ি ঝাঁটদিতাম। আমাকে কাঠ কাঠতে ও কাপড়-চোপড় কাচতে হত। এবং রান্নার তরি-তরকারি কুটে দিতে হত। ঝুড়ি নিয়ে আমার মনিবের স্ত্রীর সঙ্গে বাজারে গিয়ে বাজারও বয়ে আনতাম। এ সব ছাড়াও দোকানে ও ডাক্তারখানায় যাওয়া তো ছিলই।

আমার আসল মনিব ছিলেন দিদিমার বোন। তিনি সর্বদা হট্টগোল করতেন, কিছুতেই শান্ত হতেন না। তাঁর মেজাজও ছিল রুক্ষ। রোজ ভোর ছটায় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে খালি সেমিজটি গায়ে দিয়ে ঘরের কোণে বিগ্রহের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি ভগবানের কাছে বহুক্ষণ ধরে তাঁর নিজের ছেলেদের ও বধূটির বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন।

তাঁর কান্না শুনে আমার ঘুম ভেঙে যেত। আমি আধ ঘুমঘোরে কম্বলের তলা দিয়ে তাঁকে দেখে সভয়ে তাঁর প্রার্থনা শুনতাম। সার্সি দিয়ে ঘরে ঢুকতো শারদ-ভোরের ম্লান আলো।...

তিনি কপাল ঠুকে, বুক চাপড়ে বলতেন, "হে ভগবান, আমার বউমাকে শাস্তি দাও। ও আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার জন্যে ওকে নাকের জলে চোখের জলে করো। আর আমার ছেলের চোখ ফুটিয়ে দাও—ও দেখুক। হে ভগবান —আমার ছেলের ওপর দয়া করো প্রভু।"

ছোট ছেলেটি রান্নাঘরে শুতেন। মায়ের কান্না শুনে তাঁর

ঘুম ভেঙে যেত। ঘুমজড়িত কণ্ঠে তিনি বলতেন, "মা, তুমি আবার বউকে শাপ দিচ্ছ? কি বিশ্রী!"

বৃদ্ধা দোষীর মতো ফিস্ ফিস্ করে বলতেন, "আচ্ছা তুমি ঘুমোও।" হয়তো মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে আবার আরম্ভ করতেন, "হে প্রভু, ওদের গতর নস্ট হোক, পৃথিবীতে কোথাও যেন ওরা একটু ঠাঁইও না পায়!"

আমার দাদামশাইয়ের মুখেও কোনদিন এমন ভয়ঙ্কর প্রার্থনা শুনি নি।

প্রার্থনা শেষ করে বৃদ্ধা আমাকে জাগাতেন। "ওঠ। ভোরে না উঠলে সব কাজ সারবে কি করে? স্যামোভার ঠিক কর। কাঠগুলো ঘরে নিয়ে এস। কাল রাতে সেগুলো গুছিয়ে রাখ নি?"

তাঁর বকবকানি যাতে শুনতে না হয় সেজন্য তাড়াতাড়ি কাজ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাঁকে খুশি করা ছিল অসম্ভব। তিনি সারা রান্নাঘরে তুষার-ঝড়ের মতো বেড়াতেন আর অনর্গল বকতেন।

রবিবার ছাড়া অন্য দিনে আমি কিনতাম সের খানেক লাল আটার রুটি ও আমার মনিবের স্ত্রীর জন্য কিছু ছোট রুটি। সওদাটা ঘরে আনলেই মেয়েরা সেটা সন্দেহের চোখে দেখতেন, হাতে নিয়ে নাচিয়ে ওজন করতে করতে জিজ্ঞেস করতেন, "ফাউ দেয় নি? দেয় নি? হাঁ করো তো!" তারপরই বিজয় গর্বে বলে উঠতেন, "ফাউটা ও খেয়েছে। ওই যে দাঁতে লেগে আছে। দেখছো, ভাস্যা?"

আমি ইচ্ছার সঙ্গেই কাজ করতাম। ঘরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে

জঞ্জাল বার করে ফেলে দিতে, ঘর ধুতে, পেতলের বাসন-পত্র মাজতে, ঘুলঘুলি সাফ করতে, দরজার পেতলের হাতল মেজে ঝকঝকে করতে আমার ভাল লাগতো। মেয়েরা যখন ঠাণ্ডা মেজাজে থাকতেন তখন তাঁদের অনেকবার বলতে শুনেছি, "ওর খুব উৎসাহ।"

—"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও।"

—"তবে বড় গোঁয়ার।"

—"কিন্তু মা, ওকে শিক্ষাই বা দিয়েছে কে?"

এবং তাঁদের দুজনকে সম্মান করতে শেখাতেন। কিন্তু আমি তাঁদের মনে করতাম বোকা। তাঁদের পছন্দ করতাম না, তাঁদের কথাও শুনতাম না, মুখে মুখে জবাব দিতাম। আমার ওপর তাঁদের বক্তৃতার কি ফল হয়েছিল বধূটি নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। তাই আমাকে প্রায়ই বলতেন, "মনে রেখ, তোমাকে কোন্ পরিবার থেকে আনা হয়েছে! তোমার মাকে আমি একটা রেশমের পোশাক দিয়েছিলাম।"

তার উত্তরে আমি একদিন বললাম, "আপনি কি চান যে আমি খাটতে খাটতে মরে গিয়ে সেটার দাম শোধ দেব?"

কথাটা শুনে তিনি আঁৎকে উঠলেন; বললেন, "...ওরে বাবা! এ ছেলে যে ঘরেও আগুন লাগাতে পারে!"

খুবই অবাক হলাম। তিনি ও কথা বললেন কেন?

একবার তাঁরা দুজনেই মনিবের কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। মনিব আমাকে কঠোর স্বরে বললেন, "দেখ বাপু, সাবধান হয়ে চলো।" কিন্তু একদিন তিনি তাঁর মা ও স্ত্রীকে বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা দুটিতে

বেশ! তোমরা ওকে এমন ভাবে খাটাও যেন ও একটা ঘোড়া। আর কোন ছেলে হলে তাকে খাটিয়ে মেরে ফেলবার আগেই সে পালাতো।”

এই কথায় স্ত্রীলোক দুটি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। তাঁর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে পা ঠুকে বললেন, “ওর সামনে তুমি এমন কথা কি করে বললে? নির্বোধ! এর পর ওকে নিয়ে আমি কি করবো? আমার শরীরের এখন যে অবস্থা!”

মাও কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ছেলেটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলছো।”

তাঁরা চলে গেলে আমার মনিব কঠোর ভাবে বললেন, “এই শয়তান, দেখছো কি রকম গোলমাল বাধিয়েছো? আমি তোমার দাদামশাইয়ের কাছে আবার তোমাকে দিয়ে আসবো। তুমি আবার ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়িও।”

এই অপমানটি আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, বলে উঠলাম, “যখন ন্যাকড়া কুড়োতাম তখন আপনাদের এখানে যেমন আছি এর চেয়ে ভালই ছিলাম! আপনি আমাকে শেখাবেন বলে এখানে এনেছেন, কিন্তু আমাকে শিখিয়েছেন কি? বাসন মাজতে শিখিয়েছেন।”

তিনি আমার চুলের মুঠি ধরলেন, তবে জোরে নয় এবং আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, “দেখছি তুমি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছো। ওটা আমার কাছে চলবে না—নাঃ!”

মনে করেছিলাম, এর জন্য আমাকে তিনি রাখবেন না।

কিন্তু কয়েক দিন পরে, তিনি মোটা কাগজের একটা রোল, একটা পেনসিল, একটা স্কয়ার ও একটি রুলার হাতে করে রান্নাঘরে ঢুকলেন, এবং বললেন, "ছুরিগুলো পরিষ্কার করা হয়ে গেলে এইগুলো এঁকো।"

একখানি কাগজে আঁকা ছিল একখানি দোতলা বাড়ির সামনের দিক, কতকগুলো জানালা ও অদ্ভুত কারুকার্য।

মনিব বললেন, "এই নাও কম্পাস্। যেখানে রেখাগুলো শেষ হবে সেখানে ফুট্কি দিও। তারপর রুলার দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে এক ফুট্কি থেকে আর এক ফুট্কিতে রেখা টানবে। তাতে সেটা হবে সোজা। তারপর টানবে তাড়াতাড়ি। কাজ শুরু কর।"

কিছু পরিষ্কার কাজ পেয়ে বড় খুশি হলাম। কাগজ ও যন্ত্রগুলোর দিকে শ্রদ্ধা-ভয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝতাম না। যাই হোক হাত ধুয়ে আমি কাজ শিখতে বস্লাম। কাগজে কতকগুলো সোজাসুজি রেখা টেনে সেগুলো মিলিয়ে দেখলাম। তিনটেকে মনে হল, বাড়তি হয়েছে। তারপর তাড়াতাড়ি রেখা টেনে অবাক হয়ে দেখলাম বাড়িখানার সম্মুখ ভাগটা অদ্ভুত রকমে বিকৃত হয়ে গেছে। যেখানকার যা নয় সেখানে তা এসেছে।

আমি চোখের জল রোধ করতে পারলাম না, বহুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ভুলগুলো কেমন বিচিত্র একখানি ছবির সৃষ্টি করেছে! কি করে এমন হল জানবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কারণটা আবিষ্কার করতে পারলাম না। মনে করলাম, ভুলগুলো আমার খেয়ালমতো

শুধরে নেব। তাই বাড়িখানার সম্মুখের অংশে আলসেয়, ছাদের ধারে কাক, ঘুঘু ও চড়ুই আঁকলাম এবং নিচে জানলার সামনে আঁকলাম মানুষ। তাদের পা বাঁকা, মাথায় ছাতা। ছাতার আড়ালেও তাদের দৈহিক বিকৃতি ঢাকা পড়লো না। তারপর সমস্ত চিত্রখানির ওপর কতকগুলো তেরচা রেখা টেনে নিয়ে গেলাম আমার মানবের কাছে।

তিনি তো কপালে দুচোখ তুলে চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, "এসব কি ?"

বললাম, "বৃষ্টি হচ্ছে। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বাড়িখানাকে দেখায় বাঁকা-চোরা। কারণ বৃষ্টি বাঁকা-চোরা কি না। আর পাখিগুলো—এগুলো হচ্ছে, পাখি আশ্রয় নিচ্ছে। বৃষ্টির সময় ওরা আশ্রয়ে যায়। আর এই লোকগুলো—ওরা বাড়ি পালাচ্ছে। ওই যে—উনি একজন মহিলা, পড়ে গেচেন ; আর ও হচ্ছে একজন ফেরিওয়ালা লেবু বেচে।"

আমার মনিব বললেন, "বড়ই বাধিত হলাম" এবং টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে কথাগুলো বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠলেন, "তোমাকেই টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত।"

আমার প্রভুপত্নী এলেন পিপের মতো শরীর দোলাতে দোলাতে। আমার ছবিখানি দেখে বললেন, "মার ওকে।"

কিন্তু মনিব শান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠিক আছে। আমি নিজেও যখন কাজ শিখতে আরম্ভ করি, ওর চেয়ে ভাল পারতাম না।" তারপর লাল পেনসিলে বাড়িখানা ঢেকে দিয়ে বললেন, "আবার চেস্টা কর।"

দ্বিতীয়খানি হল আগের খানির চেয়ে ভাল। তবে তার একটি জানালা এসে পড়লো সামনের দরজার জায়গায়। কিন্তু বাড়িখানা খালি থাকবে এটা আমার ভাল লাগলো না, তাই তার মধ্যে নানা রকমের মানুষ আঁকলাম। জানালায় পাখা হাতে বসলেন মহিলারা, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বীর পুরুষেরা সিগরেট টানছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ধূমপান করেন না। তিনি নাক সিঁটকে আছেন। বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন গাড়োয়ান। তার কাছে শুয়ে আছে একটি কুকুর।

এবার আমার মনিব রুষ্টকণ্ঠে বললেন, "আবার এ সব আঁকছো?"

বললাম খালি বাড়ি ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন, বললেন, "এসব কি জঞ্জাল! যদি শিখতে চাও শেখ। কিন্তু এসব জঞ্জাল।"

তারপর যখন একখানি ঠিকমতো নকল করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম তিনি খুশি হলেন, বললেন "দেখ তুমি কি করতে পার। এখন যদি তোমার ইচ্ছা হয় এগোতে পারবে।" বলে তিনি আমাকে কিছু পাঠ দিলেন।

"এই বাড়িখানার একটা নক্সা তৈরী কর। দরজা, জানালা আর যা কিছু দরকার নক্সাতে এঁকে দেখাও। কেমন করে আঁকবে আমি দেখাবো না—তোমায় নিজে নিজে আঁকতে হবে।"

রান্নাঘরে গিয়ে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম, কেমন ভাবে আঁকবো? কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার শিল্পানুশীলনে বাধা পড়লো।

আমার মনিবের মা এসে দাঁড়ালেন এবং ঈর্ষাভরে বলে উঠলেন, "ছবি আঁকতে চাও, কেমন ?"

তিনি আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা টেবিলের ওপর এত জোরে ঠুকে দিলেন যে, আমার নাক ও ঠোঁট ছড়ে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে আমার কাগজখানা ছিঁড়ে যন্ত্রপাতিগুলো টেবিল থেকে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এবং কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। ওর নিজের মায়ের পেটের ভাই অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আর একটা বাইরের লোক কাজ শেখে ?"

আমার মনিব ছুটে এলেন, তাঁর পিছন পিছন এলেন তাঁর স্ত্রী। তারপরই শুরু হল এক উন্মত্ত দৃশ্য। তিন জনেই পরস্পরকে তেড়ে গেলেন, থুথু ফেলতে লাগলেন, চীৎকার শুরু করলেন। এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটলো স্ত্রীলোক দুটির চোখের জলে আর আমার কথায়। তিনি আমাকে বললেন, "শিখবার মতলবটা তোমাকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছো কি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।"

তাঁর ওপর আমার দয়া হল। তিনি নারীর দুটি কাছে একেবারে অসহায়। আমি আগেও বুঝেছিলাম, বৃদ্ধা আমার পড়াশুনো করাটা পছন্দ করেন না। কারণ তিনি ইচ্ছা করেই তাতে বাধা দিতেন।...তাই আঁকতে বসবার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম।

"আমার আর কিছু করবার নেই ?"

তিনি ভ্রূকুটি করে বলতেন, "থাকলেই বলবো," এবং তার কয়েক মিনিট পরেই আমাকে কোন কাজে পাঠাতেন বা বলতেন, "আজ কি পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়েছো ? কোণে কোণে জঞ্জাল, ধুলো জমে আছে। যাও, আবার ঝাঁট দাও গে।"

আমি গিয়ে দেখতাম, কিন্তু কোথাও ধুলো-জঞ্জাল পেতাম না।

তিনি বলে উঠতেন, "আমার মুখে মুখে জবাব দাও, তোমার এত সাহস ?"

একদিন তিনি আমার নক্সার ওপর ঘোল উল্টে ফেললেন, একদিন বিগ্রহের সামনের আলোটার তেল দিলেন ফেলে। অল্পবয়স্কা বালিকার মতো কৌশলে তিনি আমার ওপর উপদ্রব করতেন আর শিশু-সুলভ অজ্ঞতার সঙ্গে সে-সব কৌশল গোপনের চেষ্টা করতেন। সামান্য কারণে এমন চট করে রেগে উঠতে আমি কোন দিনই আর কোন লোককে দেখি নি; আর লোকের নামে নালিশ করতে এত ভালবাসে এমন কেউ আমার চোখেও পড়ে নি। অনুযোগ করা মানুষের স্বভাব, কিন্তু তিনি অনুযোগ করতে আনন্দ পেতেন, যেন গান করছেন।

তাঁর ছোট ছেলেটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল উন্মাদের মতো, তাতে আমার কৌতুক ও ভয় দুই-ই জাগতো।...

তাঁর ছোট ছেলেটি ছিল অমার্জ্জিত, কাঠ-ঠোকরার মতো জড়। তার নাকটাও ছিল কাঠ-ঠোকরার মতো লম্বা ও রঙচঙে, প্রকৃতি ছিল সেই রকম জড় ও অনমনীয়।

বৃদ্ধা অশ্লীল ভাষা, যে ভাষা শোনা যায় রাস্তায় মাতালের

মুখে, সেই ভাষা ব্যবহার করতেন সে সব কথা শুনতে বিশ্রী লাগতো।

তিনি ঘুমোতেন খুব কম। রাত্রে আমাকে অনেকবার ডেকে তুলতেন।...কিসের একটা ভয়ে যেন কাঁদতেন।... তাঁর ওপর আমার রাগ হলে মনে মনে বলতাম, কি দুঃখের যে ওঁর সঙ্গে দাদামশাইয়ের বিয়ে হয় নি! তাহলে উনি দাদামশাইকে একবার দেখাতেন।

আমার অবস্থা তিনি করে তুলতেন শোচনীয়। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁর ফোলা মুখখানা হত বিষণ্ণ, চোখ দুটি জলে ভরে উঠতো। তখন বড় করুণ ভাবে বলতেন, "তুমি কি মনে কর আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছি? আমি দুটো ছেলেকে পেটে ধরেছি, তাদের মানুষ করেছি। কিন্তু কিসের জন্যে? ওদের দাসী হবার জন্যে। তুমি কি মনে কর এ অবস্থাটা আমার মিষ্টি লাগে? আমার ছেলে একটা অচেনা স্ত্রীলোককে ঘরে এনেছে, সংসারে এসেছে নতুন লোক। এটা কি আমার পক্ষে ভাল?"

সরল ভাবে বলতাম, "না।"

তিনি বলতেন, "আহা! তবেই দেখ!" তারপর তিনি পুত্রবধূটির সম্বন্ধে নির্লজ্জের মতো আলোচনা শুরু করতেন, "একবার আমি ওর সঙ্গে নাইবার ঘরে গিয়েছিলাম। ওকে তখন দেখেছি। তুমি কি মনে কর ওর অহঙ্কার করবার মতো কিছু আছে? ওকে কি সুন্দরী বলা যায়?"

দাম্পত্য সম্পর্কটির সম্বন্ধে তিনি যে ভাবে আলোচনা করতেন, তা অত্যন্ত আপত্তিকর। প্রথম দিকে তাঁর কথা-

বার্তায় আমি বিরক্তি বোধ করতাম। কিন্তু শীঘ্রই তাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এবং খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। অনুভব করতাম, তিনি যা বলছেন তার মধ্যে কিছুটা মর্মান্তিক সত্য।

তিনি টেবিল চাপড়ে বলতেন, "নারী হচ্ছে শক্তি—সে স্বয়ং ভগবানকেও ঠকিয়ে ছিল। ইভের জন্য আমরা সকলেই নরকে যাবো। তোমার কি মনে হয়?"

আমাদের বাড়ির চত্বরটার ওধারে এসে পড়েছিল একখানা প্রকাণ্ড বাড়ির একটা পাশ। বাড়িখানাতে ছিল আটটা ফ্ল্যাট। সেগুলোর মধ্যে চারটিতে থাকতো সামরিক কর্মচারীরা আর পঞ্চমটিতে থাকতেন একজন পাদ্রি। চত্বরটা কর্মচারীদের চাকর ও আরদালিতে জম্ জম্ করতো। এই লোকগুলোর পিছনে ঘুরতো ধোপানী, ঝি ও রাঁধুনীর দল। সমস্ত বাড়ির রান্নাঘরে চলতো প্রেম, হত নাটকীয় দৃশ্যাভিনয়, তার সঙ্গে কান্না, কলহ ও মারামারি। সৈন্যেরা নিজেদের মধ্যে ও বাড়িওয়ালার লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতো; স্ত্রীলোক-গুলোকে মারতো।

চত্বরটা ছিল, যাকে বলে পাপ ও দুর্নীতির অর্থাৎ সুস্থ সবল যুবকদের উদ্দাম, অসংযত লালসার ক্ষেত্র। আমার মনিবরা এই জীবনকে খাবার সময় বেশ খুঁটিয়ে আলোচনা করতেন। বৃদ্ধা চত্বরের সকল কাহিনী জানতেন আর বেশ ফলাও করে বলতেন; তরুণী পুত্রবধূটি নীরবে সে সব কাহিনী শুনতেন। তাঁর ফোলা ঠোঁট দুখানিতে ফুটে উঠত হাসি। ভিকটার হা হা করে হেসে উঠতেন কিন্তু আমার মনিব ভ্রূকুটি করে বলতেন, "হয়েছে মা, থামো।"

বৃদ্ধা বলতেন, "আমি কথা বলতে পারবো না কেমন?"

ভিকটার তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "বলে যাও মা, বাধা কিসের? আমরা সকলেই তোমার ঘরের লোক।"

কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারতাম না, লোকে তার আপনার জনের সামনে এমন নির্লজ্জের মতো আলোচনা করবে কেন?

বড় ছেলেটি মায়ের সঙ্গে একা থাকতে চাইতেন না। থাকলেই তিনি বধূটির নামে নালিশ করতেন আর টাকা চাইতেন। বলতেন, "গির্জায় গিয়ে ভিখারীকে দেবো—মোমবাতি কিনবো।"

তিনি মায়ের হাতে তাড়াতাড়ি দু এক রুবল গুঁজে দিতেন আর বলতেন, "এটা ঠিক করছো না মা। তুমি নাও, তাতে কিছু নয়, কিন্তু ওটা ঠিক নয়।"

মা বলতেন, "বলছি তো দান করবো।"

—"তুমি ভিকটারকে নষ্ট করবে।"

—"তোমার ভাইকে তুমি ভালবাসো না এটা তোমার পক্ষে পাপ।"

মনিব উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যেতেন।

মায়ের প্রতি ভিকটারের আচরণ ছিল রুক্ষ। তিনি তাঁকে অবজ্ঞা করতেন। তিনি ছিলেন বেজায় পেটুক। সর্বদাই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতেন। রবিবারে তাঁর মা বিস্কুট তৈরী করতেন। তার খান কয়েক একটা পাত্রে পুরে আমি যে কাউচের ওপর ঘুমোতাম তার তলায় লুকিয়ে রাখতেন। খাবার পরই ভিকটার সেগুলো বার করে নিয়ে

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলতেন, "বুড়ী, আরও খানকতক রাখতে পারো নি ?"

মা বলতেন, "কেউ দেখে ফেলবার আগে শিগগির খেয়ে ফেল।"

একবার আমি পাত্রটি বার করে খান দুই কাসটার্ড খেয়েছিলাম। তার জন্য ভিকটার আমাকে মেরে আধমরা করে ফেলেছিলেন। আমি তাঁকে একটুও দেখতে পারতাম না, তিনিও আমাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে ঠাট্টা করতেন। আমাকে দিয়ে দিনে তিনবার তার বুট বুরুষ করাতো। আমি পাশের বারান্দায় শুয়ে থাকলে, ছোট জানালাটা খুলে এমন ভাবে থুথু ফেলতেন যাতে আমার মাথায় পড়ে।...

সেখানে আমার চারধারে এত নিষ্ঠুরতা, ধৃষ্টতা, এমন ন্যক্কারজনক নির্লজ্জতা দেখতে পেতাম যে, সে সব ছিল কুনাভিন স্ট্রীটের চেয়ে অনেক বিশ্রী। কুনাভিন স্ট্রীটের দু পাশে ছিল "গণিকালয়"। সেখানে ঘুরে বেড়াতো "পথ-বিলাসিনীরা।" সেখানকার আবিলতা ও পাশবিকতার তলে ছিল এমন একটা কিছু, যা অন্তরে রেখাপাত করতো, বুঝিয়ে দিত তার মূলে আছে ক্লান্তিকর অর্ধাহারক্লিষ্ট জীবন ও সুকঠোর শ্রম। কিন্তু এখানে এই সব লোক অতিরিক্ত খায়, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে এবং কর্মও চলে নিজপথে অবাধ ধারায়। এখানে সবকিছুর ওপর বাসা বেঁধে আছে ক্ষয়কর, স্বস্তিহীন অবসাদ।

আমার জীবনটি এম্নিতেই ছিল কঠোর, কিন্তু দিদিমা যখন আমাকে দেখতে আসতেন তখন তা হয়ে উঠতো কঠোরতর।

আমার মনিবের মা তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা করতেন না। দিদিমা এসে অপরাধীর মতো নীরবে বসে থাকতেন। তাঁর বোনের প্রশ্নের জবাব দিতেন কোমল কণ্ঠে সবিনয়ে। এই অবস্থাটা আমাকে পীড়া দিত। আমি তাঁকে রাগের সঙ্গে বলতাম, "তুমি এখানে বসে আছ কিসের জন্যে ?"

আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে তিনি উত্তর দিতেন, "তুমি চুপ করে থাক। তুমি এখানকার কর্তা নও।"

আমার মনিবের মা তাঁর কাছে তখন নালিশ করতেন, "ও পরের ব্যাপারে সর্বদা মাথা গলায়। অবশ্য তার জন্যে আমরা ওকে বকি বা মারি।"

তিনি দিদিমাকে থেকে থেকে জিজ্ঞেস করতেন, "আকুলিনা, তোমরা তাহলে এখন ভিখিরীর মতো আছ ?"

তাঁর স্বরে ফুটে উঠতো নষ্টামী।

দিদিমা বলতেন "অবস্থাটা দুঃখের।"

—"যেখানে লজ্জা না থাকে সেখানে দুঃখের নয়।"

—"লোকে বলে খ্রীস্টও পরের দয়ায় দিন যাপন করতেন।"

—"যারা নিরেট, যারা বিধর্মী তারাই ও কথা বলে আর তোমরা বুড়ো আহাম্মকের দল তাই বিশ্বাস করো। খ্রীস্ট ভিক্ষুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। জীবিত ও মৃতের বিচার করতে তিনি নিজ মহিমায় আবার আসবেন। তোমরা তাঁর কাছ থেকে পালাতে পারবে না মাটুশকা। তোমাদের নশ্বর দেহ যদি ছাইও হয়ে যায় তবুও রক্ষা নেই। তোমাদের দেমাকের জন্যে তিনি তোমাকে আর ভাসিলিকে শাস্তি দিচ্ছেন। আমার

জন্যেও দিচ্ছেন। কারণ তোমাদের যখন পয়সা ছিল আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতাম।"

দিদিমা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিতেন, "আমার সাধ্যমত আমি তোমাদের সাহায্য করতাম। ভগবান আমাদের তার তার জন্যে সাহায্য করবেন।"

—"তুমি যা করতে তা সামান্য, সামান্য।"

দিদিমা তাঁর ভগ্নীর অসংযত রসনায় বিরক্ত ও বিব্রত হতেন।···

কিন্তু আমার মনিব তাঁকে সানন্দে অভ্যর্থনা করতেন; বলতেন, "আকুলিনা কেমন আছো? তুমি সকলের চেয়ে বুদ্ধিমতী। বুড়ো কাশিরিন এখনও বেঁচে আছে?"

দিদিমার মুখে ফুটে উঠতো সারা অন্তরের হাসি।

—"তুমি এখনও প্রাণপণ খাটছো?"

—"হাঁ—সর্বদা—কয়েদির মতো।"

দিদিমা তাঁর সঙ্গে স্নেহমাখা কণ্ঠে কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু তাঁর স্বরে থাকতো বয়োজ্যেষ্ঠের গাম্ভীর্য।

আমার মনিব বলতেন, "তোমার ঐ দিদিমাটি চমৎকার মানুষ।"

এই কথাগুলির জন্য তাঁর প্রতি আমার অন্তরে দেখা দিত গভীর কৃতজ্ঞতা। দিদিমাকে একা পেলেই বলতাম, "তুমি এখানে আস কেন? দেখতে পাওনা ওরা কেমন ভাবে—"

তাঁর চমৎকার মুখখানিতে ফুটে উঠতো স্নেহমাখা হাসি; তিনি বলতেন, "আমি সবকিছুই দেখতে পাই ওলেশা।" তারপর, চারধারে তাকিয়ে কেউ আসছে কি না দেখে নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে বলতেন "তুমি না

থাকলে আমি এখানে আসতামই না। ওরা আমার কে? আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার দাদামশাই অসুস্থ; তাঁকে দেখাশুনা করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কোন কাজ-কর্মও করতে পারি নি। তাই হাতে পয়সা-কড়ি কিছু নেই। আমার ছেলে মাইকেল শাসশাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাকে আমাকে খাওয়াতে, তার মদের খরচ জোগাতে হচ্ছে। ওরা বলেছিল তোমাকে ছ রুবল করে দেবে। আমি অবশ্য মনে করি না যে ওরা তোমাকে এ পর্যন্ত একটা রুবলও দিয়েছে, যদিও তুমি এখানে আছ ছ' মাস।" তারপর আমার, কানে কানে বললেন "ওরা বলে, তোমাকে উপদেশ দিতে হয়, মারতে হয়, তুমি ওদের কথা শোন না। কিন্তু যাদু আমার, ওদের কাছে মোটে দুটো বছর সব সয়ে চুপ-চাপ থাকো। বড়-সড় হও। সব সয়ে থাকবে কেমন?"

আমি তাঁকে কথা দিলাম! কিন্তু বড় কষ্টকর। সে জীবন ছিল দুর্বিষহ, বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দ। তার একমাত্র উত্তেজনা ছিল খাদ্যে। মনে হত আমি যেন স্বপ্নের মাঝে দিন কাটাচ্ছি। কখন কখন ভাবতাম পালাবো, কিন্তু হতচ্ছাড়া শীতকালটা এসে পড়ে ছিল। রাতে তুষার ঝড় বইতো, বাড়ির ওপর দিয়ে ছুটে যেত ঝড়ো হাওয়া, তুষারের চাপে জানালার গরাদেগুলো যেত ফেটে। তার মাঝে কোথায় পালাবো?

* * * *

তাঁরা আমাকে বাড়ির বার হতে দিতেন না; বস্তুত

সে রকম আবহাওয়ায় বেড়ানোও যায় না। সংসারের কর্ম-কোলাহলমুখর শীতের ছোট বেলাগুলো অলক্ষ্যে দ্রুতবেগে চলে যেতো। কিন্তু তাঁরা আমাকে গির্জায় পাঠাতেন—শনিবারে সান্ধ্যোপাসনায়, রবিবারের সকালে।

গির্জায় যেতে আমায় ভালো লাগতো। কিন্তু আমি সেখানে প্রার্থনা করতাম না। কারণ, দিদিমার ভগবানের সামনে দাদামশাইয়ের ভগবানের স্তব-স্তোত্রগুলো উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা বোধ হত। দাদামশাইয়ের ভগবানের স্তব-স্তোত্রগুলো মুদ্রিত থাকতো পুস্তকে। তাতে আমি আনন্দ পেতাম না। তাছাড়া সেগুলো ছিল ক্রোধ ও অনুতাপে ভরা। সেই জন্য আমার অন্তর যখন মৃদু দুঃখে নিপীড়িত হত বা দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট আঘাতে উত্তেজিত হয়ে উঠতো তখন আমি নিজেই স্তোত্র রচনা করতাম।

সেই সব স্তোত্রের কিছু কিছু আজও আমার মনে আছে। শৈশবের চিন্তা ও কল্পনাগুলি মনে গভীর ছাপ রেখে যায়—অনেক সময় মানুষের সমগ্র জীবনই তাতে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

গির্জায় আমার ভাল লাগতো। যেমন বনে-প্রান্তরে শান্তিতে থাকতাম, সেখানেও থাকতাম তেম্নি। রুক্ষ জীবনের দুঃখে ক্লিষ্ট ও ম্লানতায় মলিন আমার ক্ষুদ্র অন্তরটি ছায়াময়, উজ্জ্বল স্বপ্নে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো। কিন্তু যখন অত্যন্ত তুষার পাত হত,বা পথের ওপর দিয়ে তুষার ঝড় উন্মত্তের মতো ছুটে যেত, যখন মনে হত, আকাশখানাই যেন জমে গেছে

এবং বাতাস তার ওপর দিয়ে তুষারের ভার নিয়ে ছুটছে, আর পৃথিবী উড়ন্ত তুষারের তলায় হিমে অসাড় জমাট হয়ে আছে যেন আর কোন কালেই জেগে উঠবে না, আমি গির্জায় যেতাম কেবল তখনই।

যে রাতে ঠাণ্ডা থাকতো কম সে রাতে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগতো। আমি বাড়িগুলোর কালো ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে চলতাম। কখন কখন মনে হ'ত যেন আমার ডানা গজিয়েছে, আমি যেন আকাশের চাঁদের মতো ভেসে চলেছি। হাতে খটখটি, গায়ে ভেড়ার চামড়ার মোটা কোট, পাশে কুকুর নিয়ে রাতের চৌকিদার তখন পথে পথে পাহারা দিয়ে বেড়াতো। লোকে ছায়ামূর্তির মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথ দিয়ে ভেসে যেত। কুকুরটা তাদের তাড়া করতো। পথে কখন কখন দেখা হত নবীনাদের সঙ্গে। তাদের মুখে চোখে কথায় আনন্দ। তাদের সঙ্গে থাকতো তরুণেরা। মনে হত, তারাও যেন আমার মতো সান্ধ্যোপাসনা থেকে পালিয়েছে।

কখন কখন জানলার গায়ে আলোকিত কাঁচের ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতো অস্পষ্ট, অপরিচিত গন্ধ। তাতে এমন একটি জীবনের আভাস দিত যাতে আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি জানলার তলায় দাঁড়িয়ে সেই গন্ধ শুঁকতাম। আর অনুমানের চেষ্টা করতাম সেই রকম একখানি বাড়িতে যে-সব লোক থাকে তাদের মতো জীবন যাপন করতে কেমন লাগে। তখন সান্ধ্যোপাসনার সময়। তবুও তারা আনন্দে গান গাইতো, হাসতো, গিটার বাজাতো।

তার গভীর তন্ত্রীধ্বনি ঘুলঘুলিটার ভেতর দিয়ে বয়ে আসতো।

আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল জনহীন পথের বাঁকে ছোট ছোট একতলা বাড়িগুলো। জ্যোৎস্নারজনীতে সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতাম সেখানকার অদ্ভুত ধ্বনি। ধ্বনিটি কাঁচের ঘুলঘুলির মাঝ দিয়ে তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তো। মনে হত কে যেন মুখ বুজে গান করছে। সে গানের ভাষা বোঝা যেত না, তার ধ্বনিটি যেন ছিল আমার চেনা। তা বুঝতে পারতাম।...পথের পাশে পাথরের ওপর বসে মুগ্ধ মনে শুনতাম। আমার অন্তর ব্যথিত হত...অশ্রুবিন্দুর মতো চাল থেকে, আমার চোখ থেকেও পড়তো জল।

আমার অজানিতে চৌকিদারটি আমার পাশে এসে আমাকে পাথরের ওপর থেকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলতো, "তুমি এখানে বসে আছ কেন?"

—"গান শুনছি।"

—"গানই শুনছো বটে। ভাগো।"

প্রতি শনিবারে এই বাড়িখানার কাছে যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে আর মাত্র একবার—সেও বসন্তকালে—আমি ভায়োলিনসিলোর বাজনা শুনতে পেয়েছিলাম। বেজেছিল একটানা সারারাত। বাড়ি পৌঁছে আমি মার খাই খুব।

শীতের আকাশতলে শহরের জনহীন পথে পথে এই নৈশ ভ্রমণ আমাকে প্রচুর অভিজ্ঞতা দান করেছিল। আমি ইচ্ছা করেই শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরের রাস্তাগুলো

বেছে নিতাম। কারণ শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল অনেক আলো ; তা ছাড়া সেখানে আমার মনিবের বন্ধুরাও আমাকে চিনতে পারবেন এবং তিনি জানতে পারবেন আমি সান্ধ্যোপাসনার সময় পালিয়ে বেড়াই। দূরের রাস্তাগুলোতে "মাতাল" ও "পথচারী"দের বা চৌকিদারের উৎপাত ছিল না। জানালাগুলো যদি তুষারে রুদ্ধ হয়ে না যেত বা পর্দা ঢাকা না থাকতো তা হলে সেগুলোর মাঝ দিয়ে একতলা ঘরগুলো দেখতে পেতাম।

এই সব জানালার মধ্য দিয়ে দেখতে পেতাম বহু ও নানা রকমের চিত্র। চোখে পড়তো লোকে উপাসনা করছে, চুম্বন করছে, কলহ করছে, তাস খেল্‌ছে, খুব ব্যস্ত হয়ে নিঃশব্দে কথাবার্তা বলছে। যেন কতকগুলি সস্তা দামের ছবি, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে মূক, মৎস্যজীবন। এই ধরনের আরও বহু চিত্র ছিল। সেগুলি চিরদিন আমার স্মৃতি পটে আঁকা থাকবে। চিত্রগুলো আমাকে প্রায়ই এমন মুগ্ধ করতো যে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। তাতে আমার মনিবদের মনে সন্দেহ জাগতো। তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কোন্ গির্জায় গিয়েছিলে? কোন পাদ্রি উপাসনা করছিলেন?"

শহরের সমস্ত পাদ্রিকেই তাঁরা চিনতেন; কোন্ স্তোত্রটি পাঠ হবে তাও তাঁরা জানতেন। বস্তুত সেখানকার সবকিছুই তাঁদের জানা ছিল। মিথ্যা কথা বললে তাঁদের পক্ষে আমাকে ধরা ছিল সহজ।

দুটি মহিলাই আমার দাদামশাইয়ের রুষ্ট দেবতার পূজারী ছিলেন। তাঁর নাম সর্বদাই তাঁদের মুখে থাকতো। এমন কি কলহ করতে করতেও তাঁরা পরস্পরকে শাসাতেন, "দাঁড়াও!

ভগবান তোমার কি করেন দেখবে! এর জন্যে তিনি তোমার সর্বনাশ করবেন! দাঁড়াও।"

লেন্‌ট-পর্বের প্রথম সপ্তাহের রবিবারে বৃদ্ধা একটি খাদ্য রন্ধন করতে করতে সব পুড়িয়ে ফেললেন। আগুন তাতে তাঁর মুখ-চোখ এমনিতেই লাল হয়ে উঠেছিল। রাগে হয়ে উঠলো আরও লাল। বললেন, "দূর ছাই!" তারপর প্যানটার গন্ধ শুঁকে তাঁর মুখখানা হয়ে উঠলো কালো। তিনি পাত্রটা মেজেয় ছুড়ে ফেলে সখেদে বলে উঠলেন, "ওটাতে আঁশ রান্না হয়েছে! নোংরা হয়ে আছে! গত সোমবারে যখন ওটাতে রান্না করছিলাম তখন তো ধরে নি!"

বৃদ্ধা তখনই সেখানে জানু পেতে বসে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন, বলতে লাগলেন, "হে ভগবান, আমাকে মাফ করো প্রভু।"

পোড়া খাদ্যটা দেওয়া হল কুকুরকে, পাত্রটা ভেঙে ফেলা হল। কিন্তু কলহ হলেই সেদিন থেকে বধূটি শাশুড়ীকে শাসাতে লাগলেন, "তুমি আঁশের কড়ায় নিরামিষ রেঁধে ছিলে। দেখো ভগবান তোমার কি করেন।"

ঘর-সংসারের সকল কিছুর মধ্যে, তাঁদের হীন জীবনের সকল কাজে তাঁদের ভগবানকে তাঁরা টেনে আনতেন। তার ফলে তাঁদের শোচনীয় জীবনের বাইরের দিকটা হয়ে উঠেছিল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ। মনে হত তাঁরা যেন প্রত্যেকটি ঘণ্টা ভগবৎ সেবায় দান করছেন। এই বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মাঝে ভগবানকে টেনে আনায়

আমি পীড়িত হতাম। আমার মন কেমন একটা ভয়ে ভরে উঠেছিল। মনে হত কারা যেন অলক্ষ্যে থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।···কি উপায়ে যে এই ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলাম তা মনে পড়ে না, তবে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলাম, আর তা করেছিলাম অল্পকাল মধ্যেই।

সান্ধ্যোপাসনা ছাড়া অন্যান্য উপাসনা থেকেও পালাতাম, বিশেষ করে পালাতাম বসন্তকালে। তার দুর্বার আবেগ আমাকে কিছুতেই গির্জায় যেতে দিত না। আমাকে কিছু পয়সা দিলে আমার সর্বনাশ হত। পয়সাগুলো পেতাম গির্জায় ধর্মকর্মে খরচের জন্য। আমি সেগুলো দিয়ে জুয়া খেলতাম। জুয়া খেলতে আমার খুব ভাল লাগতো। সেটা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাতে ওস্তাদ ছিলাম। সহজে আমার হার হত না।

লেনট-পর্বের মধ্যে ফাদার ডরিমেডনট পোক্রোমকির কাছে একদিন পাপ-স্বীকারের জন্য গিয়ে ছিলাম। তিনি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। লোকটিকে আমার কঠোর মনে হত। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতি কত পাপ যে করে ছিলাম! বাগানে তাঁর সামার-হাউসে ইট মারতাম, তাঁর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। ইচ্ছা হলে, এই ধরনের কত অপকীর্তির কথাই তিনি তখন মনে করতে পারেন, এই সব ভেবে আমি বিচলিত হয়ে পড়ে ছিলাম। ছোট গির্জাটির মধ্যে কম্পিত অন্তরে দাঁড়িয়ে আমার পালার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু ফাদার ডরিমেডনট কোমল বাক্যেই আমাকে অভ্যর্থনা

করলেন; বললেন, "আমার পড়শী যে! হাঁটু গেড়ে বস! কি পাপ করেছো ?"

একখানি পুরু ভেলভেট দিয়ে তিনি আমার মাথা ঢেকে দিলেন। মোম ও ধূপ-ধুনার গন্ধ আমার নাকে লাগতে লাগলো। কথা বলা হল কষ্টকর। এবং কিছু বলতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বড়দের কথা শুনে চলতে ?"

—"না।"

—"বল পাপ করেছি।"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "আমি চুরি করেছি।" বলেই অবাক হয়ে গেলাম।

কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম ? কোথায় ?"

—"তিনজন বিশপের গির্জায়··· ।"

—"তার মানে—সমস্ত গির্জাতেই। কাজটা অন্যায় হয়েছে বাবা! ওটা পাপ হয়েছে। বুঝলে ?"

—"বুঝতে পারছি।"

—"বল—পাপ করেছি। কেন চুরি করে ছিলে ? কিছু খাবার জন্যে ?"

—"কখন কখন সেইজন্যেই—কখন কখন খেলায় টাকা-কড়ি হারবার ফলে। বাড়িতে প্রসাদ কিনে নিয়ে যাবার কথা। তাই চুরি করে ছিলাম।"

তিনি আমার কানে কানে অস্পষ্ট ভাবে ও ক্লান্ত কণ্ঠে কি যেন বললেন। তারপর আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে হঠাৎ কঠোর

স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নিষিদ্ধ বই পড়তে কি ?"

প্রশ্নটি আমি বুঝতে পারলাম না ; জিজ্ঞেস করলাম, "কোন বইয়ের কথা বলছেন ?"

—"যে বই পড়া বারণ, সে-সব বই পড়তে কি ?"

—"না, একখানাও না।"

—"তোমার পাপ মাফ করা হল—উঠে দাঁড়াও।"

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তাঁকে দেখাতে লাগলো গম্ভীর ও কোমল। আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো ; নিজেকে অপরাধী মনে হল। যাতে আমার তুচ্ছতম পাপও আমি সৎভাবে স্বীকার করি সেজন্য পাদ্রির কাছে পাঠাবার সময় আমার মনিবরা এমন সব কথা বলেছিলেন যে, আমার মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

তাই বললাম, "আপনার সামার হাউসে ঢিল মেরেছি।"

পাদ্রি-মশাই মাথা তুললেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, "খুব অন্যায় ! এখন যাও।"

—"আপনার কুকুরকেও ঢিল মেরেছি।"

তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর পর কে ?"

ক্ষুণ্ণ মনে বেরিয়ে এলাম। মনে হল আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে। পাপস্বীকার অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে তাঁরা আমার মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন কাজে জানতে পারলাম তা অতি সাধারণ, কৌতূহল জাগে ওর মধ্যে এমন কিছু নেই। তবে ওর মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে নিষিদ্ধ পুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন যার কথা আমার জানাই ছিল না।

পরদিন মনিবরা আমাকে পনেরো কোপেক দিয়ে ধর্ম-সম্মেলনে পাঠালেন। ঈসটার-পর্ব তখনও আসে নি; অনেকদিন আগেই তুষার শুকিয়ে গিয়েছিল। পথ-ঘাট শুকনো। পথ থেকে ধূলা উড়ছিল। দিনগুলি রৌদ্রোজ্জ্বল ও আনন্দময়। গির্জার কাছে একদল শ্রমিক জুয়া খেলছিল। হিসাব করে দেখলাম সম্মেলনে যাবার অনেক সময় আছে, তাই তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাদের সঙ্গে খেলতে পারি কি না।

বললাম "আমাকে খেলতে দেবে ?"

বসন্তের দাগে ভরা লাল মুখো একটা লোক দেমাকের সঙ্গে বললে, "প্রবেশ মূল্য লাগবে এক কোপেক।"

আমিও, তার চেয়ে কম দেমাকের সঙ্গে নয়, বললাম, "বাঁধারে দ্বিতীয় জোড়ায় আমি রাখছি তিন কোপেক।"

খেলা শুরু হল। আমি জিততে লাগলাম। জুয়াড়িদের মধ্যে একজন বললে, "ছোকরাটার ওপর নজর রেখ। নাহলে ও জিতের টাকা নিয়ে সরে পড়বে।"

মন্তব্যটা আমি অপমানের মনে করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, "একেবারের বাঁ দিকের জোড়ায় রাখলাম ন' কোপেক"।

তবে এ কথায় জুয়াড়িরা বিশেষ প্রভাবিত হল না। আমার বয়সী এক কিশোর বলে উঠলো, "ওর কপাল কি রকম ভাল দেখ—ক্ষুদে শয়তানটা থাকে ভেৎজ্ ড্রিংকিতে। ওকে আমি চিনি।"

একটি শ্রমিক, লোকটি রোগা, হিংসুকের মতো বললে, "ওটা ক্ষুদে শয়তান, কেমন ? ভা—ল—।" সে হঠাৎ খপ্

করে শান্ত ভাবে আমার দানটাকে দিল ভেস্তে। এবং আমার দিকে ঝুঁকে বললে, “ডাক চড়াবে না ?”

আমার রোখ চেপে গেল। আমি উত্তেজিত হয়ে খেলতে লাগলাম। কিন্তু তাতে আমার কাছে যা কিছু ছিল সব গেল। ওদিকে সেই ফাঁকে গির্জায় উপাসনাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকে গির্জা থেকে বেরিয়ে আস্‌তে লাগলো।

পশম ব্যবসায়ীর মতো দেখতে সেই রোগা শ্রমিকটা আমার চুলের মুঠি ধরবার উদ্দেশ্যে বললে, “তোমার বিয়ে হয়েছে ?”

আমি কৌশলে ত'ার হাত ছাড়িয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার বয়সী একটি কিশোরের পাশে গিয়ে পড়লাম। তার গায়ে ছিল রবিবারের পোশাক।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম “তুমি গির্জায় গিয়েছিলে ?”

সে আমার দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকিয়ে বললে, “মনে কর গিয়ে ছিলাম। তাতে কি ?”

তাকে জিজ্ঞেস করলাম লোকে সেখানে কি করছিল, পাদ্রি কি বলছিল। আর আমি গেলে আমার কি করা উচিত ছিল ?

ছোকরা আমাকে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে সভয়ে চীৎকার করে উঠলো, “এই বিধর্মী, তুই উপাসনা থেকে পালিয়েছিস্ ? আমি তোকে কিছুই বলবো না। তোর বাবা তোর পিঠের চামড়া তুলে দিক।”

চললাম বাড়ি। আশঙ্কা করছিলাম সকলে আমাকে গির্জার কথা জিজ্ঞেস করবেন এবং আমি যে পালিয়ে ছিলাম তা ধরে ফেলবেন। কিন্তু বৃদ্ধা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে

মাত্র একটি প্রশ্ন করলেন, "কেরানিকে কত দিয়ে ছিলে? বেশি?"

আমি নির্ভয়ে উত্তর দিলাম, "পাঁচ কোপেক।"

তিনি বললেন, "আর ওর নিজের জন্যে তিন কোপেক। তবুও সাত কোপেক থাকে।"

তখন বসন্তকাল! প্রতি বসন্ত ঋতুই তার আগের বসন্ত ঋতুর চেয়ে ভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসতো। তাকে মনে হত আগেরটি অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ও মধুরতর। নব তৃণদল ও কচি সবুজ বারচ গাছগুলো থেকে আসতো মদির গন্ধ। তা আমার মনে জাগাতো প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবার এবং তপ্ত ধরণীর বুকে মুখ রেখে লারকের গান শোনবার এক উদ্দাম বাসনা। কিন্তু আমার ছিল শত কর্তব্য। শীতের কোটগুলো পরিষ্কার করে ট্রাংকে রাখতে হবে, তামাকের পাতা কুচোতে হবে, আসবাব-পত্রের ধুলো ঝাড়তে হবে, এবং সকাল থেকে রাত অবধি এমন সব কাজ করতে হবে যেগুলো আমার লাগতো বিশ্রী ও অপ্রয়োজনীয়।

যখন কাজ থাকতো না তখন এমন কিছুই ছিল না যা নিয়ে বেঁচে থাকি। আমাদের সেই হতচ্ছাড়া রাস্তাটাতে কিছুই ছিল না। এবং তার বাইরে আমাকে যেতেও দেওয়া হত না! আমাদের সেই চত্বরটা ছিল ক্রশ, ক্লান্ত শ্রমিক, নোংরা রাঁধুনী ও ধোপানীতে ভরা। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে এমন বিরক্তিকর, এমন বিশ্রী দৃশ্য দেখতে পেতাম যে ইচ্ছা হত যেন অন্ধ হয়ে যাই।...

পাঁচ

যাহোক, বসন্তকালে আমি পালিয়ে গেলাম। একদিন সকালে যখন রুটি কিনতে দোকানে গেলাম, দোকানদারটা তখন তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। সে আমার সামনেই একটা বাটখারা তুলে তার কপালে মারলো। স্ত্রীলোকটি ছুটে রাস্তায় গিয়ে পড়ে গেল। এবং তৎক্ষণাৎ তার চারধারে লোক জড় হতে লাগলো। তাকে একখানি স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে চললো হাসপাতালে। আমি ছুটলাম তার গাড়ির পিছন পিছন। কোথায় যে যাচ্ছি সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। শেষে দেখলাম, ভলগার তীরে এসে পড়েছি, আমার হাতে রয়েছে দুটি মুদ্রা।

বসন্ত-রবি উজ্জ্বল মধুর কিরণ বর্ষণ করছে, আমার সামনে বয়ে চলেছে ভলগার প্রশস্ত ধারাটি, ধরণী বিচিত্র শব্দময়ী ও বিশাল—আর আমি এতদিন ইঁদুরের মতো ফাঁদে বাস করছিলাম। তাই স্থির করলাম, আমার মনিবদের কাছে বা কুনাভিন স্ট্রীটে দিদিমার কাছে ফিরে যাবো না। কারণ তাঁকে যে কথা দিয়ে ছিলাম, তা রাখতে পারি নি। তাই তাঁর কাছে যেতে লজ্জা বোধ হতে লাগলো। সেখানে গেলে দাদামশাইও আমার দুরবস্থায় বিদ্রূপ করবেন।

দু-তিন দিন নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালাম। সহৃদয় কুলিরা আমাকে খাওয়ালে। তাদের সঙ্গেই কুঁড়েতে রাত

কাটালাম। অবশেষে তাদের একজন বললে, "এখানে ঘুরে বেড়িয়ে কোন লাভ নেই, বাবা। সেটা বুঝতে পারছি। 'ভাল' নামে যে জাহাজখানা বাঁধা রয়েছে ওখানে যাও। বাসন-পত্র ধোবার জন্যে ওদের একটি লোকের দরকার।"

গেলাম। মাথায় কালো রেশমের টুপি, মুখে দাড়ি, দীর্ঘাকার পোর্টারটি চযমার ভেতর দিয়ে নিষ্প্রভ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বললে, "মাসে দু' রুবল। তোমার ছাড়পত্র আছে?"

আমার ছাড়পত্র ছিল না। স্টুয়ার্ড একটু ভেবে বললে, "তোমার মাকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

ছুটলাম দিদিমার কাছে। শুনে তিনি মত দিলেন। দাদামশাইকে বললেন, শ্রমিকদের আদালতে গিয়ে আমার জন্য একখানা ছাড়পত্র আনতে, আর নিজে চললেন আমার সঙ্গে জাহাজে।

স্টুয়ার্ড আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "বহুৎ আচ্ছা! এস।"

সে আমাকে নিয়ে গেল জাহাজের পিছন দিকে। সেখানে একখানি ছোট টেবিলের ধারে বসে সাদা জামা গায়ে ও মাথায় সাদা টুপি পরে বিশালকায় একটি লোকটি, বাবুর্চি চা, খেতে খেতে একটা মোটা চুরুট টানছিল। স্টুয়ার্ড আমাকে তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, "বাসন ধোবে।"

সে চলে গেল। বাবুর্চি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লে। তার গোঁফগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। সে স্টুয়ার্ডকে উদ্দেশ্য করে বললে, "সস্তায় যে রকম শয়তানকেই পাও তাকেই কাজে লাগাও।"

গোড়া-ঘেঁসে-ছাঁটা চুলভরা মাথাটা রাগে দুলিয়ে কালো চোখ দুটো বিস্ফারিত করে, দেহটা টান করে দিয়ে, গাল দুখানা ফুলিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠলো, "তুমি কে বটে?"

লোকটির চেহারা আমার আদৌ ভাল লাগলো না। আগাগোড়া সাদা পোশাক পরে থাকলেও তাকে নোঙরা দেখাচ্ছিল, তার আঙুলগুলোতে গজিয়ে ছিল এক রকমের 'পশম', বড় বড় কান দুটোর লোমগুলো ছিল খাড়া হয়ে।

উত্তর দিলাম, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

সে চোখ মিট মিট করলে। তার ভীষণ মুখখানা হঠাৎ প্রশান্ত হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়লো, ঘোড়ার মতো বড় বড় দাঁতগুলো দেখা যেতে লাগলো। তার চেহারাটা হল, হৃষ্ট-পুষ্ট সহৃদয় স্ত্রীলোকের মতো।

তার গেলাসের চা ওপর থেকে নদীতে ফেলে দিয়ে আমার জন্য তাতে নূতন করে খানিকটা চা ঢেলে, একখানি রুটি ও খানিকটা সসেজ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, "লাগাও। তোমার বাপ-মা বেঁচে আছে? চুরি করতে পারো? তোমার ভয়ের কারণ নেই; এখানে সকলেই চোর। তুমি শিগগিরই তা শিখবে।"

সে কথা বলতে লাগলো যেন গর্জন করছে। তার মুখখানা প্রকাণ্ড, নীল, পরিষ্কার করে কামানো, ঘন সন্নিবিষ্ট লাল শিরাউপশিরায় আছন্ন স্ফীত নাসিকাটি গোঁফের ওপর ঝুলে পড়েছে, নিচের ঠোঁটটা বিশ্রী রকমে দুলছে, মুখের এক কোণে একটি ধূমায়িত সিগারেট। স্পষ্টই দেখা

যাচ্ছিল, সে সবে স্নান করে এসেছে। তার গা থেকে বার হচ্ছিল বারচের কচি ডালের গন্ধ, রগে ও গলায় প্রচুর ঘাম চিক চিক করছিল।

আমার চা খাওয়া শেষ হলে সে আমাকে একখানি এক-রুবলের নোট দিল।

"এক ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে দুখানা এপ্রন কিনে নিয়ে এস। আচ্ছা থামো—আমিই কিনে দেব।"

মাথার টুপিটা ঠিক করে বসিয়ে সে হেলে-দুলে চললো। ডেকের ওপর তার পা দুখানা ভালুকের মতো চট্ চট্ করে পড়তে লাগলো।

রাতের বেলা।

জাহাজখানার কাছ থেকে বামে মাঠের দিকে সরে যেতে যেতে আকাশে চাঁদ ঝক্ ঝক্ করছে। আমাদের পুরানো, লাল রঙের, ডোরাদার চোঙওয়ালা জাহাজখানার চলায় তাড়া নেই। রুপালি জলধারায় তার চাকাখানা অসমান ভাবে পড়ছে। কালো তটভূমি জলে ছায়া ফেলে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আস্ছে। তার কাছ থেকে দূরে চাষীদের কুঁড়ের জানালায় আলো ঝিক্ ঝিক্ করছে। গ্রাম থেকে গান ভেসে আস্ছে—মেয়েরা আনন্দ করছে।

জাহাজখানার পিছনে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে এক-খানি বড় বজরা। সেখানাও লাল। তার পাটাতনটা লোহার খাঁচার মতো রেলিং দিয়ে ঘেরা! এই খাঁচাটার মধ্যে ছিল কয়েদি। তাদের পাঠানো হচ্ছে নির্বাসনে বা কারাগারে। বজরার সামনের গলুইয়ে শান্ত্রীর সঙিনটা মোমবাতির মতো

জ্বলছে। বজরাখানি স্তব্ধ। চন্দ্র তাকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দিয়েছে। লোহার কালো গরাদেগুলোর মাঝে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কতকগুলি ধূসর ছাপ। সেগুলি হচ্ছে কয়েদি। তারা জলগার দিকে তাকিয়ে আছে। নদীর জল ফুঁপিয়ে উঠছে, কখন নীরবে কাঁদছে, কখন মৃদু হাসছে।...

বজরাখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার অতি শৈশবকালের কথা মনে পড়লো—সেই আস্ট্রাখান থেকে নিজনি যাত্রা। মনে পড়ে গেল মায়ের ও দিদিমায়ের কঠিন মুখ। তিনিই আমাকে এই জগতে—কৌতূহলোদ্দীপক অথচ কঠোর জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যখনই তাঁর কথা মনে হয় তখনই জীবনে যাকিছু মন্দ ও বিরক্তিকর তা যেন আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যায়। সব কিছুই রূপান্তরিত হয়ে আরও কৌতূহলভরা ও সুমধুর লাগে। মানুষকে মোটের ওপর বোধ হয় উৎকৃষ্টতর ও সুন্দরতর।

রাতের সুন্দরতা আমার চোখ দুটি প্রায় অশ্রুসিক্ত করে তুললো। বিশেষ করে পীড়া দিল বজরাখানা। সেটাকে দেখাচ্ছে একটা কফিনের মতো, বেগবতী নদীর প্রশস্ত বুকে উষ্ণ রাতের গভীর স্তব্ধতায় নিতান্ত নিঃসঙ্গ। তটভূমির অসমান রেখা ক্ষণে উঠছে, ক্ষণে পড়ছে, আমার কল্পনাকে সুখকর চেতনা দান করছে—আমার অন্তরে জাগলো ভাল হবার, পরের উপকারে লাগবার আকাঙ্ক্ষা।

আমাদের জাহাজের লোকগুলিতে ছিল এক অদ্ভুত ছাপ। যুবক ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সকলকেই যেন দেখতে ছিল

এক রকমের। জাহাজখানা চলছিল ধীরে। যারা ব্যস্ত তারা যেত দ্রুতগামী জাহাজে। আর অলস শয়তানের দল আসতো আমাদের জাহাজে। তারা গান গাইতো আর খেত এবং গাদা গাদা পেয়ালা-পিরিচ, কাঁটা-চামচ ও ছুরি সকাল থেকে রাত অবধি উচ্ছিষ্ট করতো। আমার কাজ ছিল ছুরি-কাঁটা মাজা। এই কাজে আমি সকাল ছটা থেকে গভীর রাত অবধি ব্যস্ত থাকতাম। দিনের বেলায় দুটো থেকে ছটা এবং রাত দশটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমার কাজ ছিল কম। কারণ যাত্রীরা তখন খাওয়ায় বিশ্রাম নিত; তখন খেত কেবল চা, ভদকা ও বীয়ার। পাকশালার সমস্ত পরি-চারক, আমার কর্তৃপক্ষও তখন বিশ্রাম করতো।...

সেই লোকগুলিকে আমার ভাল লাগতো না। জাকভ আইভানিচ ছিল বাবুর্চি স্মাউরির সহকারী। লোকটা ছিল স্থূলকায়, তার মাথায় ছিল টাক। সে মেয়েদের কথা ছাড়া আর কিছু বলতো না, তা'ও বলতো অতি কুৎসিৎ ভাবে। জাহাজে কোন অমায়িক হাস্য-চঞ্চলা নারী-যাত্রী এলেই সে তার পাশে পাশে থাকতো। তার আচরণে প্রকাশ পেত ভিখারীর ভাব। তার ঠোঁটে দেখা যেত সাবানের মতো ফেনা। তার কথা-বার্তায় মধু ও মিনতি ঝরে পড়তো। যেন তার নোংরা জিভ দিয়ে সে তাকে চাটতো। কোন কারণবশত আমার মনে হত সেই রকমের একটা স্থূলাঙ্গ জীবের পক্ষে জল্লাদ হওয়াই উচিত।

সে জারজি ও ম্যাকসিমকে শিক্ষা দিত, "মেয়েদের কাছে কি ভাবে যেতে হয় তা শেখা উচিত।"...

দিনের বেলা। আমাদের জাহাজখানা ডাঙা থেকে কিছু দূর দিয়ে চলছিল—তবুও কানে আসছিল অদৃশ্য ঘণ্টাধ্বনি। তাতে মনে পড়ছিল গ্রাম ও লোকের কথা। দেখতে পাচ্ছি, জেলেদের জালের ফাতনাগুলো ঢেউয়ের ওপর ভাসছে পাঁউ-রুটির টুকরোর মতো। ডাঙ্গায় দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গ্রাম ; ছেলেরা নদীতে স্নান করছে ; লাল জামা গায়ে বয়স্ক পুরুষেরা চলেছে তীরের অপরিসর বালু-পথ বেয়ে। দূরে নদীর মাঝ থেকে দৃশ্যটি বড় সুন্দর ; সব কিছুকে দেখাতো নানা রঙের খেলনার মতো।

আমার বড় ইচ্ছা হত ডাঙ্গা ও বজরাখানাকে ডেকে কয়েকটি মিষ্ট কথা বলি। বজরাখানার জন্য আমার প্রবল কৌতূহল ছিল। জাহাজখানা সেটাকে টেনে আনছিল শূয়রের মতো। দড়ির টানাটা মাঝে মাঝে ঢিলা হয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জলে আঘাত করছে ; তারপরই টান হয়ে বজরাখানার নাক ধরে টেনে আনছে। বজরার লোকগুলির মুখ দেখতে আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল। তার মধ্যে তাদের রাখা হয়েছিল লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ বন্য প্রাণীর মতো। পারমে তাদের নামিয়ে দেওয়া হল। আমি গ্যাংওয়েতে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা আমার পাশ দিয়ে দশ জন করে চলে যেতে লাগলো। তাদের গায়ে ছাই রঙের পোশাক। পায়ের ধপ্‌ ধপ্‌ শব্দ হচ্ছে। বেড়ির ঠুং ঠাং আওয়াজ উঠছে, বোঝার ভারে তারা পড়েছে নুয়ে। তাদের মধ্যে ছিল নানা বয়সের, নানা রকমের লোক— যুবক ও বৃদ্ধ, সুশ্রী ও কুশ্রী। কিন্তু সকলেই অবিকল সাধারণ লোকের মতো। তবে তফাৎ এই তাদের পোশাক ভিন্ন রকমের আর মাথার চুলগুলো এমন মাথা ঘেঁষে

ছাঁটা যে চেহারাটা দেখতে বিশ্রী লাগছিল। তারা সকলেই যে দস্যু এতে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দস্যুদের মধ্যে ভাল যা দিদিমা আমাকে সে সম্বন্ধে অনেক গল্প বলে ছিলেন। বাবুর্চি স্মাউরি ওপর থেকে ঝুঁকে বজরাখানাকে দেখছিল। সেই লোকগুলির চেয়ে তাকেই দেখাচ্ছিল ভয়ঙ্কর দস্যুর মতো বেশি করে। সে বললে, "ভগবান করুন আমার কপাল যেন এ রকম না হয়।"

একবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, "তুমি এ কথা কেন বলছো? তুমি রাঁধ, ওরা খুন করে, চুরি করে।"

—"আমি রাঁধি না—বানাই। মেয়েরা রাঁধে।" বলে সে হা হা করে হেসে ওঠে। এবং ক্ষণিক পরে আবার বলে, "একটা লোক থেকে আর একটা লোকের পার্থক্য কেবল মাত্র নির্বুদ্ধিতাতেই! এক জন চতুর আর এক জন তত চতুর নয়, তৃতীয়টি একেবারে বোকা হতে পারে। চালাক হতে গেলে বই পড়তে হবে। লোককে সব রকমের বই পড়তে হবে। তবেই পাবে ঠিক বইখানা।"

সে আমাকে অনবরতই বলতো, "পড়! যদি কোন বই বুঝতে না পার সাত বার পড়। তাতেও যদি বুঝতে না পার বারো বার পড়।"

জাহাজের সকলের প্রতিই সে ছিল রুক্ষ, কিন্তু আমার প্রতি সদয়। আমার ওপর ছিল তার দৃষ্টি। কিন্তু এই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যার জন্য বরং আমার ভয়ই হত। কখন কখন মনে হত সে আমার দিদিমার বোনের মতো অপ্রকৃতিস্থ। সময়ে সময়ে সে বলতো, "পড়া রাখ।"

আমি তাকে বই পড়ে শোনাতাম।···সে খানিক চীৎ হয়ে পড়ে থাকতো। মনে হত যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর হঠাৎ মোটা গলায় বলতে শুরু করতো, "এই দেখ! তোমার বুদ্ধি আছে। যাও, সংসারে গিয়ে জীবন যাপন কর। কিন্তু বুদ্ধিও তো কাউকে বেশি দেওয়া হয় না; আর, সকলকে যা দেওয়া হয় তাও সমান মাপের নয়। একজন বোঝে আর একজন বোঝে না। আবার কতকগুলো লোক আছে যারা এমন কি বুঝতেও চায় না।"

তার সৈনিক জীবনের কাহিনী সে বলতো। খালাশি ও ইনজিনঘরের লোকগুলি তাকে সম্মান করতো এবং তার অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল। যে মাংস থেকে স্থপ তৈরী করা হত সে তাদের খেতে দিত সেই মাংস, তাদের দেশের ও পরিবারবর্গের খোঁজ-খবর নিত। ইনজিনঘরে যারা চুল্লিতে কয়লা দিত তারাই ছিল জাহাজের সব চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ। সেই লোকগুলি ছিল শ্বেত রুষ—তৈলাক্ত, দগ্ধদেহ। তাদের সকলকে একটি নামে ডাকা হত—'ইয়াক' বলে। লোকে তাদের বিরক্তও করতো।

একদিন একথা শুনে স্মাউরি উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তার মুখখানা লাল হয়ে যায়। সে কয়লা-খালাশিদের ধমক দিয়ে বলে, "ওদের তোমরা ঠাট্টা করতে দাও কেন? ওদের মুখে থুথু দিও।"

একবার জাহাজের এক প্রিয়দর্শন কিন্তু মন্দ প্রকৃতির কর্মচারী তাদের সম্বন্ধে একটি বিশ্রী মন্তব্য করতেই বাবুর্চিটি তার জামার কলার ও বেলট্ চেপে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, "তোমার হাড় গুঁড়ো করে দি?"

এই দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত, কখন কখন তা হাতাহাতিতে দাঁড়াতো কিন্তু স্মাউরি কখনও পরাজিত হত না। তার গায়ে ছিল অমানুষিক শক্তি। তা ছাড়া ক্যাপটেনের স্ত্রী ছিলেন তাঁর পক্ষে। এই মহিলাটির মুখখানি ছিল পুরুষের মতো, চুলগুলি ছিল বালকের মতো মসৃণ।

স্মাউরি প্রচুর ভদকা পান করতো, কিন্তু কখনও মাতাল হত না। সকালে উঠে তার প্রথম পানীয় ছিল ভদকা। চার ঢোকে সে বোতল শেষ করে ফেলতো। তারপর সন্ধ্যা অবধি চলতো বীয়ার। তার মুখখানা ক্রমে লাল হয়ে উঠতো, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যেত।

কোন কোন সন্ধ্যায় সে হ্যাচওয়েতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তাকে তখন দেখাতো প্রকাণ্ড ও সাদা। তার ম্লান দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো দূর চক্রবালরেখায়। সকলে তাকে সেই সময়ই বিশেষ করে ভয় করতো। কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ হত।...

কখন কখন সাহসে ভর করে তার কাছে যেতাম। সে আমার দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকাতো; জিজ্ঞেস করতো, "কি চাও?"

—"কিছুই না।"

—"বহুৎ আচ্ছা।"

একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "প্রত্যেকে তোমাকে ভয় করে কেন? তুমি তো ভাল—"

যা মনে করেছিলাম সে তার ঠিক বিপরীত আচরণ প্রকাশ করলো; একটুও রাগ প্রকাশ না করে বললে, "আমি ভাল কেবল তোমার প্রতি।"

কিন্তু ক্ষণপরেই সে স্পষ্ট, সহজ ও গম্ভীরভাবে আবার বললে, "কিন্তু এটা ঠিক যে, আমি সকলের প্রতিই ভাল, কেবল সেটা দেখাই না। ওটা লোককে দেখাতে নেই। তাহলে তারা তোমাকে পেয়ে বসবে। যারা সদয় লোকে তাদের মাথায় চড়ে যেন তারা জলাভূমির মাঝে একটা শুকনো টিপি। যাও, আমাকে খানিকটা বীয়ার এনে দাও।"

বোতলটা শেষ করে, গোঁফ জোড়া চুষে সে বললে, "তুমি যদি আর একটু বড় হতে তোমাকে আমি অনেক কিছু শিখাতাম। কোন বয়স্ক লোককে আমার কিছু বলবার আছে। আমি বোকা নই—কিন্তু তুমি বই পড়বে—যা দরকার তুমি তার মধ্যেই পাবে। বই—জঞ্জাল নয়। তুমি একটু বীয়ার খাবে?"

—"ইচ্ছে নেই।"

—"খাশা ছেলে! বীয়ার না খেয়ে ভালই কর। মাতাল হওয়াটা দুঃখের। ভদকা হচ্ছে খোদ শয়তানের খেলা। আমার পয়সা থাকলে তোমাকে পড়াতাম। অসংযমী মানুষ ষাঁড়ের মতো—জোয়াল ছাড়া আর কিছুরই যোগ্য সে নয়। তার মাংসই খাওয়া চলে। সে কেবল লেজ নাড়তেই পারে।"

ক্যাপটেনের স্ত্রী তাকে একখণ্ড "গোগোল" দিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর সেই বইখানা, "ভীষণ প্রতিশোধ", পড়ে খুশি হয়ে ছিলাম। কিন্তু স্মাউরি রুষ্ট হয়ে বলে, "ছাই! ওটা রূপকথা! জানি!—অন্য বই আছে!"

বইখানা সে আমার কাছ থেকে নিয়ে ক্যাপটেনের স্ত্রীর কাছ থেকে আর একখানা বই এনে আমাকে রূঢ়ভাবে হুকুম"

করে, "এই 'তারাস'খানা পড়—তুমি এটাকে কি বল ? পড়ে দেখ। উনি বলছেন, বই ভাল—কার পক্ষে ভাল ? এটা তাঁর পক্ষে ভাল হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে নয়, কি বল ? উনি ওঁর চুল ছেঁটে ফেলেন—দুঃখের যে কান দুটোও কেটে ফেলেন না।"

বইখানা আমি তার কাছে পড়া শুরু করলাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে এক সময়ে তার চোখে বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

পড়া শেষ হলে সে বইখানা আমার হাত থেকে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বইখানা দেখতে দেখতে মলাটের ওপর তার চোখের জল পড়তে লাগলো।

সে বললে, "চমৎকার বই ! খাশা লেখা !"

আমরা "আইভ্যানহো" পড়া শেষ করলে রিচার্ড প্লান-টাগেনেটের ওপর স্মাউরি খুশি হল, বেশ গম্ভীর ভাবে বললে, "লোকটা ছিল আসল রাজা !"

আমার কাছে বইখানি লেগেছিল নীরস। বস্তুত আমাদের দুজনের পছন্দে একটুও মিল ছিল না।

একদিন তাকে বললাম, যে, আরও বইয়ের কথা আমার জানা আছে। সেগুলো হচ্ছে নিষিদ্ধ বই। সে সব বই রাত্রে চোরা কুঠুরিতে বসে গোপনে লোকে পড়তে পারে। সে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বললে, "কি—ই—ই সেটা ? তুমি আমার কাছে এ সব মিছে কথা বলছো কেন ?"

বললাম, "মিছে কথা বলছি না। আমি যখন পাপ-স্বীকার করতে গিয়েছিলাম পাদ্রি তখন আমাকে সে-সব বইয়ের

কথা জিজ্ঞেস ক'রে ছিল। আমি নিজেও এই সব বই পড়ে লোককে কাঁদতে দেখেছি।"

বাবুর্চি আমার মুখের দিকে কঠোর ভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেসা করলে, "কে কাঁদছিল?"

—"যে মহিলাটি শুনছিলেন তিনি কাঁদছিলেন।"

—"তুমি ঘুমোচ্ছিলে! নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলে।" স্মাউরি বললে। এবং ধীরে চোখ দুটি ঢেকে একটু নীরব থেকে অস্ফুট স্বরে বললে, "আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোপন আছে। ততখানি জানবার মতো বয়স আমার হয়নি। আর আমার চরিত্র—"

সে একঘণ্টা ধরে আমার কাছে বক্তৃতা দিয়ে গেল।

আমার অজানিতে বই পড়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। এবং বই হাতে পেলে আমার আনন্দ হত। সে-সব বইয়ে যা পাঠ করতাম আমার জীবন থেকে তা ছিল পৃথক। আমার কাছে তা সুখকর বোধ হত! আমার জীবনটা ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছিল।

স্মাউরিও অনেক সময় বই পড়ে অবসর যাপন করতো এবং কাজ থেকে আমাকে টেনে নিত।

বলতো, "পিয়েশকক্ এস। পড়।"

বলতাম, "আমাকে অনেক ধোয়া-মোছা করতে হবে।"

—"ম্যাকসিম ধুক।"

সে রুক্ষভাবে ম্যাকসিমকে আমার কাজ করতে হুকুম করতো। এই লোকটি নষ্টামি করে কাঁচের গেলাস ভেঙে

ফেলতো আর সর্দার স্টুয়ার্ড আমাকে শান্ত কণ্ঠে বলতো, "তোমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে হবে।"

একদিন ম্যাকসিম মতলব করেই নোংরা ও চা-পাতা ভরা জলে কতকগুলো গেলাস ডুবিয়ে রাখলে। আমি জলটা জাহাজের ওপর থেকে নদীতে ফেলে দিতেই গেলাসগুলোও নদীতে গিয়ে পড়লো।

সর্দার স্টুয়ার্ডকে স্মাউরি বললে, "আমার দোষ। খরচটা আমার হিসাবে লিখে রাখবেন।"

খাবার ঘরের ছোকরারা আমাকে ভ্রূকুটি করে দেখতে লাগলো এবং আমাকে বলতে শুরু করলে, "এই বইয়ের পোকা! তোকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে কিসের জন্যে ?"

এবং তারা যতটা পারতো আমার কাজ বাড়িয়ে রাখতো। অনাবশ্যক ভাবে প্লেট নোঙরা করে রাখতো। বুঝলাম আমার পক্ষে এর ফল হবে খারাপ। আমার এই অনুমানে ভুলও হল না।

একদিন সন্ধ্যায় জাহাজের একটি ছোট সামিয়ানার তলায় একটি স্ত্রীলোক একটি কিশোরীর সঙ্গে বসে ছিল। স্ত্রীলোকটির মুখখানা লাল। মেয়েটির গায়ে ছিল হলদে কোট, লালচে ব্লাউস। দুজনেই মদ খাচ্ছিল। স্ত্রীলোকটি হাসছিল ও সকলকেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করছিল আর বলছিল, "বন্ধুগণ আমাকে ক্ষমা কর। আমি একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছি। আমার বিচার হয়ে ছিল কিন্তু তাতে খালাশ পেয়েছিলাম। আমি স্ফূর্তির জন্যে মদ খাই।"

মেয়েটিও হাসছিল, চকচকে চোখে যাত্রীদের দিকে তাকাচ্ছিল আর স্ত্রীলোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলছিল, "আরে তোমাকে আমরা চিনি—"

তারা দুজন ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তাদের বারথ ছিল জাকফ আইভানিচ ও সারজি যে কেবিনে ঘুমোতো তার সামনে।

স্ত্রীলোকটি শীঘ্রই কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সারজি তার ব্যাঙের মতো মুখখানা বাড়িয়ে মেয়েটির পাশে গিয়ে স্ত্রীলোকটির জায়গা দখল করলে।

সে রাতে কাজ-কর্ম সেরে আমি যখন টেবিলের ওপর শুয়েছি, সারজি এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "চল। আমরা তোমার বিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

সে মাতাল হয়ে ছিল। আমি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাকে মারলে।

—"চলে এস!"

ম্যাকসিমও মাতাল হয়ে ছুটে এলো। দুজনে আমাকে ডেকের ওপর দিয়ে, ঘুমন্ত যাত্রীদের মাঝ দিয়ে তাদের ক্যাবিনে টেনে নিয়ে চললো। কিন্তু তাদের ক্যাবিনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল স্মাউরি আর দরজায় হাতল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল জাকফ আইভানিচ। মেয়েটি তার পিঠে কনুই দিয়ে আঘাত করছিল আর মদিরাজড়িত কণ্ঠে বলছিল, "পথ ছাড়ো—"

স্মাউরি আমাকে সারজি ও ম্যাকসিমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের চুলের মুঠি ধরে মাথায় মাথায় ঠুকে

দিয়ে সরে দাঁড়ালো। তারা দুজনে ডেকের ওপর পড়ে গেল।

সে জ্যাকফকে কেবিনে পুরে ঝপ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে ঠেলা দিয়ে গর্জন করে উঠলো, "সরে যাও এখান থেকে।"

আমি ছুটে জাহাজের পিছন দিকে চলে গেলাম। মেঘলা রাত, কালো নদী। জাহাজের চলার পথে পিছনে জলের দুটি ধূসর ফেনিল রেখা চলেছে অদৃশ্য তটভূমির দিকে। এই দুটি রেখার মধ্যে চলেছে বজরাখানা। কখন বামে, কখন দক্ষিণে ফুটে উঠছে আলোর হলদে ছাপ। এবং কোন কিছুকে আলোকিত না করেই সেগুলো নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপরই সব হয়ে যাচ্ছে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিকট।

বাবুর্চি এসে আমার পাশে বসে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেট বার করে বললে, "ওরা তোমাকে ওই জন্তুটার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল! এঃ! নোংরা জানোয়ারের দল! আমি শুনতে পেয়েছিলাম।"

—"তুমি মেয়েটাকেও ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো?"

—"সেটাকে?" বলে সে মেয়েটিকে রূঢ় অশ্লীল ভাষায় গাল দিল এবং তেমনি ম্লান কণ্ঠে বলে যেতে লাগলো, "এখানে সব নোংরা। এই জাহাজখানা গ্রামের চেয়েও বিশ্রী। তুমি কখন গ্রামে বাস করেছো?"

—"না।"

—"গ্রামে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই বিশেষ করে শীতকালে।"

সিগারেটটা নদীতে ফেলে দিয়ে সে ক্ষণিক স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর আবার বললে, "তুমি এক পাল শূয়রের মধ্যে এসে পড়েছো। বাবা, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ওদের জন্যেও আমার দুঃখ হয়। জানিনা অন্য সময়ে কি করতাম। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছি। কি করছো তোমরা—? কি করছো তোমরা অন্ধের দল—?"

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠলো দীর্ঘ, গম্ভীর শব্দে। কাছিটা ছপ্ ছপ্ করে জলে পড়তে লাগলো, লণ্ঠনের আলোগুলো ওপর-নিচে নাচতে লাগলো, তাতে দেখা যেতে লাগলো জাহাজ-ঘাট কোথায়। অন্ধকারের মধ্য থেকে আরও অনেক আলো দেখা গেল।

বাবুর্চি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো, "পিয়ানি বর···আমি ডাঙ্গায় নামবো।"

লম্বা ট্রাকে করে কামসকার ভ্রষ্টা বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ ও যুবতীরা ডাঙ্গা থেকে কাঠ টেনে আনলে। বোঝার ভারে নুয়ে টল্‌তে টল্‌তে তারা জোড়ায় জোড়ায় এসে কয়লা খালাশিদের খোলের কাছে এল এবং কালি-ঝুলমাখা বোঝাগুলো খোলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলো, "কাঠ।"

তারা কাঠ আন্‌লেই খালাশিরা তাদের স্তন বা পা চেপে ধরতো। তারা চীৎকার করতো, তাদের গায়ে দিত, ফিরে দাঁড়াতো আর খালাশিদের চিমটি ও

থেকে ট্রাকের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতো। এই ব্যাপার দেখেছিলাম শতবার প্রতি যাত্রায়, প্রত্যেক জাহাজঘাটে, যেখানেই জাহাজ কাঠ নিত। সব জায়গায় ঘটতো একই ধরনের কাণ্ড।

অনুভব করতাম আমি যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছি, যেন সেই জাহাজে আছি বহু বৎসর। সপ্তাহ পরে, এক বৎসরে বা শরৎকালে কি ঘটবে তা আগে থাকতেই জানতাম।

তখন ভোর হয়েছে। জাহাজ-ঘাটের ওপরে একটি বালু ঠোঁটায় ছিল ঝাউবন। চোখে পড়লো পাহাড়ের ওপর ও বনের মধ্য দিয়ে হাসতে হাসতে গান গেয়ে চলেছে স্ত্রীলোকেরা। তাদের দেখাচ্ছে সৈন্যের মতো। তারা ঠেল্‌তে ঠেলতে চলেছে লম্বা ট্রাক।

আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। আমার অন্তরে ফেনিয়ে উঠছিল অশ্রুভার। আমার হৃদয় ছাপিয়ে উঠছিল। অবস্থাটা হয়ে ছিল অতি বেদনাময়। কান্নাটা হবে লজ্জার। তাই গেলাম খালাশি ব্লিয়াখিনকে পাটাতন ধোয়ায় সাহায্য করতে!

ব্লিয়াখিন মানুষটি ছিল ক্ষুদ্রাকার। তার দৃষ্টি ছিল ক্লান্ত, ম্লান। সে সর্বদা একটা কোণে গিয়ে ঢুকতো। সেখান থেকে তার ছোট ছোট চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতো।

সে বললে, "আমার আসল নাম ব্লিয়াখিন নয় কিন্তু—কারণ আমার মা ছিল দুশ্চরিত্রা। আমার একটি বোন আছে সেও—। সেটাই তাদের ভাগ্য। বুঝলে ভাই, ভাগ্য হচ্ছে আমাদের সকলেরই নোঙর। তুমি যেতে চাও একদিকে কিন্তু—"

এবং ন্যাতা দিয়ে পাটাতনটা মুছতে মুছতে সে কোমল কণ্ঠে আবার বললে, "মেয়েরা কত ক্ষতি করে দেখ! দেখছো তো। ভিজে কাঠে অনেকক্ষণ ধোঁয়া হয়। তারপর হঠাৎ তা জ্বলে ওঠে। ও ধরনের জিনিসে আমার আগ্রহ নেই। আমাকে ওসব আকৃষ্ট করে না। কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে যদি আমার জন্ম হত তাহলে আমি কালো জলে ডুবে মরতাম। থাকতাম খ্রীস্টের সঙ্গে। তখন কারোই কোন ক্ষতি করতে পারতাম না। কিন্তু এখানে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই আগুন জ্বালবার সুযোগ থাকে। এ কথা জেনে রাখো, ক্লীব যারা তারা আহাম্মক নয়; তারা চালাক, তারা ধর্মেকর্মে ভাল। তারা সব তুচ্ছ জিনিস সরিয়ে রাখে—"

পাটাতনের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল জলধারা। তা থেকে পোশাক বাঁচাবার জন্য স্কারটা অনেকটা তুলে ক্যাপটেনের স্ত্রী আমাদের কাছ দিয়ে চলে গেলেন—দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম দেহ, দীপ্ত মুখমণ্ডল। তাঁর পিছু পিছু ছুটে তাঁকে কিছু বলবার জন্য আমার মনে জেগে উঠল আকুলতা। বারবার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, "আমাকে কিছু বলুন! বলুন কিছু।"

জাহাজখানা ঘাট থেকে ধীরে সরে আসছিল। স্ময়াখিন বললে, "আমরা চললাম!"

ছয়

সারাপুলিয়াতে ম্যাকসিম জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। সে কাউকে বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়ে নীরবে, গম্ভীর ও শান্তভাবে চলে গেল। তার পরই হাসতে হাসতে এল সেই আমোদিনী স্ত্রীলোকটি, তার পিছনে পিছন এল সেই মেয়েটি। তার চুলগুলি আলু-থালু, চোখ দুটি ফোলা। সারজি ক্যাপটেনের কেবিনের সামনে অনেকক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসে দরজার তক্তায় চুমো খেতে লাগলো আর তাতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলো, "আমায় ক্ষমা করুন! আমার দোষ নয়, ম্যাকসিমের।"

খালাশিরা, স্টুয়ার্ডরা, এমন কি যাত্রীদের মধ্যেও জন কয়েক জানতো সে মিথ্যা কথা বলছে। তবুও তারা বলতে লাগলো, "ক্ষমা করুন।"

কিন্তু ক্যাপটেন তাকে তাড়িয়ে দিলেন এবং তাকে এত জোরে লাথি মারলেন যে, সে পড়ে গেল তা সত্ত্বেও তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। সেও তৎক্ষণাৎ উঠে ছুট দিল।

ম্যাকসিমের জায়গায় এল অস্থি সর্বস্ব, কটা-চোখ এক সৈনিক পুরুষ। সহকারী বাবুর্চি প্রথমেই তাকে পাঠালো কয়েকটা মুরগী কাটতে। সে দুটো মুরগী কাটলো কিন্তু অবশিষ্টগুলি ছেড়ে দিল পাটাতনের ওপর। যাত্রীরা সেগুলোকে ধরবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তিনটি মোরগ উড়ে গেল নদীতে।

সৈনিক পুরুষটি মুরগীর বাক্সের কাছে একটা কাঠের গাদার ওপর বসে কাঁদতে লাগলো।

স্মাউরি রাগত বললে, "এই আহাম্মক, ব্যাপার কি? দেখ, দেখ সৈনিক কাঁদছে।"

সৈনিক পুরুষটি নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিলে, "আমি দেহরক্ষী বাহিনীর লোক।"

তাতেই তার সর্বনাশ হল। আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সকলেই তাকে নিয়ে হাস্য-পরিহাস করতে লাগলো। তারা তার কাছে এসে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "এই খোকাটা?"

এবং তারপরই উচ্চ হাসি—রূঢ়, অপমানকর।

প্রথমে সৈনিকটি লোকগুলোকে লক্ষ্যও করলে না বা তাদের হাসি তার কানেও গেল না। পুরোনো শার্টের হাতা দিয়ে সে চোখ মুছতে লাগলো ঠিক যেন অশ্রুবিন্দুগুলিকে সে হাতার মধ্যে লুকোচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রই তার কটা চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠলো; সে তার প্রাদেশিক ভাষায় তাড়াতাড়ি বললে, "তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? শয়তান, তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলুক।"

কিন্তু তাতে যাত্রীরা আরও কৌতুক বোধ করলে। এবং তারা আঙুল মটকাতে লাগলো, তার শার্ট ও এপ্রন ধরে টানতে লাগলো। এক সঙ্গে এমন ভাবে ক্রীড়া-কৌতুক করতে লাগলো যেন সে ছাগল। খাওয়ার সময় অবধি তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হাস্য-কৌতুক চললো। খেতে বসে একজন একখানি কাঠের চামচের হাতলে একটি লেবু চটকে গেঁথে তার পিছনে

এপ্রনের দড়িতে দিল বেঁধে। সে চলা-ফেরা করলেই চামচটা দুলতে লাগলো। তাই দেখে উঠলো হাসির রোল। লোকটির অবস্থা হল ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো। সে বুঝতেও পারলে না তাদের হাসির কারণ কি।

স্মাউরি তার পিছনে চুপ করে বসে ছিল, তার মুখখানা হয়ে উঠেছিল নারীর মতো। সৈনিকটির জন্য আমার দুঃখ হল ; জিজ্ঞেস করলাম, "চামচের কথা ওকে বলবো কি ?"

সে কোন কথা না বলে মাথা নাড়লো।

সকলে কেন হাসছে সৈনিকটিকে সেকথা বুঝিয়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি চামচটা ধরে, সুতো থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মেঝেয় ফেলে, পা দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দুহাতে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরলো। আমরা দুজনে মারামারি আরম্ভ করলাম। যাত্রীরা বড় খুশি হল। তারা গোল হয়ে আমাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়ালো।

স্মাউরি দর্শকদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে দিলে। আমার কানে একটা ঘুষি মেরে সে সৈনিকটির কান চেপে ধরলে। যাত্রীরা যখন দেখলে বাবুর্চির হাতে সৈনিকটি কি রকম নাচছে তখন তারা উত্তেজনায় চীৎকার করে, শিষ দিয়ে, পা ঠুকে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলো। হাসতে হাসতে তাদের পাঁজরা ফাটবার উপক্রম হল।"

"বাহবা ! যোদ্ধা ! বাবুর্চির পেটে ঢুঁ মার !"

তাদের উদ্দাম আনন্দে আমার ইচ্ছা হতে লাগলো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা খেটো দিয়ে তাদের নোংরা মাথাগুলো দিই ঠুকে।

স্মাউরি সৈন্যটিকে ছেড়ে দিল। তারপর হাত দুখানা পিছনে দিয়ে বন্য বরাহের মতো যাত্রীদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো এবং ভীষণ ভাবে দাঁত বার করে বললে "নিজের নিজের জায়গায় যাও! শিগগির! শিগগির!"

সৈনিকটি আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু স্মাউরি তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে হ্যাচওয়েতে নিয়ে গিয়ে তার মাথায় জল পামপ্ করতে লাগলো আর তাকে এমন ভাবে ঘোরাতে লাগলো যেন সে একটা ন্যাকড়ার পুতুল।

খালাশিরা ছুটে এল। তাদের সঙ্গে এল জন দুই পদস্থ কর্মচারী। যাত্রীরাও আবার এসে ভিড় করতে লাগলো আর সর্দার স্টুয়ার্ড তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। সকলের ওপরে দেখা যেতে লাগলো তার মাথাটি।

সৈনিকটি রান্নাঘরের দরজার কাছে একটা কাঠের গাদার ওপর বসে পা থেকে বুট ও লেগিংটা খুলে সেটা নিংড়তে আরম্ভ করলো। লেগিং যোড়া অবশ্য ভেজেনি। কিন্তু তার তেলা চুলগুলো থেকে জল ঝরে পড়ছিল। তাতে যাত্রীরা আবার কৌতুক বোধ করতে লাগলো।

সৈনিকটি বললে, "তবুও ছোঁড়াটাকে আমি খুন করবো।"

আমার কাঁধ ধরে স্মাউরি ক্যাপটেনের সহকারীকে কি যেন বললে। খালাশিরা যাত্রীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। তারা সকলে সেখান থেকে চলে গেলে স্মাউরি সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করলে, "তোমাকে নিয়ে কি করা যায়?"

সৈন্যটি স্তব্ধ ভাবে বসে আমার দিকে উন্মত্ত হিংস্র চোখে তাকাতে লাগলো আর যেন বহুকষ্টে আত্মসংযম করে রইলো।

স্মাউরি বললে, "ঠাণ্ডা হয়ে থাক।"

সৈনিকটি বললে, "তোমার সঙ্গে তো আমার কিছু হয় নি তুমি কেন কথা বলচো?"

দেখলাম বাবুর্চি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে থুথু ফেলে সেখান থেকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। আমিও তার পিছনে যেতে যেতে সৈনিকটিকে বার বার ফিরে দেখতে লাগলাম। আমারও বুদ্ধি কিন্তু স্মাউরি চিন্তাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, "লোকটা বুনো। ওর সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?"

সারজি পিছন থেকে আমাদের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "ও আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।"

স্মাউরি বলে উঠলো "কোথায় সে?" বলেই দৌড়লো।

সৈন্যটি স্টুয়ার্ডের কেবিনের দরজার সামনে একখানা বড় ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ছুরিখানা দিয়ে মুরগী ও স্টোভের জন্য লাকড়ি কাটা হত। ছুরিখানা ছিল ভোঁতা ও করাতের মতো খাঁজ কাটা। কেবিনটার সামনে যাত্রীরা জড় হয়ে সেই মজাদার লোকটির ভিজে মাথাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। আর সেই থাঁদা লোকটার জেলির মতো মুখমণ্ডল থর থর করে কাঁপছিল; মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট দুখানা কুণ্ডলি পাকাচ্ছিল। সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "অত্যাচারী…অত্যাচারী"

একটা কিসের ওপর যেন লাফিয়ে উঠে আমি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম তারা হাসছে, পরস্পরকে বলছে "দেখ ! দেখ !"

সৈনিকটি তার কোঁকড়ানো শার্টটা পাজামার মধ্যে গুঁজতেই আমার কাছ থেকে এক প্রিয়দর্শন ব্যক্তি বললে, "মরতে যাচ্ছে তবুও শার্টটা পাজামাটার সঙ্গে আটকে দিচ্ছে।"

তার কথায় যাত্রীরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলো সৈন্যটি যে আত্মহত্যা করবে এটা তাদের কাছে সম্ভব বলে বোধে হল না। আমিও সে রকম কিছু ভাবতে পারলাম না। কিন্তু স্মাউরি তার দিকে একবার তাকিয়েই তাদের সকলকে পেট দিয়ে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললে, "এই আহাম্মকের দল, সরে যাও।"

সে তাদের বার বার বলতে লাগলো নির্বোধ এবং ছোট একটি দলের কাছে গিয়ে বললে, "তোমাদের জায়গায় যাও, আহাম্মক।"

কথাটা মজার হলেও কিন্তু সত্য বলে বোধ হল। কারণ তারা সকাল থেকে একটা "আস্ত আহাম্মকের" মতো আচরণ করছিল। যাত্রীদের তাড়িয়ে দিয়ে সৈন্যটির কাছে গিয়ে সে হাত বাড়িয়ে বললে, "ছুরিখানা দাও।"

সৈন্যটি ছুরিখানার হাতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আমার দরকার নেই।"

স্মাউরি ছুরিখানা আমাকে দিয়ে সৈন্যটিকে কেবিনের মধ্যে ঠেলে দিলে।

"শুয়ে খানিকটা ঘুমোও। তোমার কি হয়েছে, অ্যাঁ ?"

সৈন্যটি হ্যামকের ওপর চুপ করে বসে রইলো।

স্মাউরি আবার বললে, "ও তোমাকে কিছু খাবার আর ভদ্‌কা এনে দেবে—তুমি ভদকা খাও?"

—"কখন কখন, সামান্য।"

—"কিন্তু খেয়াল রেখো—ওর গায়ে হাত দিও না। ও তোমাকে নিয়ে মজা করে নি। ও নয়।"

সৈনিকটি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু ওরা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল কেন?"

—"আমি কি করে জানবো?"

স্মাউরি আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসে বললে, "দেখ, ওরা এবার এক বেচারীকে চেপে ধরেছে। তুমি দেখতেই পাচ্ছ লোকটা কি? বাবা, লোককে পাগল করে ফেলা যায়—সত্যিই। তার সঙ্গে ছারপোকার মতো লেগে থাকো—ব্যস্। বাস্তবিক পক্ষে এখানে কতকগুলো লোক আছে ছারপোকার মতো—তার চেয়েও খারাপ।"

আমি যখন সৈনিকটির জন্য রুটি, মাংস ও ভদকা নিয়ে গেলাম সে তখনও হ্যামকের ওপর বসে দুলছিল আর আস্তে আস্তে কাঁদছিল।

টেবিলের ওপর প্লেটটি রাখতে রাখতে বললাম, "খাও।"

—"দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

—"তাহলে অন্ধকার হবে।"

—"বন্ধ কর। নাহলে ওরা আবার এখানেও গুড় গুড় করে আসবে।"

আমি চলে এলাম। সৈনিকটির মূর্তি আমাকে পীড়া দিতে দিতে লাগলো। মনে শান্তি পেলাম না। দিদিমা আমাকে অসংখ্য বার বলেছিলেন, "লোকের ওপর দয়া রাখতেই হবে। আমরা সকলেই অসুখী। আমাদের সকলেরই জীবন কঠোর।"

স্মাউরি জিজ্ঞেস করলে, "খাবারটা তুমি তার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে? সৈনিকটি কেমন আছে?"

—"তার জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।"

—"তোমার কি হয়েছে অ্যাঁ?"

—"লোকের জন্যে দুঃখিত না হয়ে থাকা যায় না।"

স্মাউরি আমার হাত ধরে তার কাছে টেনে নিয়ে বললে, "তোমার মনে বৃথাই দুঃখ হয় না, কিন্তু সে কথা বলে সময় নষ্ট করা মাত্র।" তারপর আমাকে তার কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, "এ জায়গা তোমার জন্যে নয়। নাও, সিগারেট খাও।"

যাত্রীদের আচরণে আমার মন পীড়িত, পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সৈনিকটির প্রতি সেই বিরক্তিকর ও বেদনাদায়ক আচরণে তারা কি আনন্দ লাভ করেছিল? তার মধ্যে আনন্দে এত হাসবার কি ছিল?

আবার তারা চাঁদোয়ার তলায় বসে বা শুয়ে মদ খাচ্ছে। গল্প-গুজবে গুঞ্জন তুলছে, তাস খেলছে, গম্ভীর ভাবে বুদ্ধিমানের মতো আলোচনা করছে, নদীর দিকে তাকিয়ে আছে যেন ঘণ্টাখানেক আগে শিষ ও হাততালি দিয়ে, চীৎকার করে কাউকে উত্যক্ত ও পাগল করে তোলে নি। তারা যেমন শান্ত ও অলস থাকে তেমনিই আছে। সকাল থেকে

রাত অবধি তারা জাহাজে তুলার মতো বা সূর্যরশ্মিতে ধুলোর মতো ঘুরে বেড়ায়। ঘাটে ঘাটে আট দশ জন করে নেমে যায়। যাবার সময় ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়। আবার সেখান থেকে ওঠে তাদেরই মতো লোক। তাদের গায়ে তাদেরই মতো পোশাক, সঙ্গের জিনিস-পত্র একই রকমের।

যাত্রিদলের এই অবিরাম পরিবর্তনে জাহাজের জীবন ধারার এক কণাও পরিবর্তন ঘটতো না। যারা জাহাজ ছেড়ে চলে যেত নূতন যাত্রীরাও তাদেরই মতো ভাষায় একই বিষয়ের একই আলোচনা করতো—জায়গা-জমি, মজুর, ভগবান, নারী।

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার অন্তর বিষাদে ভরে যেত। তাতে রাগও হত। আমি নোংরা সহ্য করতে পারতাম না। এবং আমার প্রতি মন্দ, অন্যায় ও অপমান-কর আচরণও সইবার স্পৃহা ছিল না। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, তেমন আচরণ পাবার যোগ্য আমি ছিলাম না। সৈনিকটিও তেমন আচরণ আশা করে নি, হয়তো সে মজা করতে চেয়ে ছিল।

ম্যাকসিম ছিল গম্ভীর প্রকৃতির। তার অন্তর ছিল সৎ। কিন্তু জাহাজে তার কর্মচ্যুতি ঘটলো আর রয়ে গেল নীচমনা সারজি। এই সব লোক যারা একটি লোককে পাগল করে তুলতে পারে, কেন খালাশিদের ধমকানি সহ্য করে, আর অপমানিত বোধ না করে তাদের গালাগাল শোনে ?···

কাজানে পাঁচ কোপেক দিয়ে আমি কিনলাম একখানি বই, "একজন সৈনিক মহামতি পিটারের জীবন কি ভাবে

রক্ষা করে ছিল তার কাহিনী।" কিন্তু স্মাউরি তখন মদ খাচ্ছিল। তার মেজাজ ছিল খুব চড়ে। তাই আমি নিজেই বইখানি পড়তে লাগলাম। বইখানা পড়তে পড়তে খুশি হলাম— এমন সাদাসিধা ও সহজবোধ্য, চিত্তাকর্ষক ও ছোট। মনে করলাম, বইখানা আমার শিক্ষককে প্রচুর আনন্দ দান করবে, কিন্তু বইখানা আমি তার কাছে নিয়ে গেলে সে সেটাকে চটকে তালগোল পাকিয়ে জাহাজ থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিলে।

সে কর্কশ ভাবে বললে, "এই আহাম্মক, এই হল তোর বই? আমি তোকে কুকুরের মতো শিক্ষা দিই, আর তুই গিলিস্ বাজে গল্প। অ্যাঁ?" সে পা ঠুকে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। "ওখানা কি ধরনের বই? আমি কি বাজে বই পড়ি? ওতে যা লেখা আছে তা কি সত্যি? বল্?"

—"জানি না।"

—"আমি জানি। যদি কোন লোকের মাথা কেটে ফেলা হয় তাহলে সে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যায়। অপরজনও গিয়ে খড়ের গাদার ওপর পড়ে উঠবে না। সৈন্যরা বোকা নয়। সে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেবে। ঐ খানেই শেষ। বুঝলে?"

—"হাঁ।"

—"বহুৎ আচ্ছা। আমি সম্রাট পিটারের বিষয় সব জানি। এটা আদৌ ঘটে নি। যাও।"

বুঝলাম সে ঠিকই বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বইখানা আমার ভাল লেগেছিল। আমি কাহিনীটি আবার কিনে পড়ি। সেখানা যে নিকৃষ্ট বই তখন সেটা আবিষ্কার করে অবাক

হয়ে গেলাম। আমার ভেতরে সব জোট পাকিয়ে গেল। আমি বাবুর্চিকে আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলাম। আর সে প্রায়শই বলতে লাগলো, ক্রমেই আরও রাগের সঙ্গে, "ওঃ! তোমাকে কত শেখাতে হবে! এ জায়গাটা তোমার যোগ্য নয়!"

আমিও অনুভব করতে লাগলাম সে জায়গাটা আমার যোগ্য নয়। আমার প্রতি সারজির আচরণ হয়ে উঠেছিল বিশ্রী। কয়েক বার দেখে ছিলাম, সে চায়ের বাসন-পত্র চুরি করে গোপনে যাত্রীদের কাছে বিক্রয় করছে। জানতাম যে, এটা চুরি। স্মাউরি আমাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছিল, "সাবধান! তোমার টেবিল থেকে বয়দের কোন পেয়ালা-পিরিচ দিও না।"

এই আচরণের ফলে আমার জীবনকে করে ছিল আরও কষ্টকর। অনেক সময় জাহাজ থেকে আমার বনে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হত, কিন্তু স্মাউরি আমাকে ধরে রেখে ছিল। আমার প্রতি তার ব্যবহার প্রত্যহ হয়ে উঠছিল আরও কোমল। জাহাজের অবিরাম চলায় আমার মনকে মুগ্ধ করে রেখে ছিল। জাহাজখানা যখন কোন ঘাটে বাঁধা থাকতো তখন আমার ভাল লাগতো না। কোন কিছু ঘটবার একটি আশা সর্বদা আমার অন্তরে জেগে থাকতো। আশা ছিল নূতন স্থান, নূতন নগর, নূতন মানুষ দেখবো। কিন্তু তা হল না। আমার সেই জীবনের হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটলো। একদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন কাজান থেকে নিজনির পথে চলেছি স্টুয়ার্ড আমাকে ডাকলো। গেলাম। সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্মাউরিকে বললে, "এই যে এসেছে।"

স্যাউরি একখানি ছোট টুলে কঠোর মূর্তিতে বসে ছিল। সে আমাকে রুক্ষভাবে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি সারজিকে খাবারের আর চায়ের কোন বাসন-পত্র দিয়েছ ?"

—"আমি যখন দেখি না ও নিজেই নেয় ”

স্টুয়ার্ড আস্তে আস্তে বললে, "ও দেখে না—অথচ জানে।"

স্যাউরি তার হাঁটুতে ঘুষি মারলে ; তারপর হাঁটু চুলকে বললে, "থামো—সময় দাও।"

আমি ভাবতে লাগলাম। স্টুয়ার্ডের দিকে তাকালাম, সেও আমার দিকে তাকালো। তার চষমার পিছনে কোন চোখ আছে বলে মনে হল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্যাউরি জিজ্ঞেস করলে, "সারজি তোমাকে কখন টাকা-কড়ি দিয়েছে ?"

—"না।"

—"কখন না ?"

—"কখন না।"

স্যাউরি স্টুয়ার্ডকে বললে, "ও মিছে কথা বলে না।"

স্টুয়ার্ড তৎক্ষণাৎ খাটো গলায় উত্তর দিলে, "ওই একই কথা হল—অনুগ্রহ করে—"

বাবুর্চি বলে উঠলো, "থাক।"

সে আমার টেবিলে এসে আমার মাথায় আস্তে টোকা দিয়ে বললে, "নির্বোধ। আমিও নির্বোধ। তোমাকে আমার ভাল করে দেখা-শুনা করা উচিত ছিল।"

নিজনিতে স্টুয়ার্ড আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে। আমি পেলাম প্রায় আট রুবল—সেই আমার প্রথম বেশি রোজগার।

স্মাউরি আমাকে বিদায় দেবার সময় রুক্ষভাবে বললে, "এই দেখ তোমার দশা! এখন চোখ খুলে থেক—বুঝলে? বেশি কথা বলে বেড়িও না।"

সে আমার হাতে রঙিন পুঁতির তৈরী একটা তামাকের থলি গুঁজে দিলে।

"এই নাও! খাশা কাজ। আমার ধর্ম মেয়ে আমার জন্যে এটা তৈরি করে ছিল। বিদায়—বই পড়ো—তোমার পক্ষে সেটাই হবে ভাল কাজ।"

সে আমাকে শূন্যে তুলে চুমো খেয়ে জেটির ওপর শক্ত করে নামিয়ে রাখলে। তার ও আমার নিজের জন্য দুঃখ হল। তাকে স্টীমারে ফিরে যেতে দেখে আমার চোখে জল এল। কুলিদের সরিয়ে সে চলেছে বিশাল, গুরুভার, নিঃসঙ্গ। তার পর থেকে বহুবার আমি তার মতো—সহৃদয়, নিঃসঙ্গ, আর সকলের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন—লোকের দেখা পেয়েছি।

সাত

দাদামশাই ও দিদিমা আবার শহরে গিয়ে বাস করছিলেন।

আমিও প্রস্তুত হয়ে সেখানে গেলাম—আমিও চটে উঠবো, কলহ করবো। কিন্তু আমার মন ভার হয়েছিল। লোক-গুলো আমাকে চোর অপবাদ দিয়ে ছাড়িয়ে দিল কেন?

দিদিমা আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করে তৎক্ষণাৎ চা তৈরি করতে গেলেন। দাদামশাই যেমন করতেন তেম্নি ভাবে বিদ্রূপের সঙ্গে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "অনেক টাকা জমিয়েছ কি?"

জানলার কাছে বসে উত্তর দিলাম, "যা আছে সবই আমার।" এবং বিজয়গর্বে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে ভারিক্কি চালে টানতে লাগলাম।

দাদামশাই আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "ব—টে! এই ব্যাপার! তুমি শয়তানের বিষ খাচ্ছ? একটু শিগগির হচ্ছে না কি?"

গর্বের সঙ্গে বললাম, "এই যে, আমাকে একটা থলেও দিয়েছে।"

দাদামশাই বলে উঠলেন, "থলে! কি—আমাকে চটাবার জন্যে একথা বলছো?"

শীর্ণ, সবল হাত দুখানা বাড়িয়ে তিনি আমার দিকে ছুটে এলেন। তাঁর সবুজ চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো। আমি

লাফ দিয়ে উঠে, মাথা দিয়ে তাঁর পেটে দিলাম ঢুঁ। বৃদ্ধ মেঝেয় বসে পড়লেন এবং কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে হাঁ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটি মিট্ মিট্ করতে লাগলো। তারপর শান্তভাবে বললেন, "তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও—তোমার দাদামশাইকে? তোমার মায়ের বাবাকে?"

আমি যে খুবই জঘন্য অন্যায় কাজ করেছি একথা না বুঝেই বললাম, "তুমি আমাকে আগে অনেক পিটেছ।"

শীর্ণ, লঘু দেহ নিয়ে দাদামশাই মেঝে থেকে উঠে আমার পাশে বস্‌লেন এবং সিগারেটটা কৌশলে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ভীতকণ্ঠে বললেন, "এই আহাম্মক, পাগল! তুমি কি বুঝতে পারছ না এর জন্যে ভগবান তোমাকে সারাজীবন শাস্তি দেবেন?" তিনি দিদিমার দিকে ফিরে বললেন, "মা, তুমি দেখেছিলে? ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—ও! আমাকে ফেলে দিয়েছিল! জিজ্ঞেস কর!"

দিদিমা জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করেই সোজা আমার কাছে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বলতে লাগলেন, "তার জন্যে—এই নাও—"

আমার লাগলো না, কিন্তু আমি দারুণ অপমানিত বোধ করলাম, বিশেষ করে দাদামশাইয়ের হাসিতে। তিনি এক-খানি চেয়ারে লাফ দিয়ে উঠে নিজের পায়ে দুহাতে চাপড় মেরে হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, "ঠি—ক হয়েছে। ঠি—ক হয়েছে!"

আমি দিদিমার হাত ছাড়িয়ে বাইরে ছুটে গিয়ে ছাপ্পড়টার তলায় শুয়ে পড়লাম। কানে আসতে লাগলো স্যামোভারের সোঁ সোঁ শব্দ। নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ বোধ করতে লাগলাম।

তারপর দিদিমা এলেন; আমার দিকে নুয়ে কানে কানে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করো। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে জোরে মারি নি। ওছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না। কারণ দাদামশাই বুড়ো হয়েছেন। ওঁর শরীরের কয়েকটা ছোট হাড়ও ভেঙে গেছে। তা ছাড়া দুঃখে ওঁর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তুমি ওঁকে কোন রকম আঘাত দিও না। তুমি এখন কচি ছেলে নও, একথা মনে রেখো। উনি এখন শিশুর মতো, তার বেশি আর কিছু নয়!"

তাঁর কথাগুলি আমাকে কবোষ্ণ ধারায় যেন স্নান করিয়ে দিলে। তাঁর সেই স্নেহমাখা কথাগুলিতে নিজের আচরণের জন্য লজ্জিত হলাম। আমার মন হালকা হয়ে গেল। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

"ওঁর কাছে যাও। সব ঠিক আছে। কেবল ওঁর সামনে এখনও সিগারেট খেও না। এই অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে ওঁকে সময় দাও।"

ঘরে ফিরে গিয়ে দাদামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে না হেসে থাকতে পারলাম না। তিনি সত্যই শিশুর মতো খুশি হয়েছেন। মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি টেবিলের ধারে বসে পা দুখানি পায়ে পায়ে জড়াচ্ছেন আর মাথার লাল চুলগুলোর ভেতর দিয়ে থাবার মতো হাতখানা চালাচ্ছেন।

বললেন, "এই ছাগল, তুমি আবার আমাকে গুঁতোতে

এসেছো? ডাকাত! ঠিক বাপের মতো। কোন কিছু মানে না। বাড়ি ফিরে এল, ভগবানের নাম নেই, বসেই সিগারেট ধরালে।···এই কানাকড়ি।”

আমি কিছু বললাম না। তাঁর শব্দভাণ্ডার নিঃশেষ করে ক্লান্তিতে চুপ করে রইলেন। কিন্তু চা খেতে খেতে তিনি আমাকে উপদেশ দিতে লাগলেন, “ভগবানের ভয় থাকা মানুষের দরকার। মানুষ হচ্ছে মানুষের নির্মম শত্রু।” মানুষ যে আমার শত্রু এই কথার মধ্যে খানিকটা সত্য অনুভব করলাম; অবশিষ্টাংশের প্রতি আমার কোনই আগ্রহ জাগলো না।

বললেন, “এখন তুমি মাত্রেনা-দিদিমার কাছে আবার ফিরে যাও। তারপর তুমি আবার জাহাজে ফিরে যেতে পার। শীতকালটা তাদের সঙ্গে থাক। তাদের কাছে তোমার বলবার দরকার নেই যে তুমি বসন্তকালে চলে যাবে।”

দিদিমা একটু আগেই আমাকে মারার ভান করে তাঁকে ঠকিয়ে ছিলেন; বললেন, “ও লোককে ঠকাবে কেন?”

দাদামশাই বললেন, “ঠকানো ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। আচ্ছা বল তো অন্যকে না ঠকিয়ে কে আছে?”

সন্ধ্যায় দাদামশায় স্তোত্র পড়তে লাগলেন, দিদিমা আর আমি ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম মাঠে। যে ছোট কুঁড়েখানিতে দাদামশায় ছিলেন, সেখানি ছিল শহরের বাইরের দিকে কানাৎনি স্ট্রীটে তাঁর নিজের বাড়ির পিছনে।

দিদিমা সহাস্যে বললেন, “আমরা আবার এখানে এসেছি। বৃদ্ধ শান্তি পান এমন একটি জায়গাও খুঁজে পাচ্ছেন না,

তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উনি এ জায়গাটাও পছন্দ না—কিন্তু আমি করি।”

আমাদের সামনে স্বল্প গাছ-গাছড়া ভরা বিশাল প্রান্তর পরস্পর ছিন্ন-বিছিন্ন খাদে খণ্ডিত। প্রান্তরখানি বন ও কাজানের রাজপথের ধারে বারচগাছের সারি বেষ্টিত। খাদের তলা থেকে ঝোপ-ঝাড়ের কচি ডাল বেরিয়ে আছে। নিষ্প্রভ সূর্যাস্তের আলোক সেগুলিকে রক্তরাগে রাঙিয়ে দিয়েছে; মৃদু সন্ধ্যাসমীর ধূসর তৃণপল্লবদলকে সঞ্চালিত করছে। কাছের একটি পথে ধূসর তৃণপল্লবের মতোই দেখা যাচ্ছে শহুরে বালক-বালিকাদের। শহরের প্রান্ত-সীমায় ছোট ছোট বাড়িগুলি যেন বাতায়ন-চোখে ধূলিভরা পথটির দিকে ভীরু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। পথের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বল্পাহারক্লিস্ট কতকগুলো ছোট ছোট মুরগী দিয়ে-বিচিয়া মঠের দিকে চলেছে ধেনুপাল। তাদের হাম্বারব ভেসে আসছে, আর শোনা যাচ্ছে সৈন্যদের ছাউনি থেকে সামরিক সঙ্গীত।

এক মাতাল এল তার হারমোনিকাটি দোলাতে দোলাতে। সে হোঁচট খেয়ে বললে, “আমি তোমার কাছে আসছি—নিশ্চয়ই।”

লাল সূর্যালোকে চোখ মিট মিট করতে করতে দিদিমা বললেন, “আহাম্মক! কোথায় যাচ্ছো? এখনই পড়ে ঘুমোতে শুরু করবে। ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার সব কিছু চুরি করে নেবে। তোমার হারমোনিকাটাও হারাবে। ওটা হল তোমার সান্ত্বনা।”

চারধারে তাকাতে তাকাতে তাঁর কাছে নৌ-জীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলাম। সেখানে যা দেখেছিলাম তার কাছে এই জায়গাটা আমার লাগছিল বৈবিত্র্যহীন, নিরানন্দ। বোধ হচ্ছিল আমি যেন জল ছাড়া মীন। আমি যেমন তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে ভাল বাসতাম তিনিও তেম্নি মনোযোগ দিয়ে ও নীরবে আমার কথা শুনতে লাগলেন। তাঁকে স্মাউরির কথা বলতে তিনি বললেন—

"লোকটি ভাল। তাকে কখনও ভুলো না। যা ভাল তাই মনে রাখবে—যা খারাপ একেবারে ভুলে যাবে।"

তারা যে কেন আমাকে কর্মচ্যুত করে ছিল সে কথা বলতে আমার বাধতে লাগলো কিন্তু সাহসে ভর করে তাঁকে বললাম। তাতে তাঁর মনে কোনই ছাপ পড়লো না। তিনি শান্ত কণ্ঠে কেবল বললেন, "তুমি এখনও ছোট; কি করে জীবন যাপন করতে হয় জান না।"

বললাম," এ কথা পরস্পরকে সকলেই বলে 'কি করে জীবন যাপন করতে হয় তুমি জান না।' চাষীরা, খালাশিরা, সবাই বলে। মাত্রেনা-দিদিমাও বলেন তাঁর ছেলেকে। কিন্তু লোকে কি করে শিখবে?"

তিনি ঠোঁট দুখানি চেপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি নিজেই জানি না।"

—"তবুও তুমি আর সবায়ের মতো বল।"

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, "কেন একথা বলবো না? তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। তুমি ছোট। তোমার জানবার কথা নয়, আর কেই বা জানে? কেবল শয়তানেরা জানে। তোমার

দাদামশাইকে দেখ। বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত তবুও উনি এখনও জানেন না —"

—"আর তুমি—তোমার জীবনকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছো?"

—"আমি? হাঁ। খারাপ ভাবেও বটে—সকল পথেই—"

আমাদের কাছ দিয়ে লোকে যাওয়া-আসা করছিল। তাদের অনুসরণ করছিল তাদের দীর্ঘ ছায়া। সেই ছায়াগুলোকে ঢেকে তাদের পায়ে পায়ে উঠছিল ধোঁয়ার মতো ধুলো।

আমরা বাড়ি ফিরে চললাম। রাত হয়ে এল।

* * * *

সংকল্প করলাম পাখি ধরা বৃত্তি গ্রহণ করবো। মনে করলাম কাজটা জীবিকার্জনের চমৎকার উপায় হবে। আমি ধরবো আর দিদিমা বেচবেন। জাল, তার ও ফাঁদ কিনলাম এবং একটি খাঁচা তৈরি করলাম। তারপরে একদিন ভোর হলেই ঝোপের মধ্যে একটা গর্তে বসে রইলাম আর দিদিমা একটি ঝুড়ি ও একটি থলি নিয়ে গেলেন বনের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা, কোঁড়া ও বাদামের সন্ধানে।

সেপটেম্বরের নিস্তেজ রবি সবে উঠেছে। তার ম্লান রশ্মি মেঘে কখন নিভছে, কখন আমার গায়ে পড়ছে রুপোলি চাদরের মতো। গর্তটার তলায় তখনও রয়েছে আবছায়া অন্ধকার এবং সেখান থেকে উঠছে সাদা কুয়াশা।

মাটিতে গাজর বনে ডাকছে গোলড্ফিনচ। দেখতে পেলাম, এবড়ো-খেবড়ো ধূসর ঘাসের বনে কতকগুলো পাখি। তাদের চঞ্চল মাথায় লাল টুপি। আমার চারধারে মহাকলরব তুলে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত

টিট-মাউসগুলো। কুনাভিন স্ট্রীটে রবিবারে তরুণদের মতো তারা সাদা গাল দুখানা এমন ভাবে ফোলাচ্ছে যে কৌতুক বোধহয়। পাখিগুলো চটপটে, চতুর, হিংসুটে, সবকিছু জানতে ও ছুঁতে চায়, তাই একে একে এসে ফাঁদে পড়ছে। তারা যে ভাবে ডানা ঝটপট করছে তা দেখে কষ্ট হয়, কিন্তু আমার কাজ ব্যবসা নিয়ে। আমি তাদের অন্য খাঁচায় রেখে থলিতে পুরলাম। অন্ধকারে তারা চুপ করে রইলো।

এক ঝাঁক সিসকিন এসে বসলো একটা কাঁটা ঝোঁপের মাথায়। ঝোপটা রৌদ্রে একেবারে নেয়ে উঠে ছিল। সিসকিনগুলো রৌদ্রে খুশি হয়ে আনন্দে ডাকতে লাগলো। তাদের অঙ্গ-ভঙ্গি স্কুলের ছাত্রদের মতো। একটি গাছের বাঁকা ডালের ওপর বসে ডানা পরিষ্কার করতে করতে শিকারের দিকে কালো চোখে উদ্ধত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল একটা চিরতৃষার্ত নিরীহ ম্যাগপি। একটি লারক হঠাৎ শূন্যে উঠে একটি মৌমাছি ধরে সেটিকে একটি কাঁটার ওপর রেখে আবার মাটিতে নেমে মাথা তুলে সতর্ক হয়ে রইলো। নিঃশব্দে উড়ে এল হরবোলা হফিনচ—আমার বাসনা-স্বপ্নের বস্তু। যদি একটাকে ধরতে পারতাম! ঝাঁক থেকে বিতাড়িত হয়ে সেনাধ্যক্ষের মতো গম্ভীর ও ভারিক্কী চালে অ্যালডার গাছে বসে কালো ঠোঁট দুখানা নেড়ে রাগের সঙ্গে ডাকতে লাগলো একটা বুলফিনচ্।

সূর্য যত ওপরে ওঠে পাখির সংখ্যা তত বাড়ে, ততই আনন্দে তারা গান গায়। গর্তটা শারদ-সঙ্গীতে, বাতাসে আন্দোলিত ঝোপের অবিরাম মর্মরতায় ভরে উঠলো।

বিহগকুলের উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীত সেই মৃদু, মধুময় বিষণ্ণ ধ্বনিকে ডুবিয়ে দিতে পারলো না। তাতে শুনতে পেলাম গ্রীষ্মের বিদায় সঙ্গীত। আমার কানে কানে তা বলতে লাগলো এমন ভাষা যা একান্ত আমারই উদ্দেশ্যে কথিত। এবং আপনাহতেই সেগুলি সঙ্গীত হয়ে বাজতে লাগলো। সেই সঙ্গে আমার স্মৃতি অজ্ঞাতে মনে তুলে ধরতে লাগলো অতীতের ছবিগুলো। ওপরে কোথা থেকে যেন দিদিমা ডাকলেন, "তুমি কোথায় ?"

একটি সরু পথের ধারে বসে তিনি একখানি রুমাল বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর রেখে ছিলেন রুটি, শশা, গাজর, ও আপেল। এই খাদ্যগুলির মাঝখানে ছিল একটি খুব ছোট কাট-গ্লাসের সুন্দর ডিকানটার। তার ছিপিটা স্ফটিকের ও নেপোলিয়ানের মাথা। ডিকানটারটির মধ্যে ছিল গাছ-গাছড়া চোলাই করে তৈরী খানিকটা ভদকা।

দিদিমা কৃতজ্ঞতামাখা কণ্ঠে বললেন, "হে ভগবান, সব কি সুন্দর !"

বললাম, "আমি একখানি গান রচনা করেছি।"

—"বটে ? কি ?"

বললাম। রচনাটিকে আমার কবিতার মতো মনে হল।

তিনি বললেন, "আমিও একখানা গান জানি। সেখানি আরও ভাল।"

তিনি গানখানি গাইলেন। তাতে রচয়িতা হিসাবে আমার অহঙ্কারে কম আঘাত লাগলো না, কিন্তু গানখানি শুনে খুশি হলাম আর গানে কথিত মেয়েটির জন্য বড় দুঃখ হল।

দিদিমা বললেন, "দুঃখ এম্নি করেই গান গায়। গানগুলি রচনা করেছিল এক তরুণী, বুঝলে? সে সারা বসন্তকাল পথে পথে বেড়িয়ে ছিল। শীতের আগে তার প্রিয় প্রণয়ী তাকে ত্যাগ করে, হয়তো আর একটি মেয়ের জন্য। দুঃখে বুক ভেঙে যাচ্ছিল বলে তরুণীটি কেঁদে ছিল। তুমি নিজে যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করেছো তার কথা ভাল করে, আর, ঠিক মতো বলতে পারো না—দেখছো মেয়েটি কি চমৎকার একখানি গান রচনা করেছিল!"

পরদিন। সেই প্রথম চল্লিশ কোপেকে একটা পাখি বিক্রয় করে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, "দেখ একবার! আমি মনে করেছিলাম এ একদম বাজে কাজ। ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু শেষে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম।"

—"তুমি সস্তায় বেচেছো।"

—"হুঁ।"

হাটের দিনে এক একটা পাখি বেচতেন এক এক রুবলে। তাতে আরও আশ্চর্য হতেন। বলতেন, "লোকে খেলা করতে করতে কত রোজগার করতে পারে।"

"একটি স্ত্রীলোক সারাদিন কাপড় কেচে বা ঘর পরিষ্কার করে পায় সিকি রুবল আর এতে—একবার ধরলেই হল। কিন্তু কাজটা ভাল নয়—পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা। এটা ছেড়ে দাও ওলেশা!"

পাখি ধরায় আমার খুব আমোদ হত। আমি কাজটা

পছন্দ করতাম। আর কাজটা আমাকে স্বাবলম্বী করে দিয়েছিল এবং তাতে পাখিগুলো ছাড়া আর কারোই অসুবিধা ঘটাতো না। দক্ষ ব্যাধদের সঙ্গে আলাপ করে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। প্রায় তিনক্রোশ দূরে ভলগার তীরে টোসকির বনে একাই যেতাম! সেখানে দীর্ঘ ঝাউগাছের ডালে বাস করতো ক্রুশ-বিলেরা। ব্যাধদের কাছে এই পাখিগুলো ছিল খুব মুল্যবান। আর ছিল দীর্ঘ পুচ্ছ অ্যাপোলাইঅন টিট-মাউস। তাদের সৌন্দর্যের সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না।

কখন কখন সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে সারারাত বাইরে থাকতাম। কখন কখন শরতের বৃষ্টি ও কাদায় কাসানস্কির রাজপথে ঘুরে বেড়াতাম। আমার পিঠে থাকতো ওয়েল-ক্লথের থলি। তার মধ্যে থাকতো পাখিদের ভুলিয়ে আনবার জন্য খাবারশুদ্ধ খাঁচা; আমার হাতে থাকতো ওয়ালনাট কাঠের লাঠি। শরতের ঘন অন্ধকার, প্রখর ঠাণ্ডা। ভয়ঙ্কর ভয় করতো, ভয়ঙ্কর ভয়। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো বজ্রদার্ণ প্রাচীন বারচগাছের ভিজে সারি। তাদের ডালগুলো আমার মাথায় আলগোচে লাগতো। বামে পাহাড়গুলির নিচে ভলগার বুকে স্টীমার ও বজরার মাস্তুলে কদাচিৎ দেখা যেত আলো! জলে চাকার ঝপ ঝপ শব্দ হত, বাঁশি বেজে বেজে উঠতো।

কঠিন ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতো পথের ধারের গ্রামের কুঁড়েগুলো। আমার পায়ের চারধারে চক্রাকারে ঘুরতো ক্রুদ্ধ ক্ষুধিত কুকুরের দল। চৌকিদারের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগতো। সে বলে উঠতো, "কে?

লোকে বলে শয়তান যাদের সাহায্য করে তারা রাত না হলে বেরোয় না।"

ভয় হত সে পাছে আমার ফাঁদটা কেড়ে নেয়। তাই সঙ্গে রাখতাম একটি পাঁচ-কোপেক। ঠোখিনোই গ্রামের চৌকিদারটি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ছিল, কিন্তু সর্বদাই বলতো, "কি! আবার? এই ডাকাবুকো, অস্থির বাদুড়!"

লোকটির নাম ছিল নিফ্রনট। সে মানুষটি ছিল ছোটখাট। বুক-পকেট থেকে একটা আপেল, একটা গাজর ও একমুঠো মটর বার করে আমার হাতে দিয়ে বলতো, "এই নাও বন্ধু, সামান্য উপহার, খাও। আনন্দ কর।"

এবং আমাকে গ্রাম-সীমায় পৌঁছে দিয়ে বলতো, "যাও, ভগবান তোমার সহায় হোন।"

ভোরের আগেই বনে পৌঁছে ফাঁদ পেতে, বনের ধারে আমার কোটটা বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে দিনের প্রতীক্ষা করতাম। সব স্তব্ধ। সবকিছু গভীর শারদ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ধূসর কুয়াশায় শৈল-সানুতে বিস্তৃত প্রান্তরগুলি একরকম চোখেই পড়তো না। সেগুলি ভলগায় দ্বিধা বিভক্ত ছিল। যেদিকে প্রান্তরগুলি ছিল সেদিকে দূরে বনের পিছন থেকে আলস্যে উঠতো উজ্জ্বল রবি; বনের কালো কেশরে ঝলমলিয়ে উঠতো আলো আর আমার অন্তর অদ্ভুত ভাবে, তীক্ষ্ণতায় দুলতো। কুয়াশা সূর্যালোকে রুপালি হয়ে প্রান্তরগুলির ওপর থেকে ক্রমেই দ্রুততর গতিতে উঠে যেত আর তার পিছন পিছন মাটি থেকে উঠতো ঝোপ-ঝাড়, গাছ-পালা ও বিচালির গাদাগুলো।...সেই কয় মাসে আমি বহুবার সূর্যোদয়

দেখেছিলাম। এবং প্রত্যেক বারই নব সুষমাজড়িত হয়ে আমার দৃষ্টির সম্মুখে নূতন জগতের উদয় হত।

আমি সূর্যকে এত ভালবাসতাম যে তার নামেই খুশি হয়ে উঠতাম।...আমার মাথার ওপর সবুজ বাহু দুলিয়ে শিশির ঝরিয়ে ঝাউবন উঠতো মর্মরিয়ে; ছায়াতলে ফার্নের পাতায় পাতায় রুপালি জরির মতো ঝিকমিক করতো ভোরের তুষার। বৃষ্টিধারাবনত শুষ্কপ্রায় তৃণদলের অনড় ডাঁটগুলি মাটিতে পড়েছিল লুটিয়ে। কিন্তু সে-গুলোর ওপর সূর্যালোক পড়তে সেই তৃণ ও গুল্ম বনে দেখা যেত চঞ্চলতা, যেন তা তাদের জীবনের শেষ প্রচেষ্টা।

পাখিরা উঠতো জেগে; পশমের ধূসর গুলির মতো তারা শাখা থেকে শাখান্তরে পড়তো। অগ্নিবর্ণ ক্রশবিলেরা বাঁকা চঞ্চুদিয়ে দীর্ঘতম ঝাউয়ের শাখা গ্রন্থিতে করতো আঘাত, ঝাউশাখাপ্রান্তে বসে দীর্ঘপুচ্ছ দুলিয়ে গাইত সাদা অ্যাপোলিঅন-টিটমাউস, আর কালো পুঁতির মতো চোখ দিয়ে আমার জালখানির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখতো। এবং সমগ্র বনভূমি, মিনিট খানেক পূর্বে যা ছিল স্তব্ধ, গম্ভীর, হঠাৎ ভরে উঠতো হাজার পাখির কল-কাকলিতে, জীবন্ত প্রাণীর কলরবে।...

সেই ক্ষুদ্র গায়কদলকে বন্দী করতে আমার কষ্ট হত, খাঁচায় পুরতে মনে বড় বেদনা লাগতো। তাদের কেবল দেখতেই ইচ্ছা হত কিন্তু শিকারীর মনোবৃত্তি ও অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা আমার মন থেকে অনুকম্পাকে দূর করে দিত।...

দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আমার পাখি ধরা সাঙ্গ হত। বনের

ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতাম। কারণ বড় রাস্তা দিয়ে গেলে গ্রামের বালক ও যুবকেরা আমার খাঁচাগুলো কেড়ে নিয়ে ফাঁদটা ভেঙ্গে ফেলবে। এই অভিজ্ঞতা আমার একবার লাভ হয়ে ছিল।

ক্লান্ত ও ক্ষুৎপীড়িত হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছতাম কিন্তু অনুভব করতাম আমার বয়স কিছু বেড়ে গেছে, আমি নূতন কিছু শিখেছি এবং সেদিন কিছু শক্তি লাভ করেছি। এই নূতন শক্তি আমাকে শান্তভাবে ও ঠাণ্ডা মেজাজে দাদামশাইয়ের বিদ্রূপবাক্য শোনবার মতো দৃঢ়তা দিত। তাই দেখে তিনি গম্ভীরভাবে এবং বিবেচনার সঙ্গে বলতেন, "এই বাজে কাজ ছেড়ে দাও! ছাড়! পাখি ধরে কেউ কখন ভাল করে দিন-পাত করতে পারে নি। এ রকম ব্যাপার কোন কালে ঘটে নি, তা আমার জানা আছে। আর কোন কাজ খুঁজে নাও। তাতে তোমার বুদ্ধি পাকুক। মানুষকে শুধু শুধূ জীবন দেওয়া হয় নি—সে হল ঈশ্বরের বীজ। তা থেকে শস্যমঞ্জরী উৎপন্ন করতেই হবে। মানুষ হচ্ছে একটা রুবলের মতো—তাকে ভাল সুদে খাটাও একটা থেকে তিনটে রুবল হবে। তুমি কি মনে কর জীবন যাপন করা সহজ? না, আদৌ সহজ নয়। মানুষের সংসার অন্ধকার রাতের মতো, কিন্তু প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের আলো জ্বালাতে হবে। দশ আঙুলে যাতে ধরা যায় তার জন্য প্রত্যেককে যথেষ্ট দেওয়া আছে কিন্তু সকলেই চায় মুঠো মুঠো। লোককে শক্ত হতে হবে। যদি কেউ দুর্বল হয় তাকে হতে হবে কৌশলী। যার শক্তি অল্প তার বাস

স্বর্গ বা নরক কোথায়ও নেই। তুমি যেন সকলের সঙ্গে আছ এম্নি ভাবে থাকবে কিন্তু মনে রেখো তুমি একা। যাই ঘটুক কাউকে বিশ্বাস করো না। যদি নিজের চোখকে বিশ্বাস করো তাহলে খুব সতর্কতার সঙ্গে হিসাব করবে। কথায় সংযত হবে। শহর বা ঘরবাড়ি কথায় তৈরী হয় নি। খেটেই টাকা রোজগার হয়। তুমি নির্বোধও নয়, কালমুকও নয়। কালমুকের কাছে ধন-দৌলৎ ভেড়ার গায়ে উকুনের মতো।”

সারা সন্ধ্যা তিনি এই ভাবে কথা বলে যেতে পারতেন। তাঁর কথাগুলো আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো আমার ভাল লাগতো কিন্তু অর্থগুলো বিশ্বাস করতাম না। তিনি যা বলতেন তা থেকে এইটেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মানুষের ইচ্ছামতো কাজে বাধা দেয় দুটি শক্তি— ঈশ্বর ও অপরলোকে।

দিদিমা জানলায় বসে টেকোয় সুতো জড়াতেন। তাঁর নিপুণ হাতে টাকুটা গুন গুন শব্দ করতো। তিনি দাদামশাইয়ের বক্তৃতা কিছুক্ষণ নীরবে শুনে হঠাৎ বলে উঠতেন, “সবই আমাদের ওপর ঈশ্বরের জননীর প্রসন্নতায় নির্ভর করে।”

দাদামশাই বলতেন, “কি বলছো? ঈশ্বর! আমি ঈশ্বরের কথা ভুলি নি; আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে সব জানি! এই বুড়ী আহাম্মক, ঈশ্বর কি পৃথিবীতে আহাম্মকের বীজ ছড়িয়েছেন?”

আট

তুষারপাত শুরু হলে দাদামশাই আবার আমাকে নিয়ে গেলেন দিদিমার বোনের কাছে।

দাদামশাই বললেন, "এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, কোন ক্ষতি হবে না।"

আমার মনে হত সমগ্র গ্রীষ্মকাল ভরে আমার যেন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। অনুভব করতাম আমি বড় ও আগের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি। আমার মনিব-বাড়ির বৈচিত্র্যহীনতা ও আনন্দহীনতা আমার আরও বিশ্রী লাগতো। তাঁরা আগের মতোই দুষ্পাচ্য ও কুখাদ্য আহার করে উদর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়তেন আর পরস্পরের কাছে তাদের পীড়াবৃদ্ধির সবিস্তার বর্ণনা করতেন।...

সন্ধ্যাবেলা তাঁরা আমাকে বসবার ঘরে ডাকতেন। তার পরই হুকুম দেওয়া হত, "তুমি জাহাজে কি ভাবে থাকতে বল।"

আমি দরজার কাছে একখানা চেয়ারে বসে বলতাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে জীবন যাপন করছিলাম তা থেকে ভিন্ন জীবনের স্মৃতি মনে করতে আমার ভাল লাগতো, এত ভাল লাগতো যে আমার শ্রোতাদের কথা ভুলে যেতাম কিন্তু তা বেশিক্ষণের জন্য নয়।

সে বাড়ির মেয়েমহল কোনদিননই জাহাজে চড়েন নি।

তাই দুজনেই জিজ্ঞেস করতেন, "কিন্তু খুব ভয় করতো, করতো না?"

আমার মনিব হেসে ফেটে পড়তেন। আর আমিও, যদিও জানতাম জায়গায় জায়গায় গভীর জল থাকলেই জাহাজ ডোবে না, সে কথা তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না। বৃদ্ধা একেবারে নিশ্চিত ছিলেন যে, জাহাজ জলে ভাসে না, শুকনো ডাঙায় যেমন করে গাড়ি চলে তেম্নি করে চাকায় ভর দিয়ে নদীর তলায় মাটির ওপর দিয়ে যায়।

"জাহাজগুলো লোহার হলে ভাসে কি করে? কুড়ুল কি জলে ভাসে?"

—"কিন্তু বালতি ডোবে না।"

—"কার সঙ্গে কিসের তুলনা হল। বালতি হল ছোট।"

আমি তাদের কাছে স্মাউরি ও তার বইগুলোর গল্প করলে তাঁরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। বৃদ্ধা বলতেন, "কেবল নির্বোধ আর বিধর্মীরাই বই লেখে।"

—"তাহলে স্তোত্রগুলো কি? রাজা ডেভিডের কাহিনী?"

—"স্তোত্রগুলো হচ্ছে পবিত্র রচনা। স্তোত্রগুলো লিখেছিলেন বলে রাজা ডেভিড ভগবানের ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।"

"একথা কোথায় আছে?"

—"আমার হাতের চেটোতে এইখানে। আমি তোমার ঘাড় ধরলেই জানতে পারবে—কোথায়।"

বৃদ্ধা সবকিছু জানতেন, এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে সর্ববিষয়ের আলোচনা করতেন।

একদিন বললেন, "পেচোরকার ওপরে একটা তাতার মারা

যায়। তার মুখ দিয়ে তার আত্মাটা বেরিয়ে এসেছিল একেবারে আলকাতরার মতো কালো।”

আমি বলি, “আত্মা ?”

তিনি অবজ্ঞাভরে বলে ওঠেন, “তাতারের! আহাম্মক!”

বধূটিরও বইয়ের ওপর বড় ভয় ছিল। তিনি বলতেন, “বই পড়া খুব খারাপ বিশেষ করে ছোটবেলায়। আমি জানি, একটা মেয়ের বই পড়ে সর্বনাশ হয়েছিল।”

আমি এক বুদ্ধিনাশা দুঃখের কুয়াশায় বাস করতাম। এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে কঠোর পরিশ্রম করতাম। যখন কাজে মগ্ন থাকতাম তখন আমার ত্রুটিগুলো অনুভব করতাম না। বাড়িতে দুটি ছোট ছেলে ছিল। আমার মনিবের মাতা ও বধূর নার্স পছন্দ হত না; তাই অনবরত নার্স বদলাতেন। আমাকে ছেলে দুটির দেখা-শুনা ও তাদের পোশাকাদি কাচতে হত। প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের কাপড়-চোপড় কাচবার জন্য আমাকে ঝরনায় যেতে হত। আর সেখানে ধোপানীরা আমাকে বিদ্রূপ করতো, ‘তুমি মেয়েদের কাজ করছো কেন?’

সময় সময় তারা আমাকে এমন উত্যক্ত করে তুলতো যে আমি ভিজে কাপড় দিয়ে তাদের মারতাম। তারাও আমাকে তা সুদসমেৎ ফেরৎ দিত। তবুও তাদের দেখতাম খুশি।

এই ঝরনা-তলায় যে সব ধোপানী আসতো তাদের অধিকাংশই ছিল বেপরোয়া ও স্বৈরাচারিণী। তাদের নখদর্পণে ছিল সারা শহরের কাহিনী। তাদের মুখে ব্যবসায়ী, পদস্থ কর্মচারী ইত্যাদির গল্প শুনতে বেশ লাগতো। শীতকালে নদীর হিমশীতল জলে কাপড় কাচা ছিল অমানুষিক কাজ।...

তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল গল্প বলতো, নাতালিয়া কজলোভস্কি নামে এক বছর ত্রিশ বয়সের বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক। তার মুখখানি ছিল সজীব, চোখ দুটি হাসি ভরা। আর তার রসনা ছিল ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণ। তার সঙ্গিনীরা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতো, সকল ব্যাপারে তার পরামর্শ নিত এবং তার কর্মকৌশলের ও পোশাক-পরিপাট্যের প্রশংসা করতো। কারণ সে তার মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল উচ্চবিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখতে। দু ঝুড়ি ভিজে কাপড়ের ভারে নত হয়ে পিচ্ছিল পায়ে চলা পথটি দিয়ে সে যখন পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসতো তখন সকলেই তাকে সানন্দে সম্ভাষণ করতো এবং সাগ্রহে জিজ্ঞেস করতো, "তোমার মেয়ে কেমন আছে?"

—"খুব ভাল, ধন্যবাদ। সে বেশ পড়াশুনা করছে, ভগবানকে ধন্যবাদ।"

—"দেখ একবার! সে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠবে!"

—"সেই জন্যেই তো তাকে লেখাপড়া শিখাচ্ছি। এই সব মুখে রঙমাখা মহিলারা কোথা থেকে আসেন? তাদের উৎপত্তি আমাদের মাঝ থেকেই, কালো মাটি থেকে। তা ছাড়া আর কোথা থেকে আসবে? যে সব চেয়ে জ্ঞানী তার হাত সব চেয়ে লম্বা আর সে নেয়ও সব চেয়ে বেশি। আর যে সব চেয়ে বেশি নিতে পারে তারই হয় সম্মান আর যশ। ঈশ্বর আমাদের সংসারে পাঠান নির্বোধ শিশু করে। আর ফিরিয়ে নিতে চান জ্ঞানী করে। তার মানে—আমাদের শিখতে হবে।"

তার সঙ্গিনীরা তার কথা নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনতো

কিন্তু তার উদাহরণ নিতে চাইতো না, বলতো, "মেয়ে মানুষের কাছে শিখবো ?"

নাতালিয়া বলতো, "এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ! সংসারে আর একটি মহিলা বাড়বে। কিন্তু সে পড়াশুনা শেষ না করতে পারে, মারাও যেতে পারে—"

"যারা ছাত্র তাদের জীবন সহজ নয়, বুঝলে ? বাখিলভদের সেই যে মেয়েটা ছিল সে কেবল পড়াশুনা করতো, নিজেও একজন শিক্ষয়িত্রী হয়েছিল। একবার যদি শিক্ষয়িত্রী হও তাহলে জীবনে স্থির হয়ে বসলে—"

"অবশ্য বিয়ে করলে লেখাপড়া না শিখলেও চলে···তার মানে তাদের যদি আর কিছু করবার থাকে।"

"মেয়েদের বুদ্ধি মাথায় নয়।"

কোন কথা প্রচ্ছন্ন না রেখে নিজেদের সম্বন্ধে তাদের এম্নি খোলাখুলি আলোচনা শুনতে আমার আশ্চর্য লাগতো। আমি হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। জানতাম, খালাশিরা, সৈন্যেরা, চাষীরা মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলে। মেয়েদের প্রতারিত করবার দক্ষতা সম্বন্ধে পুরুষদের নিজেদের মধ্যে বড়াই সর্বদাই শুনতাম। মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কেও যে ধূর্ততা করতো তা নিয়েও তারা গর্ব করতো। মনে হত, "নারী-জাতির" প্রতি তাদের মনোভাব ছিল প্রতিকূল। কিন্তু এই সব দম্ভোক্তির জন্যে সব গল্প কেবল বৃথা দর্প, কল্পনা, সত্য নয়।

ধোপানীরা পরস্পরের কাছে তাদের প্রণয়কাহিনী বলতো না বটে কিন্তু তারা পুরুষদের সম্বন্ধে যা-কিছুই বলতো আবিষ্কার করতাম তার তলে তলে বয়ে চলেছে বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের

একটি ধারা। মনে হয় এ কথা সত্য যে, নারী হচ্ছে—শক্তি।

একদিন নাতালিয়া বললে, "এমন কি ওরা যখন ওদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে না, তখনও ওদের প্রত্যেকেই আসে মেয়েদের কাছে।"

এক বৃদ্ধা ভারী গলায় তার কথার উত্তর দিলে, "আর কার কাছে যাবে? এমন কি ঈশ্বর থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরাও আমাদের কাছে আসে "...

যাহোক, ধোপানীদের সঙ্গেই থাকি বা আরদালিদের সঙ্গে রান্নাঘরেই থাকি অথবা ক্ষেত-মজুরদের সঙ্গে কুঠুরিতেই থাকি বাড়ির চেয়ে তা লাগতো অনেক ভাল। বাড়িতে শুনতে হত একই বিষয়ের আলোচনা, সেখানে ঘুরে-ফিরে একই ঘটনা ঘটতো। তাতে তিক্ততা ও বিরক্তি ছাড়া মনে আর কিছু জাগতো না।...আমার অবসর সময়ে একা থাকবার উদ্দেশ্যে উঠোনে গিয়ে কাঠ কাটতাম। কিন্তু তা ঘটতো কদাচিৎ। আরদালিরা এসে সেখানকার খবরাদি নিয়ে আলোচনা করত।...

আমি এই সব আরদালিদের হয়ে তাদের বাড়িতে চিঠি লিখে দিতাম—প্রেম-লিপি। আমার তা ভাল লাগতো।...

অতি কষ্টে বই সংগ্রহ করে গোপনে পড়তাম এবং বই-গুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখতাম যাতে আমার মনিবদের চোখে না পড়ে। আরদালিদের ঘরে গিয়েও বই পড়তাম। তাদের একজন, সিদোরোভ, আমাকে তার ঘরে বসে বই পড়বার নিমন্ত্রণ করে ছিল। কিন্তু সে নিজে লেখাপড়া জানতো না। তার হয়ে বাড়িতে তার বোনকে আমি চিঠি লিখে

দিতাম। তার মধ্যে আমারও মাথায় যা আসতো, জীবনের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কিছু কথা বসিয়ে দিতাম। আমি বই সংগ্রহ করতাম দর্জির দোকানের এক কর্মচারীর স্ত্রীর কাছ থেকে। তিনি খুব বই পড়তেন। কিন্তু লোকে তাঁর নামে নানা কুৎসা রটনা করতো; বলতো, তিনি সামরিক কর্মচারী-দের সঙ্গে গোপনে প্রেম করেন। দিনের বেলা তাঁর স্বামী যখন কাজে বাইরে থাকেন তিনি এই কাজটি করেন তখন। কিন্তু জানতাম কথাটি একেবারেই মিথ্যা। তাঁর সম্বন্ধে লোকে কি বলে, একবার তাঁকে জানাতে গিয়েছিলাম। তিনি তাতে কান দেন নি। আসবার সময় আমার হাতে একটি রুবল দিয়েছিলেন। ইচ্ছা না থাকলেও আমি সেটি নিয়ে তাঁরই সিঁড়ির ওপর রেখে এসেছিলাম।

আমার মধ্যে দ্রুত জেগে উঠছিল পড়বার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এবং তা আমার ভাগ্যে এনেছিল বহু লাঞ্ছনা ও অপমান। দর্জির স্ত্রী যে বইগুলি আমাকে পড়তে দিতেন সেগুলিকে দেখাতো ভয়ঙ্কর দামী। ভয় হত আমার মনিবের মা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। সেই জন্য আমি যে দোকানে সকালে রুটি কিনতাম সেখান থেকে ছোট ছোট রঙিন বই কিনতে আরম্ভ করলাম।

দোকানদারটিকে আমার ভাল লাগতো না। তার দোকানে সন্ধ্যায় বসতো পুরুষ ও বেহায়া পথবিলাসিনীদের আড্ডা। আমার মনিবের ভাইও সেখানে যেতেন; বীয়ার খেতেন, তাস খেলতেন। তাঁকে সেখান থেকে প্রায়ই রাতের বেলা খাবার জন্য ডেকে আনতে হত। তখন

প্রায়ই দোকানের পিছনে ছোট, বাতাসহীন বদ্ধ ঘরখানাতে দোকানীর খেয়ালী, গোলাপী স্ত্রীটিকে ভিক্টোরুশকা বা অন্য কোন তরুণের জানুর ওপর বসে থাকতে দেখেছি। স্পষ্টই দেখা যেত দোকানী তাতে ক্ষুণ্ণ হত না। আবার তার ভগ্নীটিও যখন কোন মাতাল সৈন্য, প্রকৃতপক্ষে যে কেউই তার চোখে ধরতো তাকে আলিঙ্গন করতো তখনও সে রুষ্ট হত না। দোকানখানাতে বেচা-কেনা হত সামান্যই। দোকানী বলতো, "নূতন ব্যবসা তাই জমে নি।" দোকানখানা খোলা হয়েছিল শরৎকালে। সে অতিথি-অভ্যাগত ও খরিদ্দারদের অশ্লীল ছবি দেখাতো এবং সেগুলোর তলায় যে সব বিশ্রী লজ্জাকর কবিতা থাকতো সেগুলো তাদের নকল করে নিতে দিত।

আমি যখন কাঠ কাটতে যেতাম তখন ছাপ্পড়ে বসে বা চিলে কোঠায় গিয়ে বইগুলো পড়তাম। সে জায়গাটাও ছিল ছাপ্পড়ের মতো আরামহীন ও ঠাণ্ডা। কখন কখন যদি কোন বই খুব ভাল লাগতো বা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হত তাহলে রাতের বেলা উঠে মোমবাতি জ্বেলে পড়তাম। কিন্তু রাতের বেলা আমার মোমবাতিটা ছোট হয়ে গেছে দেখে বৃদ্ধা এক টুকরো কাঠ দিয়ে সেটা মেপে কাঠটিকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখতে লাগলেন। সকালে যদি বাতিটা মাপের সমান না হত বা আমি কাঠটাকে ভেঙে বাতির সমান মাপের না করে রাখতাম তাহলে রান্নাঘর থেকে উঠতো তুমুল চীৎকার। তাতে ভিক্টোরুশকা সময় সময় ওপরের ঘর থেকে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠতেন, "মা, তোমার হাঁক থামাও। তুমি জীবনকে

অসহ্য করে তুলছো। ও নিশ্চয়ই মোমবাতি পোড়ায়, কারণ ও বই পড়ে, আমি জানি ও দোকান থেকে বই কেনে। চিলেকোঠায় ওর জিনিস-পত্রের মধ্যে খুঁজে দেখ।"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি চিলেকোঠায় উঠে জিনিস-পত্র হাঁতড়ে বই পেলেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতেন।

আপনারা অনুমান করতে পারেন, তাতে আমার অত্যন্ত রাগ হত, কিন্তু আমার পাঠ-প্রীতি আরও বাড়তো। বুঝেছিলাম, যদি কোন ঋষি সেই সংসারে এসে বাস করেন, তাহলে আমার মনিবেরা তাঁকেও শিক্ষা দিতে শুরু করবেন এবং চেষ্টা করবেন, তাঁকে দিয়ে তাঁদেরই সুরে সুর মিলাতে। কাজটি তাঁরা করবেন একটা কিছু করবার উদ্দেশ্যেই। তাঁরা যদি লোককে বিচার, ভৎ´সনা, বিদ্রূপ করা পরিত্যাগ করতেন তাহলে তাঁরা কথা বলতেই ভুলে যেতেন, হয়ে যেতেন মূক এবং তাঁরা যা ছিলেন তা থাকতেন না। লোকে যখন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তখন সে ভাবটা হয়ে থাকে অন্য লোকের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। আমার মনিবেরা তাঁদের চারধারে যারা ছিল তাদের প্রতি শিক্ষকের মতো সদা-শাসনোদ্যত প্রস্তুত এই আচরণ ভিন্ন অন্য প্রকারের আচরণ করতে পারতেন না। তাঁরা যে ভাবে জীবন যাপন করতেন, যেভাবে চিন্তা ও অনুভব করতেন, কাউকে যদি ঠিক সেইমতো শিক্ষিত করে তুলতেন, তবুও ঠিক সেই কারণেই তাঁরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন। তারা ছিলেন এই ধরনের মানুষ।

আমি গোপনে পড়তে লাগলাম। বৃদ্ধা বার কয়েক

আমার কয়েকখানি বই পুড়িয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলাম, দোকানিটার কাছে আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে; তার পরিমাণ সাতচল্লিশ কোপেক। পাওনাটা সে একদিন চেয়ে বসলো এবং ভয় দেখালো আমি মনিবদের জন্য কিছু কিনতে এলেই তা থেকে কেটে নেবে।

সে বিদ্রূপের সঙ্গে বললে, "তখন কি হবে?"

লোকটাকে আমি একেবারেই সইতে পারতাম না। তার চেহারাটা দেখলেই আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠতো। সে আমার মনের ভাব বুঝতে পারতো বলেই আমাকে নানারকমের ভয় দেখিয়ে আমোদ পেত। আমি তার দোকানে গেলেই তার স্ফোটক ভরা মুখখানা চওড়া হয়ে যেত। সে নিরীহের মতো জিজ্ঞেস করতো, "পাওনাটা এনেছো?"

—"না।"

তাতে সে চমকে উঠে ভ্রূকুটি করতো।

—"তার মানে? আমি কি দয়া করে মাল দেবো? তোমাকে সংশোধনাগারে পাঠিয়ে পাওনাটা আদায় করতে হবে দেখছি।"

টাকাগুলো সংগ্রহের আমার কোন উপায়ই ছিল না। কারণ আমার মাইনের টাকাগুলো দেওয়া হত দাদামশাইকে। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হল; ভাবতে লাগলাম, আমার কি হবে? একদিন তাকে মিনতি করে অপেক্ষা করতে বললাম। উত্তরে সে তার তেলা, মাছের পটপটির মতো ফোলা হাতখানা বাড়িয়ে বললে, "আমার হাতে চুমো খাও, আমি অপেক্ষা করবো।"

কিন্তু আমি যখন একটা বাটখারা তুলে সেটা ঝাঁকাতে লাগলাম সে তখন মাথা নিচু করে বললে, "তুমি করছো কি? কি করছো? আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।"

ভাল করেই জানতাম যে, সে ঠাট্টা করছিল না তাই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য টাকাটা চুরির মতলব করলাম। সকালে যখন মনিবের পোশাক-পরিচ্ছদ বুরুষ দিয়ে ঝাড়তাম তখন তাঁর পাজামার পকেটে টাকা ঝন্ ঝন্ করে উঠতো। কখন কখন বা পকেট থেকে পড়ে মেঝেয় গড়িয়ে যেত। একবার একটা গড়িয়ে সিঁড়ির তলায় কাঠের ফাঁকে ঢুকে গিয়েছিল। আমি সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কয়েক দিন পরে কাঠের ফাঁকে যখন দুটো গ্রিভেন পাই তখন আমার মনে পড়ে। সে দুটো আমার মনিবকে ফিরিয়ে দিতেই তাঁর স্ত্রী বলে ওঠেন, "দেখলে তো! পকেটে যখন টাকা-পয়সা রাখবে তখন গুণে রেখো।"

কিন্তু আমার মনিব আমার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বলেন, "আমি জানি ও চুরি করবে না।"

এখন চুরির মতলব করায় এই কথাগুলো ও তাঁর বিশ্বাসের হাসি মনে পড়ে গেল, বুঝলাম, চুরি করাটা আমার পক্ষে হবে কত কঠিন। কয়েকবার তাঁর পকেট থেকে টাকা বার করে গুণি কিন্তু একটাও নিতে পারি না। এই কারণে তিন দিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করি। শেষে সমস্ত ব্যাপারটা চট্ করে সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মনিব আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে জিজ্ঞেস করেন,

"তোমার কি হয়েছে পিয়েশকফ? কিছুদিন থেকে তুমি এমন বিমর্ষ কেন? শরীর ভাল নেই নাকি?"

আমার দুঃখের কথা তাঁকে খুলে বললাম, তিনি ভ্রূকুটি করলেন।

"দেখ বই কি দশা করে! বইগুলো থেকে যে কোন ভাবেই হোক বিপদ ঘটে।"

তিনি আমাকে আধ রুবল দিয়ে কঠোর ভৎ´সনা করলেন, বললেন, "সাবধান, আমার স্ত্রী বা মাকে বলে বেড়িও না। গোলমাল হবে।"

তারপর সহাস্যে কোমল কণ্ঠে বললেন, "তুমি খুব অধ্যবসায়ী। এটা ভালই। যাহোক বই পড়া ছেড়ে দাও। নূতন বছর এলে আমি একখানা ভাল পত্রিকা নেব। তুমি সেখানা পড়ো।"

তাই সন্ধ্যাবেলা চা-খাবার সময় থেকে খাবার সময় অবধি আমার মনিবদের "মস্কো গেজেট" পড়ে শোনাতাম।

জোরে পড়তে আমার ভাল লাগতো না; তাতে আমার পাঠ্য বিষয় বোঝায় বাধা ঘটতো। কিন্তু আমার মনিবেরা মনোযোগ দিয়ে, সশ্রদ্ধ আগ্রহে শুনতেন, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতেন, উপন্যাসের নায়কদের শয়তানিতে অবাক হয়ে পরস্পরকে গর্বভরে বলতেন, "আর আমরা কত নিরিবিলিতে বাস করছি—এ সব ব্যাপার জানিই না।"

তাঁরা উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাবলী গুলিয়ে ফেলতেন। দস্যুর কার্যাবলী চাপাতেন পিওনের ঘাড়ে, নামগুলোও

ফেলতেন গুলিয়ে। আমি সংশোধন করে দিতাম। তাঁরা বলতেন, "কি চমৎকার স্মরণশক্তি।"

শীতের সন্ধ্যাগুলো আমার কাছে ছিল বড় কঠোর। ছোট বদ্ধ ঘরে আমার মনিবদের চোখের সামনে বসে থাকতাম। জানলার বাইরে জমাট বেঁধে থাকতো অসাড় রাত্রি। মাঝে মাঝে বরফ ফাটতো। আর সবাই মাছের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতেন টেবিলের ধারে। তুষার ঝড়ে জানলায় খট্ খট্ শব্দ করতো, দেওয়ালে আঘাত হানতো, চিমনির মধ্যে হুঙ্কার দিত, ঢাকনিটা নাড়তো। নার্সারিতে ছেলেরা কাঁদতো। আমার ইচ্ছা হত কোন অন্ধকার কোণে বসে নেকড়ে বাঘের মতো চীৎকার করি।

মনে পড়ে, এমন কি এই বৈচিত্র্যহীন দিনগুলোতেও একটি রহস্যময় ঘটনা ঘটে ছিল। একদিন রাতে যখন আমরা শুতে গেছি গির্জার ঘণ্টাটি হঠাৎ বাজতে শুরু করলো। সেই শব্দে বাড়ির প্রত্যেকেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন। লোকে কোন রকমে পোশাক জড়িয়ে জানলায় ছুটে এসে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "আগুন লেগেছে ? ওটা কি পাগলা ঘন্টা ?"

সর্বত্রই এই ব্যাপার। আমার মনিবের মা চীৎকার করে বলে উঠলেন, "গির্জায় ডাকাত পড়েছে।"

মনিব তাঁকে থামিয়ে বলতেন, "অত চেঁচিও না মা ! শুনতে পাচ্ছোনা ওটা পাগলা ঘন্টা নয় !"

—"তাহলে আরচ বিশপ মারা গেছেন।"

ভিকটোরুশকা ওপরের কুঠুরি থেকে নেমে এসে বললে, "কি হয়েছে আমি জানি—আমি জানি।"

মনিব আমাকে চিলেকোঠায় পাঠালেন দেখবার জন্য আকাশ লাল হয়েছে কি না। আমি ওপরে গিয়ে জানালা দিয়ে চালে উঠে গেলাম। আকাশে কোথাও এতটুকু লাল নেই। তুহিন বাতাসে ঘণ্টাটি ধীরে ধীরে বাজছে, নগরটি পৃথিবীর বুকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। অন্ধকারে অদৃশ্য মানবেরা তুষারের ওপর মচ্ মচ্ শব্দ করতে করতে চারধারে ছুটছে, শ্লেজগুলো ক্যাঁচ-কোঁচ করছে, ঘণ্টায় উঠছে অশুভ ধ্বনি।

আমি বসবার ঘরে ফিরে গেলাম।

"আকাশে লাল আলো নেই।"

"ফু!" মনিব গ্রেটকোটটা গায়ে দিয়ে, টুপিটা মাথায় পরে, কোটের কলারটা তুলে, গলোশজোড়া দ্বিধাভরে পায়ে পরতে লাগলেন।

তাঁর স্ত্রী কাতরভাবে বললেন, "বেরিও না! বেরিও না!"

ভিকটোরুশকাও পোশাক পরে ছিলেন। বললেন, "কি হয়েছে আমি জানি!"

দুভাই রাস্তায় বেরিয়ে গেলে মেয়েরা আমাকে স্তামোভারের আগুন ঠিক রাখতে পাঠিয়ে ছুটে গেলেন জানলায়। কিন্তু মনিব-মশাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজার ঘন্টাটি বাজালেন এবং নীরবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভারী গলায় বললেন, "সম্রাট খুন হয়েছেন।"

বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "কি করে খুন হয়েছেন?"

—"একজন সামরিক কর্মচারী বললেন, তিনি খুন হয়েছেন। এখন কি হবে?"

ভিকটোরুশকা এলেন। অনিচ্ছার সঙ্গে কোটটা খুলতে খুলতে বললেন, "আমি মনে করেছিলাম যুদ্ধ বেধেছে।"

তারপর তাঁরা সকলে বসে চা খেতে খেতে শান্তভাবে কথা বলতে লাগলেন তবে খাটো গলায় আর সাবধানে! ততক্ষণে পথ জনহীন ও স্তব্ধ হয়ে এসেছিল, ঘণ্টাও আর বাজছিল না। দুদিন ধরে তাঁরা রহস্যজনকভাবে কানাকানি ও এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করলেন। লোকেও এসে তাঁদের কাছে কোন ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলে। কি হয়েছে আমি জানবার খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা খবরের কাগজখানা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেন। আমি যখন সিদোরোভকে জিজ্ঞেস করলাম, সম্রাটকে খুন করেছে কেন তখন সে মৃদুকণ্ঠে বললে, "এ কথা বলা বারণ।"

কিন্তু এই অবস্থারও শীঘ্রই অবসান হল। আবার সেই পুরোনো শূন্য জীবন হল শুরু। এবং অল্পকালের মধ্যেই আমার এক অতি বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ হল।

এক রবিবারে বাড়ির সকলে গেছেন গির্জায়! আমি সামোভারে আগুন দিয়ে ঘর গোছাতে লাগলাম। আমি কাজে যখন ব্যস্ত তখন বড় ছেলেটি রান্নাঘরে ছুটে এসে স্যামোভার থেকে ট্যাপটা খুলে নিয়ে টেবিলের নিচে বসে খেলা করতে লাগলো। স্যামোভারটার নলের মধ্যে প্রচুর কয়লা ছিল। খোলা ট্যাপ দিয়ে সব জলটা স্যামোভার থেকে বেরিয়ে গেলে তাপে তার ঝাল খুলে গেল। যখন অন্য ঘরখানা গোছাচ্ছিলাম একটা অস্বাভাবিক শব্দ আমার কানে এল। রান্না ঘরে গিয়ে সভয়ে দেখলাম, স্যামোভারটা নীল হয়ে গেছে আর দুলছে

যেন সেটা মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠতে চায়। ট্যাপের ভাঙা হাতলটা একেবারে নুয়ে পড়েছিল, ঢাকনিটা একদিকে গিয়েছিল সরে, দস্তার তৈরী পাত্রটা গলে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছিল—প্রকৃতপক্ষে গোলাপী-নীল স্যামোভারটাকে দেখাচ্ছিল যেন মাতাল হয়ে টলছে। তার ওপর জল ঢেলে দিলাম। আর সেটা সোঁ করে উঠে ভেঙে-চুরে মাটিতে পড়ে গেল!

তখনই সদর দরজার ঘন্টা বেজে উঠলো। দরজা খুলে দিতে গেলাম। বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, "হাঁ, স্যামোভার তৈরী।"

কথাগুলো বলেছিলাম ভয়ে ও বিমূঢ়তায় কিন্তু তাঁরা সেগুলোকে ধরে ছিলেন আমার ধৃষ্টতা বলে। তাই আমার শাস্তি হল দ্বিগুণ। তাঁরা আমাকে আধমরা করে ফেললেন। বৃদ্ধা আমার ওপর হাতের খেলা দেখালেন ঝাউয়ের ডাল দিয়ে। তাতে আমার বেশি লাগলো না, কিন্তু পিঠে চামড়ার নিচে অনেকগুলো কাঠি গভীরভাবে ঢুকে গেল। আর সন্ধ্যার মধ্যেই আমার পিঠটা ফুলে উঠলো বালিশের মতো। পরদিন দুপুরের আগেই মনিবমশাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ডাক্তারটি ছিলেন ঢ্যাঙা, রোগা। আমাকে পরীক্ষা করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "এটা হচ্ছে নৃশংসতা—পুলিশের ব্যাপার। অনুসন্ধান করতে হবে।"

মনিবমশাইয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। তিনি মেঝেয় পা দুখানা ঘসে খাটো গলায় তাঁকে কি যেন বললেন। তিনিও তাঁর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন "আমি পারি না। অসম্ভব।"

তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি নালিশ করতে চাও?"

আমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল কিন্তু বললাম, "না, তাড়াতাড়ি আমাকে সারিয়ে দিন—"

তাঁরা আমাকে আর একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলেন এবং ডাক্তার আমার পিঠ থেকে চিমটে দিয়ে কাঠিগুলো তুলে ফেলতে ফেলতে বললেন, "ওরা তোমার চামড়াখানাকে সুন্দর সাজিয়েছে, বন্ধু; এখন তুমি বর্ষাতি হয়ে উঠবে"—

আমাকে নির্দয়ভাবে খোঁচানো শেষ করে তিনি বললেন, "মনে রেখো বন্ধু, বিয়াল্লিশটি কাঠি বারকরা হল। এটা বড়াই করবার মতো। কাল ঠিক এই সময় আসবে। ধুয়ে বেঁধে দেওয়া হবে তখন। ওরা তোমাকে প্রায়ই মারধোর করে?"

ক্ষণিক চিন্তা করে বললাম, "আগে যত মারতো এখন তত ঘন ঘন মারে না।"

ডাক্তার হাসিতে ফেটে পড়লেন। "ভাল বন্ধু ভাল।"

তিনি আমাকে মনিবমশাইয়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ওকে মেরামত করে দেওয়া হল। আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কাল ওকে নিশ্চয়ই আনবেন। আপনাকে অভিনন্দন—ছেলেটি বড় মজার!"

যখন দুজনে গাড়িতে চলেছি, মনিবমশাই বললেন, "আমাকেও মারতো, পিয়েশকভ? বাবা, সকলে আমাকেও মারতো। তোমাকে অনুকম্পা দেখাবার আমি আছি—আমার

কেউ ছিল না, কেউ না। সর্বত্রই লোকে বড় কঠোর প্রকৃতির—কিন্তু কেউ তাদের কাছ থেকে দয়া পায় না, কেউ না।”

তিনি সারা পথ অসন্তোষ প্রকাশ করতে করতে চললেন। তাঁর জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হল এবং আমার প্রতি মানুষের মতো আচরণ করায় তাঁর ওপর আমি কৃতজ্ঞ হলাম।

যেন সেটা আমার নামকরণের দিন এম্নিভাবে সকলে বাড়িতে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। ডাক্তার আমাকে কিভাবে চিকিৎসা করেছেন, কি বলেছেন সবিস্তারে শোনাবার জন্য মেয়েরা জেদ করতে লাগলেন। তাঁরা শুনলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, ভ্রূকুঞ্চিত করে আমাকে চুম্বন করলেন। রোগে ও দুঃখে এই প্রগাঢ় মনোযোগ এবং সকল প্রকার অপ্রীতিকরতা আমাকে বড় বিস্মিত করে তুলতো।

দেখলাম তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ করিনি বলে তাঁরা খুশি হয়েছিন, আমিও তার সুযোগ গ্রহণ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, দর্জির স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু বই এনে পড়তে পারি কি না। আমার কথায় অসম্মত হবার মতো মন তাঁদের তখন ছিল না, কেবল বৃদ্ধা বিস্ময়ে বলে উঠলেন, “কি ডাকাত ছেলে!”

আমি আবার দর্জির স্ত্রীর কাছ থেকে নানা রকমের বই এনে পড়তে লাগলাম।

লোকের মুখে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কাহিনী শুনতে শুনতে ক্ষুণ্ণ ও রুক্ষ হতাম। জানতাম, সে সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবুও লোকে বলতো।...

বসন্তকালে তিনি হঠাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন, কয়েক দিন পরে তাঁর স্বামীও উঠে গেলেন নূতন বাড়িতে।

তাদের শূন্য ঘরখানিতে দাঁড়িয়ে আমর অন্তর বিষাদে ভরে গেল। মনে হতে লাগলো, দর্জির স্ত্রীটির যদি একবার দেখা পেতাম তাহলে তাঁকে বলতাম, তাঁর জন্য আমার অন্তরে কত কৃতজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে!

দর্জির স্ত্রীটি চলে যাবার আগেই আমার মনিবেরা যে ফ্ল্যাটে থাকতেন সেই ফ্ল্যাটে এসে ছিলেন এক মহিলা—পরমা সুন্দরী, উদ্ধত ও গরবিনী। তিনি সকলের দিকেই মাথা উঁচু করে, স্থির দৃষ্টিতে তাকাতেন। তাতে মনে হত প্রত্যেকেই যেন তাঁর কাছ থেকে আছে অনেক দূরে, তিনি তাদের প্রায় দেখতেই পাচ্ছেন না। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর বৃদ্ধা মাতা ও শিশুকন্যাটি। বৃদ্ধা অবিরাম সিগারেট খেতেন। মহিলাটির শিশুকন্যাটি ছিল বছর পাঁচেকের, নধরকান্তি। তার মাথাটি ছিল কোঁকড়া চুলে ভরা। সেও ছিল তার মায়ের মতো সুন্দর।

তাঁদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ও কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়ে ছিল। এই মহিলাটিকে নিয়ে লোকের জল্পনা-কল্পনা ও কুৎসা রটনার অন্ত ছিল না। আমি তাঁর কাছ থেকেও বই এনে পড়তাম। তিনি আমাকে কবিতার বইও দিতেন। আমাকে শিক্ষিত করবার আগ্রহ তাঁর অন্তরে এক সময়ে জেগে উঠে ছিল।

এদিকে বাড়িতে আমার কাজের ভারও বাড়ছিল। আমি একাধারে ছিলাম, পরিচারিকা, ভৃত্য, বাজার-সরকার

ও সংবাদ-বাহক। সেই সঙ্গে বাড়লো, মনিবমশাইয়ের নক্সা নকল করা, হিসাব-পত্র পরীক্ষা করা, কাঠের ফ্রেমে বা তক্তায় নক্সাগুলো পেরেক দিয়ে এঁটে ঠিক মতো বসানো। এর ওপর মাঝে মাঝে ইনসপেক্টার ইয়ারমারকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে যেতে হত ঘুষ। কাজেই আমার এক মুহূর্তও সময় ছিল না। তবুও তাঁর কাছ থেকে নানা রকমের বই সংগ্রহ করে পড়তাম।

একবার আমার চোখ দুটো এমন ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে গেল যে সকলেরই ভয় হল আমি অন্ধ হয়ে যাবো। আমি নিজেও শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তাঁরা আমাকে বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক গেনরিক রোদজেভিচের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর চিকিৎসায় আমি নিরাময় হয়ে উঠলাম।

সেই সময় এল এক উৎসব। চারধারেই আনন্দ। মহিলাটির সহিস ছিল একজন প্রাক্তন সৈনিক। তার নাম ছিল তুফাইয়েফ্। সে, সিদোরোভ, এরমোখিন ভদকা খেয়ে মাতাল হয়ে উঠলো। সন্ধ্যার দিকে এরমোখিন সিদোরোভের মাথায় একটা কাঠের খেটো দিয়ে মারতেই সে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। এরমোখিন ভয়ে সেখান থেকে দিল ছুট।

চারধারে গুজব রটে গেল যে, সিদোরোভ খুন হয়েছে।

লোকে এসে সিঁড়ির ওপর ভিড় করে দাঁড়িয়ে দরজায় সৈনিকটির শায়িত দেহটির দিকে সভয়ে তাকাতে লাগালো। তারা কানাকানি করতে লাগলো, পুলিশে 'খবর দেওয়া

উচিত্। কিন্তু কেউ গিয়ে পুলিশকে ডেকে আনলো না, কাউকে দিয়ে সৈন্যটিকে পরীক্ষা করানো গেল না।

তখন সেখানে এল ধোপানী নাতালিয়া কোজ-লোভস্কি। তার পরনে নূতন নীল ফ্রক, গলায় সাদা রুমাল। সে লোকগুলোকে রাগের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরজায় গিয়ে সেখানে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, "আহাম্মকের দল! এ বেঁচে আছে! আমায় খানিকটা জল দাও—"

সকলে আপত্তি করতে লাগলো। "যা তোমার কাজ নয় তাতে মাথা গলিও না।"

যেন আগুন লেগেছে, সে এম্নি ভাবে বলে উঠলো, "জল। জল এনে দাও।" সে নূতন ফ্রকটা হাঁটুর ওপর তুলে গলার স্কারটা ছড়িয়ে সৈন্যটির রক্তাক্ত মাথাটি তার হাঁটুর ওপর রাখলো।

তৎক্ষণাৎ ভিড় ভেঙে গেল। সভয়ে আপত্তি জানিয়ে তারা সরে পড়লো। দরজার ম্লান আলোয় দেখলাম, তারা সাদা মুখখানিতে সজল চোখ দুটি রাগে জ্বলছে। আমি তাকে এক কলসী জল এনে দিলাম। সে আমাকে সিদোরোভের মাথায় ও বুকে জল ঢালতে বললে; এবং আমাকে সতর্ক করে দিলে, "আমার গায়ে জল ফেলো না, আমি জন কতক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

সৈন্যটির চেতনা ফিরে এল। সে নিষ্প্রভ চোখ দুটি খুলে কাতর ধ্বনি করে উঠলো।

নাতালিয়া তার দু কুক্ষিতে হাত দিয়ে হাত দুখানা

লম্বা করে পাছে তার ফ্রকটা নোংরা হয়ে যায়, বললে, "তোল।"

আমরা সৈন্যটিকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানার ওপর শুইয়ে দিলাম। নাতাসিয়া একখানা কাপড় দিয়ে যাবার সময় বললে, "জলে কাপড়টা ভিজিয়ে ওর মাথায় চেপে ধর। আমি সেই আহাম্মকটাকে খুঁজে আনি। মদ খেয়ে জেলে না গেলে ওরা খুশি হবে না দেখছি।"

সে পেটিকোটটা পা দিয়ে গলিয়ে মেঝেয় নামিয়ে এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোঁকড়ানো ফ্রকটা সযত্নে সমান করতে করতে বেরিয়ে গেল।

সিদোরোভ সোজা হয়ে শুলে। তার মাথা থেকে আমার খালি পায়ের ওপর পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা গরম রক্ত।

সব কথা তার মনে পড়তে লাগলো; সে বললে, "আমার কি হয়েছিল? আমি পড়ে গিয়ে ছিলাম কি?" সে কাঁদতে শুরু করলে।

সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। আবার বিছানায় পড়ে গিয়ে চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে ঘোরাতে লাগলো।

"ওরা আমাকে একেবারে খুন করে ফেলেচে—"

কথাটা আমার কাছে মজার লাগলো।

সে আমার দিকে নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে বললে, "এই তুই হাসছিস যে? হাসবার কি আছে? আমাকে একেবারে খুন করে ফেলেছে—"

সে আমাকে দু হাতে মারতে আরম্ভ করলে।

—"দূর হ নেকড়ে!"

বললাম, "আহাম্মকি করো না।"

সে হঠাৎ অসম্ভব রকমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে হুঙ্কার দিয়ে, পা ঠুকে বললে, "আমাকে খুন করে ফেলেছে আর তুই—"

তার মোটা, নোংরা হাত দিয়ে সে আমার চোখে মারলো। আমি চীৎকার করে অন্ধের মতো ছুটলাম চত্বরে। সেখানে দেখা হল নাতালিয়ার সঙ্গে। সে এরমোখিনের হাত ধরে আনছিল আর বলছিল, "নেকড়ে! এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে পারো।"

আমি জল দিয়ে আমার চোখ দুটো ধুয়ে দরজার ফাঁকে দেখলাম, সৈন্য দুজন পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে ও কাঁদছে। তারপর তারা দুজনেই নাতালিয়াকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করলে কিন্তু সে তাদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে বললে, "এই কুকুরগুলো, তোদের থাবা সরা। আমাকে কি মনে করেছিস্? পথচারিণী! শুয়ে এখনই ঘুমো। নাহলে তোদের মনিবেরা এসে গোলমাল বাধাবে।"

যেন ছোট ছেলে এম্নিভাবে সে তাদের দুজনকে শুইয়ে দিলে। একজনকে শোয়ালে মেঝেতে, আর একজনকে শোয়ালে বিছানায়। যখন তাদের নাক ডাকতে লাগলো সে বেরিয়ে এল বারান্দায়!

"সব গোলমাল হয়ে গেল! একজনকে দেখতে যাবো বলে কাপড়-চোপড় পরে ছিলাম, ও তোমাকে মেরে ছিল?

কি আহাম্মক! ভদকাতে এই দশা হয়। মদ খেওনা খোকা, কখন মদ খেয়ো না—"

তারপর আমি তার সঙ্গে ফটকে একখানা বেঞ্চিতে বসে জিজ্ঞেস করলাম, মাতালকে তার ভয় করে না কেন?

তার বলিষ্ঠ লাল মুষ্টিটা আমাকে দেখিয়ে বললে, "ঠাণ্ডা-মেজাজের লোকদেরও আমি ভয় করি না। তারা আমার কাছে যদি আসে তাহলে এই পায়। আমার মৃত স্বামীও খুব মদ খেত। একবার সে যখন মাতাল হয়েছিল আমি তার হাত-পা বেঁধে ছিলাম। তারপর সে ঘুমিয়ে নেশা কাটালে তার পাজামা খুলে নিয়ে তার স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে বেত পেটা করি। তাকে বলি মদ খেও না। তোমার ভোগের সামগ্রী হওয়া উচিত তোমার স্ত্রী, ভদকা নয়। তার পর থেকে সে আমার হাতে হয়ে ছিল মোমের মতো।"

মনে পড়ে গেল নারী ইভকে। সে স্বয়ং ভগবানকেও প্রতারিত করেছিল। বললাম, "তুমি শক্তিমতী।"

নাতালিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "পুরুষের চেয়ে নারীর শরীরে শক্তির দরকার বেশি। তার গায়ে দুজনের মতো শক্তির দরকার। ভগবান তাকে তা দিয়েছেন। পুরুষ হচ্ছে অস্থায়ী।"

সে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে তার স্থূল বৃহৎ বক্ষে হাত দুখানি রেখে নর্দমাভরা জঞ্জালগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত, বিদ্বেষবিহীন কণ্ঠে কথাগুলি বলছিল। তার কথা শুনতে শুনতে আমি সময়ের জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম,

হঠাৎ দেখলাম আমার মনিবমশাই ও তাঁর স্ত্রী পাশাপাশি আসছেন।

আমি তাঁদের দরজা খুলে দিতে সদর দরজায় ছুটে গেলাম। মনিবানী সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বিষকণ্ঠে বললেন, "তুমি ওই ধোপানীটার সঙ্গে প্রেম করছো? ও রকম নিম্নস্তরের স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেম করতে শিখছো?"

কথাগুলো এমন আহাম্মকের মতো যে আমার একটুও বিরক্তিবোধ হল না, কিন্তু আমার মনিবমশাই যখন হেসে বললেন, "আর কি আশা করতে পার? সময় হয়েছে!" তখন আমি ক্ষুণ্ণ হলাম।

পরদিন সকালে ছাপ্পড়ে কাঠ আনতে গিয়ে দেখলাম, একটা খালি পারস্ পড়ে আছে। সেটা সিদোরোভের হাতে অনেক বার দেখেছি বলে তার কাছে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেলাম। সে থলিটা আঙুল দিয়ে টিপে বললে, "টাকাগুলো কোথায় গেছে? ত্রিশ রুবল ছিল। দাও।"

ঠিক তখনই এরমোখিন এল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "এটা ওর কাজ। ও চুরি করেছে। ওর মনিবের কাছে ওকে নিয়ে চল। কোন সৈন্য কোন সৈন্যের জিনিস চুরি করে না।"

এই কথায় আমার মনে হল, টাকাগুলো সে নিজে চুরি করে থলিটা আমাদের ছাপ্পড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি তার মুখের ওপরেই বললাম, "মিথ্যাবাদী! তুমি চুরি করেছো!"

সে বললে, "প্রমাণ কর।"

কিন্তু কি করে প্রমাণ করবো ? সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো ; সিদোরোভ চললো আমাদের সঙ্গে। জন কতক জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখতে লাগলো।

মনে পড়ে তারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমার মনিবেরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের কথা শুনছেন আর ঘাড় নাড়ছেন। মনিবানী বললেন, "নিশ্চয়ই ও নিয়েছে ! কাল সন্ধ্যাবেলা ও ফটকে বসে ধোপানীর সঙ্গে প্রেম করছিল। তার জন্যে ওর টাকার দরকার। টাকা ছাড়া ধোপানীটার কাছ থেকে কেউ কিছু আদায় করতে পারে না—"

রাগে আমার পা কাঁপতে লাগলো। আমি তাঁকে গালাগাল দিতে লাগলাম। তার জন্য খেলাম প্রচুর মার।...

সৌভাগ্যবশত সৈন্যেরা খবরটা সারা চত্বরে ও রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় চিলে-কোঠায় শুয়ে থাকতে থাকতে, নিচে নাতালিয়ার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, "না, কেন চুপ করবো ? দূর হও। না গেলে তোমার বাবুকে গিয়ে বলবো। তখন দেখবে—"

বুঝলাম, গোলমালটা হচ্ছে আমার জন্য। সে আমাদেরই সিঁড়ির কাছে চীৎকার করছিল। বলছিল, "কাল কত টাকা আমাকে দেখিয়েছিলে ? টাকাগুলো কোথায় পেয়েছিলে ? বল সকলকে—"

দম বন্ধ করে শুনতে লাগলাম সিদোরোভ এরমোখিনকে টেনে টেনে বলছে "অ্যাঁ—অ্যাঁ—এরমোখিন—"

—"আর এর জন্যে দোষী হল ওই ছেলেটা? মার খেল সে, অঁ্যা?"

এ কথায় নিচে ছুটে গিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে কৃতজ্ঞতায় ধোপানীকে চুমো খেতে ইচ্ছা হল। কিন্তু তখনই জানলা থেকে আমার মনিবানী বলে উঠলেন, "ছেলেটা মার খেয়েছে ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল বলে; তুমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করেনি যে ও চোর, নোওরা মাগী!"

—"নোওরা তুই! তুই একটা গরুর চেয়ে ভাল নস্।"

যেন গান হচ্ছে আমি এম্নি ভাবে এই কলহ শুনতে লাগলাম। নাতালিয়ার প্রতি আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

তারপর ধীরে ধীরে মনিবমশাই এলেন চিলেকোঠায়; আমার কাছে একটা প্রস্থত কড়িকাঠের ওপর বসে বললেন, "পিয়েশকফ ভাই, তাহলে ব্যাপারটার সঙ্গে তোমার কোনই যোগ ছিল না?"

আমি কিছু না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তিনি বলে চললেন, "তাহলেও তোমার কথাগুলো ছিল বিশ্রী—"

আমি শান্তভাবে বললাম, "আমি উঠে দাঁড়াতে পারলেই চলে যাব—"

তিনি নীরবে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। এবং তার এক প্রান্তে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিম্ন স্বরে বললেন, "তাতে কি? সে তোমার ব্যাপার! তুমি আর ছোট ছেলেটি নও। তোমার যা ভাল তা করো।"

তিনি চলে গেলেন। যেমন হয় তাঁর জন্য আমার দুঃখ হল।

এই ঘটনার চার দিন পরে আমি সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম।

(নয়)

আবার "পারম" নামে একখানি জাহাজে কাজ নিলাম। এই জাহাজখানি ছিল রাজহাঁসের মতো সাদা, প্রশস্ত ও দ্রুতগামী। এবার হলাম রসুইখানার লোক। আমার মাইনে হল মাসে সাত রুবল। কাজহল বাবুর্চিকে সাহায্য করা।...

রসুইখানার কর্তা ছিল একজন বেশি মাহিনার বাবুর্চি, আইভান আইভানোভিচ। লোকটি ছিল মোটা-সোটা আর খুব বাবু। সে সারাদিন তার গোঁফজোড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।

জাহাজে সব চেয়ে মজার লোক ছিল ইনজিন ঘরের খালাশি ইয়াকভ শুমোভ। সে তাসের জুয়াখেলায় ছিল ওস্তাদ। তার লোভ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হত। সে ক্ষুধিত কুকুরের মতো সর্বদা রান্নাঘরের কাছে মাংস ও হাড়ের জন্য ঘুরে বেড়াতো। সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে সে নিজের জীবনের চমকপ্রদ কাহিনীগুলো বলতো। যৌবনে সে রিয়াজানে রাখালের সহকারী ছিল। তখন একদিন এক সন্ন্যাসী সেখান দিয়ে যাবার পথে তাকে ভুলিয়ে এক মঠে নিয়ে যায়। সেখানে চার বছর সে ছিল।

সে একদিন বললে, "আমার সন্ন্যাসী হওয়া উচিত ছিল। হতামও তাই যদি না পেনজা থেকে আমাদের মঠে

এক তীর্থযাত্রীনী আসতো। স্ত্রীলোকটি ছিল খুব আমুদে। সে আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। সে আমাকে বলে 'তুমি চমৎকার লোক। তোমার শরীরটি বেশ মজবুৎ। আর আমি হচ্ছি ভদ্র বিধবা। একা থাকি। আমার কর্মচারী হয়ে চল। আমার নিজের বাড়ি আছে। আমি পশম আর পালকের ব্যাবসা করি।' কাজটা আমার পছন্দ হল। গেলাম তার সঙ্গে। হলাম তার প্রণয়ী। তন্দুরের মধ্যে গরম রুটির মতো তার সঙ্গে রইলাম তিন বছর।"

একজন বাধা দিয়ে বললে, "মিছে কথা বলছো। মিছে কথায় যদি টাকা রোজগার হয় তা হলে তোমার দাম হবে হাজার হাজার টাকা।"

ইয়াকভ বলে চললো, "সে ছিল আমার চেয়ে বড়। তাকে আর ভাল লাগছিল না। কাজেই তাকে ছাড়তেই হল। তাই তার বোনঝিকে ধরলাম। সে টের পেয়ে আমাকে দিল তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে।"

বাবুর্চি বললে, "ঠিক হয়ে ছিল। ওর চেয়ে ভাল আর কিছু আশা করতে পার না।"

গালে একটা চিনির ডেলা পুরে সে বলতে লাগলো, "তখন কি করি? এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক বুড়ো ফেরিওয়ালার সঙ্গে দেখা হল। দুজনে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গেলাম বলকান পাহাড়ে, গেলাম তুরস্কে। গেলাম রুমানিয়ায়, গ্রীসে, অস্ট্রিয়ার নানা অঞ্চলে—পৃথিবীর সব জাতির দেশে বেড়ালাম দুজনে। যেখানেই খরিদদার

আছে মনে হল সেখানেই গিয়ে আমাদের মালপত্র বেচলাম।”

বাবুর্চি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে, “আর সব চুরি করলে ?”

—“সেই বুড়ো—না, না—সে আমাকে বললে, ‘এই বিদেশে সৎভাবে কাজ-কর্ম করবে। কারণ এখানকার লোকেরা বড় কড়া। সামান্য ব্যাপারেই মাথা কেটে ফেলে।’ সত্য কথাতে কি আমি চুরির চেষ্টা করে ছিলাম, কিন্তু তার ফল সুখের হয় নি।”

সে বলতো, “সব মানুষই একই ওক গাছের ফল।”

এই লোকটি আমাকে আকৃষ্ট করে ছিল। তার দিকে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। হাঁ করে তার কথা শুনতাম। মনে হত, লোকটির জীবন-সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে। সে সকলকেই বলতে ‘তুই’ এবং সকলের দিকেই এমন ভাবে তাকাতো যেন তারা তার সমপদস্থ।

তাকে আমি কখন ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি, মনেও পড়ে না, সে কখন বেশিক্ষণ চুপ করে থেকেছে। সে বহু জায়গা ঘুরে ছিল, আর যে-সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তাদেরই সঙ্গে ব্যাভিচার করেছিল। সে সকলের কথাই বলতো, কিন্তু তাতে কোন বিদ্বেষ ছিল না, যেন জীবনে সে কখন তিরস্কৃত হয় নি বা কারো কাছ থেকে আঘাত পায় নি।...”

কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল সে অলস, কিন্তু আমার বোধ হত সেই নারকীয় শ্বাসরুদ্ধকর, উৎকট গন্ধময় উত্তাপে আর সকলের মতোই সে স্বকর্তব্য পালন করতো। মনে পড়ে

না, অন্য ইনজিন খালাশিদের মতো সে কখন ক্লান্তি বা উত্তাপের অনুযোগ করেছে।

একদিন কে যেন এক বৃদ্ধা যাত্রীর টাকাশুদ্ধ থলি চুরি করে। তখন সন্ধ্যা। আবহাওয়া খুব পরিষ্কার, শান্ত। সকলেই বেশ খুশি। ক্যাপটেন বৃদ্ধাকে পাঁচটি রুবল দান করলেন, যাত্রীরাও নিজেদের মধ্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করে তাকে দিতেই সে বললে, "বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে তিন গ্রিভেন বেশি দিয়েছ।"

কে যেন আনন্দে বলে উঠলো, "যা তোমার চোখে পড়ে তাই নাও বাছা। বাজে কথা বলছো কেন?"

কিন্তু ইয়াকভ তার কাছে গিয়ে বললে, "তোমার যা দরকার নেই আমায় তা দাও। আমি তা দিয়ে তাস খেলবো।"

চারধারের লোকেরা হেসে উঠলো। মনে করলে খালাশিটা বুঝি রঙ্গ করছে। কিন্তু সে সমানে বলে চললো, "আমাকে বেশিটা দাও, বাছা। তোমার টাকার কি দরকার? কালই তুমি যাবে গোরে।"

সকলে তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু সে মাথা ঝাঁকিয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ে আমাকে বললে, "লোকগুলো কি মজার! যে ব্যাপার ওদের নয়, তাতে ওরা মাথা গলায় কেন? বুড়ী তো নিজেই বলছে, তার যা দরকার তার চেয়ে পেয়েছে বেশি। তিন গ্রিভেন পেলে আমার মনটা শান্ত হত।"

টাকা দেখলেই সে খুশি হয়ে উঠতো।...কখন কখন মনে হত সে নির্বোধ, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই মনে করতাম,

সে ইচ্ছা করেই বোকা সাজছে। তাকে আমি একবার তার যৌবনের ও পর্যটনের কথা সোজা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু যা আশা করেছিলাম, তার ফল তা হয় নি। সে বলেছিল, "সব জায়গার লোকই পিঁপড়ের মতো সরল। যেখানেই লোক, সেখানেই গোলমাল। পৃথিবীতে চাষীর সংখ্যাই বেশি। শরতের পাতার মতো সারা পৃথিবীতে চাষী ছড়ানো। আমি বুলগার, গ্রীকও দেখেছি।··· গ্রীকরা আমাদের ভাষা বলতে পারে না। তাদের মনে যা আসে তাই তারা বিড় বিড় করে বলে। সেগুলো শব্দের মতো শোনায়। কিন্তু তারা যা বলে বা যে বিষয়ে বলে তা বোঝা অসম্ভব। তাদের সঙ্গে আঙুলের ইসারা করে কথা বলতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গী সেই বুড়োটা এমন ভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতো যে গ্রীকরাও তা বুঝতে পারতো। সে বিড় বিড় করতো, আর তারা বুঝতে পারতো সে কি বলতে যায়।··· গ্রীক আর তুর্কীরা এক জাত।'

মনে হত, সে যা জানে সে সম্বন্ধে সব কথা আমার কাছে বলছে না. এমন কিছু আছে যা সে বলতে চায় না। পত্রিকার ছবি থেকে জানতাম যে, গ্রীসের রাজধানী হচ্ছে এথেনস্ একটি প্রাচীন ও সুন্দর শহর। কিন্তু ইয়াকভ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "তোমাকে ওরা মিছে কথা বলেছে বন্ধু। এথেনস্ নামে কোন শহরই নেই, কিন্তু অ্যাথন নামে একটি জায়গা আছে। তবে সেটা শহর নয়, একটা পাহাড়। তার ওপর আছে একটা মঠ, ব্যস।··· তাদের শহরগুলো বিশেষ কিছু নয়, তবে গ্রামগুলোর কথা আলাদা। তাদের- মেয়েরাও—তাঁরা এমন

খাশা যে মরতে ইচ্ছা হয়। একজনের জন্যে আমি তো সেখানে রয়েই গিয়েছিলাম। কি যেন তার নাম।"

কপালে চ বুলাতে লাগলো। দাকের কি

ভুল হয় দেখ। অথচ আমরা দুজনে—সে যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন কেঁদেছিল, আমিও কেঁদেছিলাম।"

ইয়াকভের গল্পগুলো শ্লীলতাবর্জিত হলেও কিন্তু নক্কারজনক ছিল না। কারণ সেগুলোর মধ্যে দাম্ভিকতা ও কঠোরতা ছিল না, ছিল কৌশলের অভাব ও বেদনার আভাস।

সে বললে, "তারপর আমরা পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিই।"

আমরা দুজনে তখন ডেকে বসে ছিলাম, তপ্ত জ্যোৎস্না আমাদের দিকে যেন সাঁতরে এগিয়ে আসছিল। নদীর রুপালি জলধারাপারে প্রান্তরভূমিকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।...

আকাশের চাঁদকে তখন লাগছিল নিলজ্জভাবে নগ্ন, আমার অন্তরকেও সে সেই দিকে চঞ্চল করে জানি না কিসের জন্য ব্যথিত করে তুললো। মনে পড়ে গেল, যা কেবল কল্যাণের তাকে, মনে পড়লো—

"শুধু, সঙ্গীত সুষমা মাগে, সুষমার সঙ্গীতে নাহি প্রয়োজন।"

ইয়াকভ একদিন এক নপুংসকের সঙ্গে তাদের মঠে চলে যায়। *

* সে সময়ে রুষদেশে স্বেচ্ছ ক্লীবসম্প্রদায় ছিল। তারা জায়গায় জায়গায় মঠ বা উপনিবেশ গঠন করে বাস করতো এবং যৌনব্যাপারে কঠোর সংযম পালন করতো। সংযমে কারো শৈথিল্য দেখা গেলে তাকে ক্লীব করে ফেলা হত। অনুবাদক।

অবশ্য সে গিয়েছিল টাকার লোভে। নপুংসকটি ভবিষ্যতের একখানি মোহনচিত্র এঁকে তাকে মুগ্ধ করে।

সে চলে গেলে আমি ক্ষুণ্ণ, বিমূঢ় হয়ে ছিলাম।

শরতের শেষাশেষি স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে আমি যাই একজন বিগ্রহের রঙ-মিস্ত্রির কারখানায় কাজ শিখতে।

কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই আমার মনিবের বৃদ্ধা স্ত্রী, তিনি ছিলেন মদখোর, আমাকে বলেন, "এখন বেলা ছোট, রাত বড়। তাই তোমাকে সকালে দোকানে গিয়ে ছোকরার কাজ করতে হবে। রাতের বেলা তুমি কাজ শিখবে।"

তারপরই আমাকে তাঁদের দোকানে নিযুক্ত করেন। দোকানদারটি ছিল অল্পবয়স্ক ও চটপটে। তার চেহারাটি ছিল সুন্দর কিন্তু মুখখানা ছিল নকল। রোজ ভোরে উঠে স্তিমিতালোকে, ঠাণ্ডায় আমি তার সঙ্গে দোকানে যেতাম। একটা গোদামঘরের এক অংশকে দোকান-ঘরে পরিণত করা হয়েছিল। তার ভেতরটা ছিল অন্ধকার, নানা আকারের বিগ্রহে, বিগ্রহের বাক্সে ও সুন্দর বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। আমাদের দোকানখানির পাশে ছিল আর একখানি বিগ্রহের দোকান। দোকানখানার মালিকের মুখে ছিল কালো লম্বা দাড়ি। তার আত্মীয় ছিল একজন প্রাচীন-পন্থী বিগ্রহ-কলা সমঝদার। সে বিগ্রহের মূল্যাদি নিরূপণ করতো। ভলগার ওপারে বহুদূর পর্যন্ত ছিল তার খ্যাতি। দোকানের মালিকের ছেলেটি তাকে সাহায্য করতো। তার মুখখানা ছিল বুড়োর, চোখ দুটো ছিল ইঁদুরের মতো।

দোকান খুলে আমাকে যেতে হত সরাইয়ে গরম জল

আনতে। প্রাতরাশ শেষ হলে আমাকে দোকান গোছাতে, ঝাড়তে ও ঝাঁট দিতে হত। কাজগুলো শেষ হলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খরিদদারের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত যাতে তারা পাশের দোকানে না ঢোকে।

দোকানদারটি আমাকে একদিন জোরের সঙ্গে বললে, "খরিদদাররা হচ্ছে আহাম্মক। সস্তায় পেলে কোথা থেকে যে কিনছে সে দিকে তাদের নজরই থাকে না। তারা জিনিসেরও আসল দাম জানে না।"

একটা বিগ্রহের গায়ে মৃদু আঘাত করতে করতে সে আমার কাছে তার ব্যবসায় অভিজ্ঞতা জাহির করতে লাগলো··· "তুমি ঋষিদের বিষয় কিছু জানো? মনে রেখো, বোনিফেস হচ্ছেন মদের প্রতিষেধক; ভারভারা, বিখ্যাত শহীদ, হচ্ছেন দন্তশূল আর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর, ভাসিলি হচ্ছেন জ্বরের।···"

বিগ্রহগুলোর আকার ও তাদের গায়ে কারুকার্যের অনুপাতে তাদের দামগুলো শীঘ্রই আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু ঋষিদের প্রত্যেকের গুণাগুণ মনে রাখা হল কঠিন।

আমি যখন দোকানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নেবিভোর হয়ে থাকতাম, তখন দোকানদারটি কখন কখন আমার জ্ঞান-পরীক্ষা করতো।

"প্রসবের সময় কষ্ট হলে কে আরাম করেন!"

আমি ভুল উত্তর দিলে সে বলতো, "তোমার মাথা থাকবার দরকার কি?"

আমার পক্ষে তার চেয়েও কষ্টকর ছিল খরিদদার ধরা।

বিকট ভাবে চিত্রিত বিগ্রহগুলো আমার আদৌ ভাল লাগতো না ; সেগুলো বেচতেও আমার ইচ্ছা হত না।

হাটের দিন বাজার গরম থাকতো। চাষী, স্ত্রীলোক, কখন কখন সমগ্র পরিবার বিগ্রহ কিনতে আসতো। কোন কোন খরিদদারের গায়ের চারধারে ঘুরতে ঘুরতে গুনগুন করে আওড়াতাম, “হুজুর, আপনার কি কাজ করতে পারি? আমাদের কাছে আছে সটীক স্তোত্রাবলী, স্তবের বই, গানের বই, মন্ত্র-পুঁথি। দয়া করে এসে দেখুন। সব রকমের বিগ্রহ, যে রকমেরই চান, হরেকরকম দামের, সবচেয়ে ভাল, গাঢ় রং। যদি চান আমরা সবরকম ঋষি আর মাতৃমূর্তির ফরমাজ নিয়ে থাকি। হয়তো নামকরণের দিনের জন্য বা আপনার পরিবারের জন্য কিছু চান? সারা রাশিয়ার মধ্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল দোকান। শহরের সবচেয়ে ভাল মাল-পত্র আছে এখানে।”

সেই অনমনীয় ও কঠোর ক্রেতাটি বহুক্ষণ আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কাঠের টুকরোর মতো আমাকে এক হাতে ঠেলে সরিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে ঢুকতো আর আমাদের দোকানদারটি তার বড় বড় কান দুটো রগড়ে বলে উঠতো, খদ্দেরটাকে ছেড়ে দিলে! তুমি খাশা দোকানী!”

আর, পাশের দোকান থেকে শোনা যেত একটি কোমল মধুর কণ্ঠ বক্তৃতা বর্ষণ করছে আর তাতে কাজ হচ্ছে আফিমের।

"আমরা ভেড়ার চামড়া বা বুটজুতো বেচিনা বন্ধু, সেই ভগবানের আশীর্বাদ, যার দাম সোনা-রুপার চেয়ে বেশি—"

আর আমাদের দোকানটি হিংসায় ও রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে বলতো, "শয়তান। চাষীটার চোখে ছানি পড়ুক। তোমাকে শিখতে হবে, শিখতেই হবে!"

আমি যথার্থই শিখবার চেষ্টা করতাম। কারণ যে যাই করুক তা ভাল ভাবে করা উচিত। কিন্তু খরিদদারদের ভুলিয়ে আনার কাজে বা দোকানদারিতে আমি সফল হই নি। এই রূঢ়-প্রকৃতির স্বল্পভাষী লোকগুলি, ইঁদুরের মতো দেখতে সেই নিরীহ ও সামান্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগুলি আমার অন্তরে অনুকম্পা জাগাতো। বিগ্রহগুলোর খাঁটি মূল্য কি সে কথা তাদের গোপনে বলতে ইচ্ছা হত।...

সেই সব চাষীদের আমার ভাল লাগতো। তাদের প্রত্যেকের চারপাশে এমন একটা কুহক থাকতো যা আমাকে মনে করিয়ে দিত ইয়াকভের কথা।

নূতন বই চাষীদের পছন্দ হত না। নূতন বইয়ের দিকে তারা সভয়ে তাকিয়ে থাকতো। সেটা যেন একটা পাখি হাত থেকে উড়ে যেতে পারে। তাই সতর্কতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করতো। তা দেখতে আমার বেশ লাগতো। কারণ বই ছিল আমার কাছে অত্যাশ্চর্য সামগ্রী। তাতে বন্দি থাকতো লেখকের মন। বইখানা খুলে আমি সেই অন্তরকে মুক্ত করে দিতাম। সে তখন আমার সঙ্গে গোপন কথা কইতো।

প্রায়ই প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক, প্রাচীন লিপিখোদিত বিগ্রহ ও ক্রুশ, প্রাচীন রুপোর চামচ বেচতে বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুরুষ ফেরিওয়ালারা আসতো। আমাদের দোকানদার ও পাশের দোকানিটি এই সব ফেরিওয়ালাদের ওপর অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতো। প্রাচীন সামগ্রী-গুলো যৎসামান্য বা বড় জোর দশ রুবল দিয়ে কিনে বাজারে ধনী খরিদদারদের কাছে বেচতো শত শত রুবলে। সেই সরল ও অজ্ঞ লোকগুলোকে তারা এমন কৌশলে ঠকাতো যে তা সহ্য করা যেত না। এই কাজে প্রধান সহায় ছিল পিৎর ভাসিলিচ, সেই বিখ্যাত পাকা বুড়ো সমঝদারটি। তার একখানা পা ছিল খোঁড়া, তাই সে লম্বা লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতো। সে ছিল আমাদের মালিকের আত্মীয়। মালিক তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ফেরিওয়ালাদের ঠকাতেন এবং একাজে তার ওপরেই নির্ভর করতেন সম্পূর্ণ। তার বুদ্ধিরও খুব তারিফ করতেন। তবুও বুড়োটাকে আমার মতো উত্তেজিত করতে তাঁরও ইচ্ছা হত!

তিনি বুড়োটার দিকে রুক্ষপ্ত চোখে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠতেন, "তুমি মানুষকে ঠকাও।"

বৃদ্ধ অলস ভাবে হেসে উত্তর দিত, "কেবল ভগবানই ঠকান না। আমরা আহাম্মকদের মধ্যে বাস করি। আহাম্মকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে না ঠকিয়ে কেউ কি থাকতে পারে? তাহলে তাদের দরকার কি?"

দোকানদারটির মেজাজ গরম হয়ে উঠতো। বলতো, "সব চাষীই আহাম্মক নয়। ব্যবসায়ীদের উৎপত্তি চাষীদের মাঝ থেকেই।"

—"আমরা ব্যবসায়ীদের কথা বলছি না। আহাম্মকরা বদমায়েশদের মতো জীবন যাপন করে না। আহাম্মক হচ্ছে ঋষির মতো—তার বুদ্ধি ঘুমোয়।"

শীতকালে ব্যবসাটা হত মন্দা। ব্যবসায়ীদের চোখে সেই সতর্কতা ও লোভের আগুনের আভা গ্রীষ্মকালে যা তাকে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তুলতো, দেখা যেত না। তাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পেত অলসতা। কিন্তু রাগলে তারা হয়ে উঠতো ভীষণ। আমার ধারণ ছিল, এটা তারা করতো ইচ্ছা করে, পরস্পরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে যে তারা বেঁচে আছে।

কখন কখন পিটার ভাসিলিচের সঙ্গে আমি আলোচনা করতাম। সচরাচর সে আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তাতে থাকতো অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ কিন্তু বইয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল বলে সে আমাকে পছন্দও করতো এবং কখন কখন সে আমার সঙ্গে কথাও বলতো আন্তরিকতার সঙ্গে। আমাকে উপদেশও দিত।

আমি বলতাম, "এই সব ব্যবসায়ীরা যে ভাবে জীবন কাটায় আমি তা পছন্দ করি না।"

সে দাড়ির একগাছি চুল লম্বা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলতো, "তারা কি ভাবে জীবন যাপন করে তুমি কি করে জানলে? তুমি তাহলে তাদের বাড়িতে প্রায়ই যাও?

এটা রাস্তা মাত্র, বন্ধু। লোকে রাস্তায় বাস করে না। তারা এখানে বেচা-কেনা করে। যত শিগগির পারে তারা কাজটা চুকিয়ে ফেলে। তারপর আবার বাড়ি ফিরে যায়! লোকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে রাস্তায় চলে। পোশাকের নিচে তারা কেমন তুমি জান না। লোকটা আসলে কি তা দেখা যায় তার বাড়িতে, তার ঘরে, সেখানে সে কি ভাবে থাকে—সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।"

—"হাঁ, কিন্তু তারা এখানেই থাক বা বাড়িতেই থাক তাদের চিন্তা ও ধারণা একই, তাই নয়?"

বৃদ্ধ চোখ দুটো গোল করে পাকিয়ে বললে, "তোমার পাশের বাড়ির লোকটির চিন্তা ও ধারণা কি তুমি জানবে কি করে? চিন্তা হচ্ছে উকুনের মতো। তুমি তা গুণতে পারো না। হতে পারে, একটি লোক বাড়ি গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, চোখের জলের মধ্যে এই বলে প্রার্থনা করে, 'ভগবান আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার একটি দিন নষ্ট করেছি।' হতে পারে, তার বাড়ি তার কাছে মঠের মতো। সে সেখানে নিভৃতে তার ভগবানের সঙ্গে বাস করে। প্রত্যেকটি মাকড়শা তার নিজের জায়গা চেনে, নিজের স্থান চেনে। তার নিজের অবস্থা বোঝে যাতে সে নিজের জায়গা দখল করে থাকতে পারে।"

"তুমি এখন লোকের বিচার করছো, কিন্তু তোমার পক্ষে এটা হচ্ছে ঢের আগে। তোমার বয়সে লোকে বুদ্ধির সাহায্যে বাঁচে না, চোখে দেখে। তোমাকে এখন চোখে দেখতে হবে, মনে করে রাখতে হবে আর মুখ বুজে

থাকতে হবে। মন হচ্ছে ব্যবসার
ধর্মের জন্যে। তোমার পক্ষে বই
জিনিসেই সংযম দরকার অনেকে পড়তে পড়তে পাগল, নাস্তিক হয়ে গেছে।"

আমি তার কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম। দাদামশাইও বলতেন সেই ধরনের গল্প। কিন্তু দাদামশাইয়ের বলবার ভঙ্গি ছিল তার চেয়ে ভাল। তবে দুজনেরই গল্পের অন্তর্নিহিত কথা ছিল, ধনদৌলত মানুষকে ভগবানের ও মানুষের কাছে অপরাধী করে। মানুষের প্রতি তার অনুকম্পা ছিল না কিন্তু সে ভগবানের কথা বলতো আবেগে। বলতে বলতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো, কাঁদতো।

বলতো, "লোকে ভগবানকে ঠকায়। তিনি, প্রভু যীশু খ্রীস্ট, সবই দেখেন আর চোখের জল ফেলেন। 'আমার মানুষ সমাজ, আমার দুঃখী মানুষের দল, তোমাদের জন্য যে নরক তৈরী হচ্ছে!'

আমি একবার তাকে পরিহাসচ্ছলে বলি, "কিন্তু আপনি নিজেই তো চাষীদের ঠকান!"

তাতে সে অসন্তুষ্ট হয় না; বলে, "আমার পক্ষে সেটা কি খুব বড় ব্যাপার? আমি তাদের ঠকাই তিন-চার রুবল মাত্র।"

গির্জার ইতিহাসে তার জ্ঞান ছিল অসাধারণ। আমি তাতে বড় খুশি হতাম। সে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গর্বভরে বলতো, "ওতে আমি একেবারে ঘুণ। মস্কোতে আমি একবার বড় বড় অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করি। তাতে তাঁরা হেরে যান।"

একবার দোকানে বসে একটি লোকের সঙ্গে পিটার ভাসিলিচের তর্ক হয়। লোকটির নাম আলেকজান্দার ভাসিলিয়েভ্। তিনি ছিলেন ভবঘুরে! যখন তর্ক হয় তখন সেখানে দোকানের মালিক লুসিয়ান, দোকানদারটি ও আমি উপস্থিত ছিলাম। তর্কে পিটার ভাসিলিচ পরিশেষে ভঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যায়। লুসিয়ানও তাঁর সামনে বসে থাকতে পারেন না। তিনিও বেরিয়ে যান। আলেকজান্দার তখন দোকান-দারকে বলেন, "ওরা আমার সামনে দাঁড়াতে পারে না। পারেই না। আগুনের মুখে ধোঁয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে যায়।" দোকানদারটিও তার সামনে কেমন যেন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধেরা তাকেও বাইরে থেকে ডেকে নেয়।

এই লোকটি রাতের অন্ধকারে আমার সামনে জ্বলে উঠে-ছিলেন অগ্ন্যুৎসবের মতো। তিনি আমার সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিলেন। এবং যখন নিবে গেলেন তখন আমার অন্তরে এই ভাব রেখে গিয়েছিলেন যে, আর সবায়ের মতো জীবন যাপনে তাঁর অনিচ্ছার মধ্যে কতকটা সত্য আছে।

সন্ধ্যায় সর্দার বিগ্রহের রঙ-মিস্ত্রির কাছে তাঁর কথা উত্তেজনার সঙ্গে বলতে সে আমাকে বললে, "উনি পর্যটক-সম্প্রদায়ের লোক। ওঁরা কারো কর্তৃত্ব মানেন না।"

—"কি ভাবে ওঁরা জীবন যাপন করেন?"

—"পলাতকের মতো ওঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। তাই ওঁদের বলা হয় পর্যটক-সম্প্রদায় (প্রাচীনপন্থীর অন্তর্ভুক্ত)। ওঁরা বলেন, কারো জায়গাজমি বা সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। পুলিশ ওঁদের সাংঘাতিক লোক বলে ধরে।"

আমার জীবনটা তিক্ত ও দুঃখের হলেও বুঝতে পারতাম না সুখের যা তা থেকে লোকে সরে থাকবে কেন? সে সময়ে আমার চারধারে যে জীবনের লীলা চলছিল তার মধ্যে অনেক কিছু আমার কাছে ছিল কৌতূহলোদ্দীপক ও মূল্যবান। তাই আলেকজান্দার ভসিলিয়েভ অল্পকালের মধ্যেই আমার অন্তর থেকে মিলিয়ে গেলেন।

কিন্তু কখন কখন দুঃখের মুহূর্তে অন্ধকারে তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হতেন। তিনি আসতেন মাঠের ওপর দিয়ে বনের ধারে ধূসর পথে মাথায় টুপিটি হেলিয়ে আর বলতেন, "আমি সোজা পথে চলেছি। এ জগতের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। সকল বন্ধন ছিন্ন করেছি।"

তাঁরই সূত্রে মনে পড়তো আমার বাবাকে দিদিমা স্বপ্নে তাঁকে যেমন দেখেছিলেন তেমনই। তাঁর হাতে রয়েছে একখানি ছড়ি, তাঁর পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে আসছে একটা কুকুর। তার গায়ে কালো ছিট ও ছাপ, জিভটা পড়েছে বেরিয়ে।

দশ

বিগ্রহ রঙকরার কারখানাটি ছিল খানিকটা পাথরে তৈরী একখানা বড় বাড়ির দুখানা ঘর। একখানা ঘরে ছিল উঠোনের দিকে একটা জানলা; অপরখানির একটি জানালা ছিল বাগানের, অপর জানালাটি রাস্তার দিকে। এই জানালা দুটো ছিল ছোট ও চৌকো।

তাদের সার্সিগুলো ছিল অনেক কালের, গায়ে নানারঙের দাগ। সেই জন্য শীতের ম্লান আলোক তার মধ্য দিয়ে যেতে পারতো না। দুটো ঘরই ছিল টেবিলে ঠাসা। প্রত্যেক টেবিলের ওপর বসে থাকতো একটি করে রঙকারিগরের আনত মূর্তি, কোন কোনটাতে থাকতো দুজন করে। ছাদ থেকে ঝুলতো জলভরা কাচের গোলক। তার গায়ে আলোক প্রতিফলিত হয়ে বিগ্রহের চৌকো দেহে সাদা হিমরশ্মি ছড়িয়ে দিত।

কারখানাটার মধ্যে ছিল ভাপসা গরম। সেখানে কাজ করতো বিশজন শ্রমিক। সকলেই রঙ মিস্ত্রি। তাদের সকলেরই গায়ে থাকতো কলার খোলা তুলোর লম্বা জামা, পরনে থাকতো টিকিনের পাজামা; পা দুখানি থাকতো খাল্লি বা স্যানডাল পরা। তাদের মাথায় বিছানো থাকতো সস্তা তামাকের ধোঁয়ার নীল চাঁদোয়া। সারা ঘর ভরা থাকতো মাড়, বার্নিশ ও পচাডিমের গাঢ় গন্ধে। আর তার মধ্যে ধীরে বয়ে যেত ধূপের গন্ধের মতো একখানি বিষাদ সঙ্গীত।

সে গানখানি ছাড়াও তারা আরও কয়েকখানি বেদনাভরা গান গাইতো, কিন্তু সেই গানখানিই তারা গাইতো প্রায়ই। সেই গানের সুরে তালে চলতো তাদের হাতে বিগ্রহগুলির গায়ে সূক্ষ্ম তুলি, ফুটে উঠতো ঋষিগণের শীর্ণ মুখে বেদনার সূক্ষ্মরেখাগুলি। জানলার ধারে বসে বৃদ্ধ গোলোভেভ চালাতো তার ছোট হাতুড়িটি। বৃদ্ধ ছিল মাতাল। তার নাকটা ছিল প্রকাণ্ড, নীল। গানের অলস সুরধারায় হাতুড়ির অবিরাম নীরস খট খট শব্দ তাল দিত—যেন একটা পোকা একটি বৃক্ষকে কুরে কুরে কাটচে; যেন কোন দুষমন কাজটিকে একটি দীর্ঘ কর্মধারায় বিভক্ত করছে। তার মধ্যে না আছে সৌন্দর্য, তাতে না জাগায় কাজটির প্রতি ভালবাসা বা আকর্ষণ! প্যামফিল জোড়া দিত। তার একটি চোখ ছিল ট্যারা। তার প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, হিংসুক! সে আনতো নানা আকারের সাইপ্রেস ও লিলাক কাঠের পরিষ্কার করে চাঁছা ও আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া খণ্ডগুলি। ডেভিডভ সেগুলিতে রঙ চড়াতো। সে বয়সে ছিল কিশোর। তার যক্ষা রোগ ছিল। তার সাথী সোরোকিন বিগ্রহগুলির গায়ে লিখতো বাণী। মিলিয়াসন মূল নক্সা দেখে তার গায়ে পেনসিল দিয়ে রেখা এঁকে দিত। বৃদ্ধ গোলোভেভ তার গা সোনার জলে চিত্রিত করতো; সূক্ষ্মকারু-কারিগরেরা আঁকতো নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ও পোশাক-পরিচ্ছদ। তারপর সেগুলো সাজিয়ে রাখতো দেওয়ালের ধারে যারা মুখমণ্ডল চিত্রিত করবে তাদের জন্য।

মুখমণ্ডল চিত্রিত হয়ে গেলে বিগ্রহটিকে দেওয়া হত যে কারিগর তার গায়ে খোদাই চিত্রগুলি ভরতো তাকে।

তারপর তার গায়ে বাণী লিখতো অন্য এক কারিগর। আর বার্নিশ লাগাতো সর্দার কারিগর স্বয়ং। সে মানুষটি ছিল শান্ত ও স্বল্পভাষী।

আমি কারখানায় ঢোকবার কয়েকদিন পারে সাইনবোর্ড কারিগর কোজাক কাপেনডিউখিন একদিন মাতাল হয়ে এল। তার চেহারাটি ছিল সুন্দর, গায়ে ছিল প্রচুর শক্তি। সে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে সবকিছু ভাঙতে শুরু করলো এবং কুঠরির মধ্যে বিড়াল যেমন ইঁদুর তাড়া করে সেও তেম্নি কারিগরদের তাড়া করলে! তারা ভয়ে যে যেখানে পারলে লুকিয়ে পড়লো এবং চীৎকার করে পরস্পরকে বলতে লাগলো, "ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও।"

মুখের রঙ মিস্ত্রি সেই উন্মাদটাকে মাথায় একটা ছোট টুলের আঘাত দিয়ে কাবু করে ফেললে; কোজাকটি মেজেয় পড়ে গেল। তারা তৎক্ষণাৎ তাকে চেপে ধরে তোয়ালে দিয়ে বাঁধতে লাগলো আর সে বন্য পশুর মতো বাঁধনটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগলো। ইভজেন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলো এবং পাঁজরায় হাত দুখানা রেখে তার ওপর লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হল। সে ছিল লম্বা-চওড়া জোয়ান। কোজাকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে নিশ্চয় তার বুকের হাড় ভেঙে যেত। কিন্তু ঠিক তখনই সেই দৃশ্যের মাঝে এসে পড়লো সর্দার কারিগর হাতে টুপি, গায়ে ওভারকোট। সে ইভজেনকে তর্জনী হেলিয়ে শাসিয়ে শান্ত শুষ্ক কণ্ঠে কারিগরদের বললে, "ওকে বারান্দায় নিয়ে যাও। যতক্ষণ না ওর মেজাজ ঠাণ্ডা হয় ওকে সেখানে ফেলে রাখো।"

তারা কারখানা থেকে কোজাকটাকে টানতে টানতে বার করে নিয়ে গেল। তারপর চেয়ার-টেবিলগুলো ঠিক করে আবার কাজ শুরু করলে। কাজ করতে করতে তাদের সাথীটির দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মন্তব্য করতে লাগলো এবং ভবিষ্যৎ বাণী করলে যে, একদিন কলহের সময়ে সে নিশ্চয়ই মারা পড়বে।

সিতানভ অতি শান্তভাবে বললে, "ওকে মেরে ফেলা খুবই কঠিন।" সে এমন ভাবে কথাটি বললে যেন ব্যাপারটা সে জানে খুব ভাল করে।

আমি সর্দার কারিগরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, এই সব বলিষ্ঠ, মুষ্টিযোদ্ধাদের সে এত সহজে কি করে বশে রাখে? সে প্রত্যেককে শেখাতো কি করে কাজ করা উচিত। এমন কি, সবচেয়ে ভাল কারিগরও স্বেচ্ছায় তার কথা মন দিয়ে শুনতো। কোজাকটাকে সে শিখাতো বেশি করে: সে বলতো, "তোমার কাজের বিষয় তুমি একটুও ভাবো না।"

কোজাকটা প্রচুর মদ খাবার ফলে ধরা গলায় উত্তর দিত, "আইভান লারিওনোভিচ, বাবা, এ আমার ব্যবসা নয়। আমার জন্ম হয়েছে গাইয়ে হবার জন্যে। আর লোকে আমাকে এনে রেখেছে সন্ন্যাসীদের মধ্যে।"

—"উৎসাহ থাকলে যে কোন কাজ শেখা যায়।"

—"তুমি কি মনে কর আমাকে? আমার কোচোয়ান হওয়া উচিত ছিল?"

এবং তারপরই সে গলার নলীটা বাড়িয়ে দিয়ে গান

ধরতো। আইভান মৃদু হেসে চোখে চশমাজোড়া ঠিক করে বসিয়ে বেরিয়ে যেত। আর দশবারোটা কণ্ঠ বন্ধুর মতো সেই সুর গলায় নিয়ে গেয়ে উঠতো। আমার মনে জাগতো গায়কের প্রতি ঈর্ষ্যা। আমার অন্তরে বয়ে যেত বেদনাময় আবেগের ধারা। মনে হত আমার বুক যেন ফেটে যাবে। আমার কাঁদতে ও গায়কদের বলতে ইচ্ছা হত, "আমি তোমাদের ভালোবাসি।"...

তারা মাতাল হয়ে কারখানায় নাচতো, গাইতো। আমি দেখতাম, বইয়ে যা পড়েছি তার সঙ্গে সে-সবের একটুও মিল নেই। বইয়ের কথা সম্পূর্ণ পৃথক। তারা কেউই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না। আমি সে সময় কবিতা লিখতাম। আমার এক-খানা মোটা নোটবই কবিতায় ভরা ছিল। সিতানভ আমাকে ভালোবাসতো—এর জন্য আমি কতকটা আমার সেই নোট-বইয়ের কাছে ঋণী। কারিগরেরা ভগবানের নাম করতো লঘুভাবে, পরিহাসের সঙ্গে, যেমন ভাবে তারা বলতো তাদের রক্ষিতাদের কথা। অথচ তারা গির্জায় যেত, প্রার্থনা করতো, খেতে বসে ভগবানকে স্মরণ করতো।

সিতানভ এসব কিছুই করতো না; তাকে সকলে বলতো, নাস্তিক।

সে বলতো, "ভগবান নেই।"

—"তাহলে আমরা এলাম কোথা থেকে?"

—"জানি না।"

আমি যখন তাকে বলতাম কি করে ভগবানের না থাকা সম্ভব, সে বলতো, "দেখছ না ভগবান হচ্ছে উচ্চতা।"

বলে সে মাথার ওপর হাত তুলে দেখাতো। তারপর আবার বলতো, "মানুষ হচ্ছে নিম্নতা! কথাটা কি সত্যি? একথা শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। তেম্নি করেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। গোলোভেভকে দেখতে কিসের মতো?"

এই যুক্তি আমাকে পরাভূত করতো। নোংরা মাতাল বুড়োটা তার বার্ধক্য সত্বেও একটা অকথ্য পাপে আসক্ত-ছিল। মনে পড়লো, সেই ভিয়াৎসকি সৈনিক, এরোমখিনকে আর দিদিমার বোনকে—তাদের মধ্যে ঈশ্বরের সাদৃশ্য কোথায়?

সিতানভ বলতো, "মানুষগুলো হচ্ছে শূয়র।" কথাটা বলেই সে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতো, "তবে কথা হচ্ছে, ভালো লোকও আছে।"

তাকে বেশ সহজে রাগে আনা যেত; সে মানুষটি ছিল বড় সরল। কোন বিষয় যদি সে না জানতো তাহলে খোলাখুলি তা স্বীকার করতো।

"জানি না, একথা কখন ভাবিও নি।"

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ তার সঙ্গে আমার যতদিন না দেখা হয়েছিল ততদিন যারা সবকিছু জানে, সকল বিষয়ে কথা বলে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল কেবল তাদেরই সঙ্গে। তার নোটবইয়ে মর্মস্পর্শী কবিতার পাশে লজ্জা হয় এমন সব অশ্লীল পদ্য দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। যখন তার কাছে পুশকিনের কথা বলেছিলাম, সে উত্তরে তার নোটবইয়ে পুশকিনের একটি কবিতার নকল দেখিয়েছিল।

"পুশকিন কি? একটা বিদূষক ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু সেই বেনিডিকটভ্‌—সে মন দিয়ে পড়বার উপযুক্ত।"

এবং চোখ দুটি বন্ধ করে সে মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করতো, "তাকাইয়া দেখ সুন্দরীর মোহন স্তন দুটি।"

এবং কোন কারণবশত এই ছত্র তিনটির প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল ; সে আনন্দে গর্বের সঙ্গে আবৃত্তি করতো ;

'ঈগলেরও তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি
ভেদ করি সেই নিভৃত নিলয়
পারে না করিতে পাঠ সে হৃদয়লেখা।'

বুঝতে পারলে?"

সে যে জন্য এত খুশি তা যে আমি বুঝি না সেকথা তার কাছে স্বীকার করতে আমার বড় অস্বস্তি বোধ হত।

কারখানায় আমার কর্তব্যটা জটিল ছিল না। সকালে তারা যখন ঘুমোত তখন সকলের জন্য আমাকে স্যামোভারে আগুন দিয়ে চা তৈরি করতে হত। তারা যখন রান্নাঘরে বসে চা খেত তখন পাভেল আর আমি কারখানা ঝাঁট দিতাম, ধুলো ঝাড়তাম, লাল, হলদে বা সাদা রঙগুলো গুছিয়ে রেখে দোকানে যেতাম। সন্ধ্যায় আমাকে রঙ গুঁড়ো করতে আর কাজের ওপর "নজর" রাখতে হত। প্রথম প্রথম খুব আগ্রহের সঙ্গে নজর রাখতাম। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, লোকগুলো কাজটা পছন্দ করে না এবং দুঃসহ বিরক্তিতে সারা হয়।

শীঘ্রই দেখতে পেলাম, সেই লোকগুলো আমার চেয়ে জানে কম। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শৈশবকাল থেকে কারখানার সঙ্কীর্ণ জীবন-পিঞ্জরে বন্দি হয়ে তখনও সেখানে রয়ে গেছে। কারখানার সকল কারিগরদের মধ্যে জিখারেভই মস্কোয় ছিল। সেকথা সে ভ্রূকুটি করে টেনে টেনে বলতো।

"মস্কোয় চোখের জলে কিছু হয় না। তারা জানে কিসে কি হয়।"

বাকি সকলে কাছের দু-একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও যায় নি। কাজানের কথা বললে তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, "সেখানে কি অনেক রুষ আছে? কোন গির্জা আছে?"

তারা মনে করতো পারমশহর হচ্ছে সাইবেরিয়ায়। আর সাইবেরিয়া যে উরাল-পর্বতমালার পারে তা তাদের বিশ্বাস হত না। আমি যা দেখেছি সে সম্বন্ধে গল্প বললে তারা বিশ্বাস করতো না, কিন্তু তারা সকলেই ইতিবৃত্তমিশ্রিত ভয়ঙ্কর কাহিনীগুলো শুনতে ভালোবাসতো। এমন কি পরিণত বয়সের লোকেরাও সত্যের চেয়ে কল্পনা পছন্দ করতো। বেশ ভাল করেই দেখতে পেতাম, ঘটনাগুলো যত বেশি অসম্ভব হত, গল্পটা যত বেশি কাল্পনিক হত, তারা তত বেশি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতো। মোটের ওপর বাস্তবে তারা আকৃষ্ট হত না এবং বর্তমানের দারিদ্র্য ও ভীষণতাকে দেখতে মন চাইতো না বলে তারা সকলেই ভবিষ্যতের দিকে স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলে তাকাতো।

এতে আমি বিস্মিত হতাম। পুঁথি ও জীবনে এমন

বৈপরীত্য আমাকে পীড়িত করতো। আমার সামনে ছিল জীবন্ত মানুষ; আর পুঁথিতে—স্মাউরি, ইনজিন-খালাশি ইয়াকভ, পলাতক আলেকজান্দার ভাসিলিয়েভ, জিখারেভ, ধোপানী নাতালিয়ার মতো মানুষ একটিও ছিল না।

অধ্যবসায়ের সঙ্গে বইয়ের সন্ধান করতাম, পেতামও এবং প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সেগুলো পড়তাম। সন্ধ্যাগুলো ছিল আনন্দের। কারখানাটা তখন হত রাতের মতো নিস্তব্ধ। ছাদ থেকে টেবিলের ওপর ঝুলতো হিম, সাদা তারকার মতো কাচের গোলকগুলো; তাদের আলোয় আলোকিত হয়ে থাকতো লোমশ ও কেশবিরল মস্তকগুলি। দেখতাম, আমার চারধারে শান্ত, গম্ভীর মুখ। মাঝে মাঝে গ্রন্থকার বা নায়কের প্রশংসা শোনা যেত। সকলেই মন দিয়ে শুনতো। সকলেরই অন্তর হয়ে উঠতো কোমল, তারা যেন আর তাদের মতো থাকতো না। সে সময়ে তাদের আমার বড় ভাল লাগতো। তারাও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো। অনুভব করতাম, যেন আমার ঠিক জায়গাটিতে এসে পড়েছি।

একদিন সিতানভ বললে, "যখন আমাদের কাছে বই থাকে তখন যেন আমাদের বসন্ত কাল। তখন শীতের জানলার কাঠামোগুলো খুলে নেওয়া হয় আর সেই প্রথম জানালাগুলো আমরা ইচ্ছা মতো খুলতে পারি।"

বই সংগ্রহ করা ছিল কঠিন। আর, আমরাও গ্রন্থাগারের চাঁদা দিতে পারতাম না, কিন্তু আমি কোন রকমে জোগাড় করতাম। যেখানে যেতাম বই ভিক্ষা চাইতাম। এই ভাবে একজন ফায়ার-বিগ্রেডের পদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে জোগাড় করে ছিলাম

"লারমনতফ"। বইখানা আমরা সকলে বার কয়েক পড়ে ছিলাম। কারিগরেরা, বিশেষ করে সিতানভ "লারমনতফ" পড়ে একেবারে অভিভূত হয়েছিল।

শীতের তুষার ঝড়ে যখন পৃথিবীর সব কিছু—বাড়ি-ঘর, গাছপালা আন্দোলিত হত, আর্তনাদ করতো, কাঁদতো, লেনট-পর্বে যখন ঘণ্টার করুণধ্বনি উঠতো বেজে, তখন সে-সবের বেদনার ভার তরল সীসকের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে আসতো কারখানায়। এবং তার ভারে লোকগুলিকে পিষ্ট করে তাদের মধ্যে প্রাণবন্ত যা কিছু থাকতো সেগুলিকে করতো বিনষ্ট এবং তাদের নিয়ে যেত ভাটিখানায়, নিয়ে যেত নারীদের কাছে। তারাও ভদকার কাজ করতো। তাদের সবকিছু দিত ভুলিয়ে।

সেই সব সন্ধ্যায় বইগুলোতে কোন কাজ হত না। তাই পাভেল ও আমি আমাদের মতো করে তাদের আমোদ দেবার চেষ্টা করতাম। মুখে রঙ মেখে, পোশাক পরে আমাদেরই রচিত নানা হাস্যরসাত্মক নাট্যাভিনয় করতাম। এবং সেই বৈচিত্র্য-হীনতার সঙ্গে বীরবিক্রমে লড়াই করে পরিশেষে তাদের হাসাতাম। "মহামতি পিটারের জীবন রক্ষার কাহিনীটি" মনে পড়তো; মনে পড়তো তাতে একজন সৈনিক কি করে প্রাণ দান করেছিল। আমি গ্রন্থখানি সংলাপে পরিণত করে ছিলাম। ডেভিডভের বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে আমরা মহানন্দে অভিনয় করতে করতে এক কাল্পনিক সুইডের শিরশ্ছেদ করতাম। আমাদের শ্রোতৃবর্গ তাতে হেসে সারা হত।

তারা বিশেষ করে আনন্দিত হত এক চীনা দুষমনের কাহিনীতে। আমাদের শ্রোতারা প্রাণ খুলে হাসতো। তাদের কত সহজে হাসানো যায় দেখে অবাক হয়ে গিয়ে ছিলাম। এতে আমার ভাল লাগতো না।

কিন্তু সে পথে যতই অগ্রসর হয়েছি ততই এই ভেবে ক্লিষ্ট হয়েছি যে তাদের অন্তর আনন্দের চেয়ে দুঃখেই সাড়া দেয় বেশি। তাদের জীবনে আনন্দের স্থান নেই, মূল্য নেই। সর্দার কারিগর আমাকে সহৃদয়তাগুণে বলতো, "তুমি আমুদে ছোকরা, তোমার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ পড়ুক।"

জিখারেভ তার কথায় সায় দিয়ে বলতো, "ও আমাদের বর। বুঝলে ম্যাকসিম, তোমার সারকাসে বা থিয়েটারে যাওয়া উচিত। সেখানে তুমি খাশা ভাঁড় হতে পারবে।"

সমস্ত কারখানার মধ্যে খ্রীস্টমাসের সময় কেবল দুজন থিয়েটারে যেত—কাপেন্‌ডিউইখিন আর সিতানভ। বয়স্ক কারিগরেরা তাদের সত্য করেই জোর্ডন-নদীর জল ছিটিয়ে এই পাপ ধুয়ে ফেলতে বলতো। বিশেষ করে সিতানভ আমাকে প্রায়ই পীড়াপীড়ি করতো, "সব ছেড়ে দিয়ে অভিনেতা হও!"

এবং অত্যন্ত অভিভূত হয়ে সে আমাকে বলতো অভিনেতা ইয়াকোলেভের জীবনের "করুণ" কাহিনী।

"তাতেই বুঝতে পারবে যে কি হয়!"

একদিন বাজারে আগুন-থানার সামনে তিনজন খালাশি একটি চাষীকে ঠেঙিয়ে আমোদ উপভোগ করছিল। জন চল্লিশেক লোকের একটি জনতা দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে

সৈনিক তিনটিকে খুব বাহবা দিচ্ছিল। সিতানভ সেই মারামারির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লম্বা হাতে খালাশিদের ওপর ঘুষি চালিয়ে তাদের হঠিয়ে দেয়। তারপর "একে নিয়ে যাও" বলতে বলতে চাষীটাকে শূন্যে তুলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

তিনজনের বিরুদ্ধে একজন! সেখান থেকে আগুন-থানাটা ছিল দশ পা দূরে। তারা সাহায্যের জন্য ডাকতে পারতো, সিতানভকে মেরে ফেলবারও সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সৌভাগ্য-বশত খালাশিরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

সিতানভ ও কোজ্বাক কাপেনডিউইখিনে বনতো না। কোজ্বাকটাই মাতাল হয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করতো এবং সুস্থ মেজাজে থাকলে সিতানভের কবিতা রচনার আগ্রহ ও প্রণয়ে বিফলতা নিয়ে নিতান্ত অশ্লীল ভাবে পরিহাস করতো। সিতানভ নীরবে, শান্ত ভাবে তা শুনতো। এমন কি সে সময়ে কোজ্বাকটার সঙ্গে নিজের কথা নিয়ে হাসতোও।

রাতের বেলা দুজনে পাশাপাশি শুতো এবং বহুক্ষণ ফিস্ ফিস্ করে কি বিষয়ে যেন আলোচনা করতো। তাতে আমি স্থির থাকতে পারতাম না। এই দুটি লোক যাদের পরস্পরের সঙ্গে একটুও মেলে না, এমন বন্ধুর মতো কি কথা বলে তা জানবার জন্য উদগ্রীব হতাম। কিন্তু তাদের কাছে গেলেই কোজ্বাকটা চীৎকার করে উঠতো, "কি চাও?"

সিতানভ যেন আমাকে দেখেও দেখতো না।

যাহোক্, একদিন তারা আমাকে ডাকলে; কোজ্বাকটি জিজ্ঞাসা করলে, "ম্যাকসিমিচ, তুমি বড়লোক হলে কি করতে?"

—"বই কিনতাম।"

—"আর কি করতে?"

—"জানি না।"

"এঃ!" বলে সে বিরক্তিতে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু সিতানভ শান্ত ভাবে বললে, "বুড়োই হোক আর ছোকরাই হোক কেউ তা জানে না। যদি কোন বিশেষ-উদ্দেশ্যে খরচ করা যায় তাহলে ধন-দৌলৎ কিছুই নয়।"

জিজ্ঞেস করলাম "তোমরা কি বিষয়ে কথা বলছো?"

কোজাকটা উত্তর দিলে, "আমাদের ঘুম আসছে না তাই আমরা কথা বলছি।"

পরে আবিষ্কার করেছিলাম, অন্য লোকেরা দিনের বেলায় যে সব বিষয়ে আলোচনা করে এরা রাতের বেলা সেই সব বিষয়—ঈশ্বর, সত্য, সুখ, নারীজাতির নির্বুদ্ধিতা ও চতুরতা, ধনীদের লোভ, জীবনের জটিলতা এবং দুর্জ্ঞেয়তা আলোচনা করে থাকে।

তাদের আলোচনা আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। একথা ভেবে প্রায় খুশিই হতাম যে প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে—জীবন মন্দ, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করাই আমাদের উচিত।...

তারা সব সময়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতো মৃত্যুর পর তাদের কি হবে অথচ কারখানাটাতে ঢোকবার পথে যেখানে হাত ধোবার পাত্রটি ছিল সেখানকার মেঝের তক্তাগুলো গিয়েছিল পচে। সেই ভিজে, পচা গন্ধভরা গর্ত থেকে উঠতো অম্লাক্ত ছাতা পড়া, ভিজে মাটির ঠাণ্ডা, উৎকট

ভাপসা। তাতেই পা যেত জমে। পাভেল ও আমি খড় ও ন্যাকড়া দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছিলাম। প্রায়ই বলতাম, তক্তাগুলো বদলানো দরকার, কিন্তু গর্তটা হচ্ছিল ক্রমেই আরও বড়। যেদিন আবহাওয়া খারাপ হত সেদিন নল থেকে যেমন ধোঁয়া বার হয় তার মধ্য থেকে তেমনি উঠতো বাষ্প। সকলের সর্দি হত। তারা কাসতো।···

স্নান করে এসে নোংরা, ধুলোভরা বিছানায় দুর্গন্ধের মধ্যে শুতে তাদের কারো বিরক্তি বোধ হত না। আরও কত তুচ্ছ অসুবিধা আমাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলে ছিল, যেগুলোকে সহজেই দূর করা যেতে পারতো, কিন্তু কেউ কিছু করবার কষ্টটুকুও নিতে চাইতো না।

তারা প্রায়ই বলতো, "মানুষের ওপর কারোই দয়া নেই, ঈশ্বরেরও নয়, আমাদের নিজেদেরও নয়।"

পাভেল ছিল আমার চেয়ে বছর দুইয়েকের বড়। সে ও আমি যখন মুমূর্ষু ডেভিডভকে একদিন স্নান করিয়ে দিই সেদিন সকলে আমাদের বিদ্রূপ করেছিল। ডেভিডভের দেহটি ক্লেদ ও কীটে একেবারে কুরে খেয়েছিল। তখন সকলে গায়ের শার্ট খুলে তাদেরও গা দেখতে বলেছিল। আমরা যেন লজ্জাকর ও অত্যন্ত হাস্যকর কিছু একটা করে ফেলেছি এমনি করে আমাদের বিদ্রূপ করেছিল ও বলেছিল, নিরেট।

ডেভিডভ মাচার ওপর পড়ে থাকতো, ভীষণ কাসতো এবং রক্তমাখা থুথু ফেলতো। কিন্তু তা পিকদানিতে না পড়লে মেঝেয় পড়ে চারধারে ছিটকে যেত। রাতের বেলা প্রলাপের ঘোরে সে চীৎকার করে আর সবায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দিত।

প্রায় প্রত্যহ তারা বলতো, "ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু দেখা গেল, ডেভিডভের ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আর তাকেও একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে। তখন তারা বললো, "ওকে নিয়ে গিয়ে শেষটায় কোন ফল হবে না। ও শিগগিরই মরবে।"

আর সেও নিজের মনে বললো, "আমি শেষরাতেই চলে যাবো।"

সে হাস্যরসিক ছিল। হাস্য-পরিহাসে কারখানার একঘেয়েমী দূর করবার চেষ্টা করতো। কালো মুখখানা ঝুলিয়ে সাঁই সাঁই সুরে বলতো, "যে মাচায় উঠেছে তার কথা শোন তোমরা।"

সে ছড়া কাটতো। তার শ্রোতারা বলতো, "ওর উৎসাহের কমতি নেই।"

কখন কখন পাভেল ও আমি তার কাছে গিয়ে উঠতাম। সে কষ্টের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতো। বলতো, "তোমাদের কি দিয়ে আপ্যায়িত করবো? একটা ছোট কচি মাকড়সা —তোমাদের ভাল লাগবে?"

তার মৃত্যু হয়েছিল তিলে তিলে। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে বিরক্তির সঙ্গে বলতো, "বোধ হচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক আমি মরতে পারি না, এটা বাস্তবিকই শোচনীয় ব্যাপার।"

মৃত্যুর সম্মুখে এমন নির্ভীকতা দেখে পাভেলের আতঙ্ক হত। গভীর রাতে আমাকে জাগিয়ে সে ফিস্ ফিস্ করে বলতো, "ম্যাকসিমিচ, মনে হচ্ছে ওর শেষ হয়ে আসছে। ধর,

রাতের বেলা ওর নিচে আমরা যখন ঘুমোবো ও যদি তখন মারা যায়! হা ভগবান! মরা মানুষকে আমার ভয় করে!"

অথবা বলতো, "ও জন্মেছিল কেন? বাইশ বছরও পূর্ণ হয় নি এর মধ্যেই মরছে।"

এক জ্যোৎস্নারাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। বিস্ফারিত ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "শোন!"

ডেভিডভ মাচায় শুয়ে খন খনে গলায় তাড়াতাড়ি ও স্পষ্ট বলছিল, "আমাকে দাও—দাও—"

তারপর তার হিক্কা উঠতে লাগলো।

পাভেল উত্তেজিত হয়ে বললে, "ওর শেষ হয়ে আসছে। ঈশ্বরের দিব্যি দেখ!"

সারাদিন উঠোন থেকে মাঠে তুষার নিয়ে গিয়ে ছিলাম তাই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু পাভেল আমাকে মিনতি করে বলতে লাগলো, "খ্রীস্টের দিব্যি, ঘুমিও না, ঘুমিও না।"

এবং হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে উন্মাদের মতো বলে উঠলো, "ওঠো! ডেভিডভ মারা গেছে!"

জনকতকের ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে কয়েকটি মূর্তি উঠে দাঁড়ালো। এ ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। সকলেরই কণ্ঠে ক্রোধের সুর।

কাপেনডিউইখিন মাচায় উঠে অবাক হয়ে বললে, "সত্যি—মারা গেছে। তবে এখনও ওর গা গরম আছে।"

সব স্তব্ধ। জিখারেভ ভগবানকে স্মরণ করলে এবং গায়ে কম্বলখানা বেশ করে জড়িয়ে বললে, "ও এখন স্বর্গরাজ্যে।"

কে যেন বললে, "ওকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া যাক্।"

কোজাকটা মাচা থেকে নেমে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে ; বললে, "ও যেখানে আছে সেইখানেই সকাল অবধি থাক। বেঁচে থাকতে ও কারো কোন ক্ষতি করে নি।"

পাভেল বালিশের নিচে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু সিভানভের ঘুমই ভাঙল না।

প্রান্তরের তুষার গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আকাশ থেকে শীতের মেঘ চলে গেছে উড়ে, পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে গলা তুষার ও বৃষ্টি ধারা, সূর্যের প্রাত্যহিক চলা ক্রমেই আসছে শিথিল হয়ে ; বাতাস হয়ে উঠছে ক্রমেই উষ্ণ, এবং মনে হচ্ছে আনন্দময় মধুমাস এসে গেছে। তবে এখনও সে লুকিয়ে আছে প্রান্তরের অন্তরালে। সেখান থেকে হঠাৎ একদিন শহরে এসে দেখা দেবে। শহরের পথে পথে লাল কাদা, নালা দিয়ে জলধারা ছুটে চলেছে, তুষারশূন্য জায়গা-গুলোতে চড়ুইয়ের ঝাঁক আনন্দে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের মতো মানুষের অন্তরেও দেখা দিয়েছে একই উত্তেজনা। মধুমাসের শব্দধারার ঊর্ধ্বে সকাল থেকে রাত অবধি অবিরাম উৎসবের ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে আর প্রত্যেকটি চাপাধ্বনিতে হৃদয় উঠছে উদ্বেলিত হয়ে। বৃদ্ধের কথার মতো সেই শব্দে রয়েছে একটা চাপা অসন্তোষ।

আমার নামকরণের দিনে মজুররা আমাকে ভক্ত আলেকসির চমৎকার রঙকরা একটি ছোট প্রতিমূর্তি উপহার দিয়ে ছিল আর জিখারেভ দিয়েছিল জোরালো একটি বক্তৃতা। তা আজও আমার খুব ভাল মনে আছে।

সে তর্জনী সঞ্চালন করতে করতে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছিল, "তুমি কি ? একটি তেরো বছরের ছেলে ছাড়া আর কিছুই নয়— আর আমি তোমার চারগুণ বয়স, তোমাকে প্রশংসা করি, তোমাকে তারিফ করি। কারণ তুমি সর্বদা দাঁড়াও জনসাধারণের সামনাসামনি, একধারে নয়। সর্বদা এইভাবে দাঁড়িও। তাহলেই ঠিক থাকবে।"

তার বক্তৃতার শেষ ছিল না। অবশেষে কাপেনডিইখিন বিরক্তিভরে বলে ওঠে, "আরে, ওর প্রশংসা রাখ। ওর কান দুটো নীল হয়ে উঠতে শুরু করেছে।". তারপর আমার কাঁধে চাপড় মেরে সে নিজেই আমার প্রশংসা শুরু করে, "তোমার মধ্যে যা ভাল সেটা হচ্ছে, মনুষ্য-জাতির ও তোমার মধ্যের সাধারণ যা তাই ; এ নয় যে, তুমি কারণ ঘটালেও তোমাকে তার জন্য তখন বকা বা মারা কঠিন।"

তাদের বক্তৃতার মাঝে প্রতিমূর্তিটি হাতে করে আমি হতভম্বের মতো ছিলাম দাঁড়িয়ে। তারা আমার সেই বিমূঢ় ভাব নিয়ে হাস্য-পরিহাস করছিল। তারা যে আমাকে একটা মূল্য দিচ্ছিল, আমাকে আদর করছিল এরই অপ্রত্যাশিত আনন্দে আর একটু বেশি হলে বোধ হয় কেঁদে ফেলতাম। আর ঠিক সেই দিনই সকালে দোকানদার পিটার ভাসিলিচ মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলে, "ছেলেটা বিশ্রী, অকর্মা।"

অন্য দিনের মতো সেদিনও সকালে দোকানে গেলাম। কিন্তু দুপুর বেলা দোকানদার আমাকে বললে, "বাড়ি গিয়ে গোদামের ছাদ থেকে তুষার ফেলে দিয়ে নিচের কুঠুরিটা পরিষ্কার করে ফেল।"

সেটা যে আমার নামকরণের দিন তা সে জানতো না। মনে করে ছিলাম কেউই জানে না। কারখানায় আমার পর্ব শেষ হলে বাড়ি গিয়ে পোশাক বদলে ছাপ্পড়ের চালে উঠে সেই শীতকালে তার ওপর যে মসৃণ ও গুরুভার তুষার জমেছিল তা ফেলে দিতে লাগলাম। কিন্তু উত্তেজনায় কুঠুরিটার দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিলাম ভুলে। তাই সমস্ত তুষার ফেললাম তার মধ্যে। তার পর চাল থেকে নিচে নেমে আমার ভুল দেখতে পেলাম এবং তৎক্ষণাৎ দরজা থেকে তুষারের রাশি সরিয়ে ফেলতে লাগলাম। কিন্তু ভিজে বলে তা চাপ বেঁধে পড়ে রইলো। কাঠের কোদালখানা অতি কষ্টে তার মধ্যে চলতে লাগলো। এবং দোকানদারটা যে মুহূর্তে উঠোনের ফটকে এল ঠিক সেই মুহূর্তে সেটা গেল ভেঙে। "হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা" এই রুষ প্রবচনটি আমার বেলায় হল সত্য।

দোকানদারটা অবজ্ঞায় বলে উঠলো, "বটে! তুমি তো দেখছি খাশা কাজের লোক। যদি তোর ওই নিরেট মাথাটাকে—" বলেই সে কোদালের পাতাটা আমার মাথার ওপর ঘোরালো।

আমি সরে গিয়ে রাগের সঙ্গে বললাম, "আমাকে উঠোন পরিষ্কারের জন্য রাখা হয় নি।"

সে হাতের ছড়িখানা আমার গায়ে ছুড়ে মারলে। আমিও একটা তুষারের গোলা তৈরী করে সোজা ছুড়ে মারলাম তার মুখে। সে ঘোড়ার মতো হ্রেষাধ্বনি করতে করতে ছুটে পালালো; কাজটা ফেলে রেখে ঢুকলাম কারখানায়। দোকানদারটার যে বাগদত্তা কনে ছিল সে কয়েক মুহূর্ত পরেই ছুটে নিচে নেমে এল। বললে, "ম্যাকসিমিচ, তোমাকে ওপরে যেতে হবে।"

মেয়েটি ছিল খুব চট্‌পটে। তার শূন্য মুখখানা ছিল ব্রণে ভরা।

বললাম, "যাবো না।"

সর্দার কারিগর বিস্ময়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, "তার মানে; তুমি যাবে না?"

আমি তাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। সে ভ্রূকুটি করে দোতালায় উঠে গেল। আবার বললে, "বেয়াড়া ছোকরা—"

দোকানদারটার উদ্দেশ্যে গালাগালে কারখানাটা গম গম করতে লাগলো। কাপেনডিউইখিন বললে, "এবার কর্তারা তোমাকে তাড়াবে।"

তাতে আমার একটুও ভয় হল না! কারণ দোকানদারটার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয়ে উঠেছিল অসহ্য। সে আমাকে খোলাখুলিই ঘৃণা করতো। আর সেটা ক্রমেই হয়ে উঠছিল তীক্ষ্ণতর। আমিও তাকে সইতে পারছিলাম না; কিন্তু যা জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম, তা হচ্ছে—কেন সে আমার সঙ্গে এমন বিসদৃশ আচরণ করে? সে দোকান-ঘরের মেঝেয় রুবল ও কোপেক ছড়িয়ে রাখতো। ঝাঁট দিতে গিয়ে আমি সেগুলো কুড়িয়ে পেয়ে কাউনটারের ওপর

ভিখারীদের জন্য যে পেয়ালায় খুচরো থাকতো তাতে রেখে দিতাম। যখন বুঝতে পারলাম, প্রায়ই এ রকম কুড়িয়ে পাই কেন, তখন একদিন তাকে বললাম, "তুমি উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সামনে টাকা ছড়িয়ে রাখো!"

সে আমাকে তেড়ে এসে বেফাঁস্ বলে ফেললে, "আমাকে শিখাতে এস না! আমি কি করছি তা জানি।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুধরে নিয়ে বললে, "উদ্দেশ্য নিয়ে ফেলি মানে আপনা থেকেই পড়ে যায়।"

সে আমাকে দোকানে বই পড়তে বারণ করে দিয়ে ছিল।

আমাকে টাকা-পয়সা সরাতে ধরবার জন্য তার চেষ্টার শেষ ছিল না। আমি ঝাঁট দিতে দিতে কোন টাকা গড়িয়ে মেঝেয় কাঠের তক্তার ফাঁকে ঢুকে গেল সে বলতো আমি চুরি করেছি। তখন তাকে বলতাম, ও সব চালাকি ছেড়ে দাও। সে আমাকে চোর প্রতিপন্ন করবার বহু চেষ্টা করতো।

পাশের দোকানে এসেছিল এক নতুন সহকারী। একদিন তারা যখন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল তখন আমি তা জানতে পারি।

নূতন সহকারীটি দক্ষ দোকানদার হলেও ছিল মাতাল। তার মুখখানা ছিল রক্তহীন, ফ্যাকাসে, দেহ ক্ষীণ কিন্তু চোখ দুটো শঠতা ভরা। সে মনিবের বড় অনুগত ছিল। তাঁর সামান্য ইঙ্গিতে নুয়ে পড়তো। তার মুখের দাড়ির আড়ালে সর্বদা লেগে থাকতো চতুর হাসি। যাদের দাঁত খারাপ তাদের মুখ থেকে যেমন পচা গন্ধ বার হয় তার মুখ থেকেও সর্বদা বার হত সেই রকম গন্ধ যদিও তার দাঁতগুলো ছিল ঝক্ ঝকে ও শক্ত।

একদিন সে আমাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে ছিল। মুখে চমৎকার হাসি নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার টুপিটা মাথা থেকে তুলে আমার চুলের মুঠি ধরলে। দুজনে তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো। সে আমাকে দোকানের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেল আর চেষ্টা করতে লাগলো মেঝের চারধারে যে বড় বড় বিগ্রহগুলো দাঁড় করানো ছিল সেগুলোর গায়ে ঠেলে ফেলবার। তা যদি করতে পারতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সার্সি বা কাঠের কারুকার্যগুলো ভেঙে ফেলতাম। খুব দামী বিগ্রহের গায়ে নিশ্চয়ই দাগও পড়তো। কিন্তু লোকটা ছিল দুর্বল। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে কাবু করে ফলতেই অবাক হয়ে দেখলাম, সেই দাড়িওয়ালা লোকটা মেঝেয় বসে থেঁৎলানো নাকে হাত বুলোতে বুলোতে খুব কাঁদছে।

পরদিন আমাদের দুজনেরই মালিকেরা বেরিয়ে গেলে সে আমাকে বন্ধু ভাবে বললে, "তুমি কি মনে করো আমি নিজের থেকে তোমায় আক্রমণ করে ছিলাম? আমি আহাম্মক নয়। আমি জানতাম, আমার চেয়ে তোমার গায়ে জোর বেশি। তোমার মনিবই আমাকে বলে ছিল। 'তোমার সঙ্গে মারামারি করবার সময় ওকে দিয়ে দোকানের কিছু ভাঙাও।' আমি নিজের থেকে এমন কাজ কখনও করতাম না। এই দেখ আমার নাকটা তুমি কি রকম সাজিয়ে দিয়েছ।"

তার কথায় বিশ্বাস করে তার জন্য দুঃখ হল। জানতাম সে অর্ধাশনে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে। জিজ্ঞেস করলাম, "সে যদি তোমাকে কাউকে বিষ খাওয়াতে বলতো, হয়তো তুমি তাও করতে?"

"সে তাও করতে পারে। সে সব কিছু করতে পারে।"

তারপরই সে বললে, "দেখ, আমার কাছে একটি আধলাও নেই। বাড়িতে খাবারও কিছু নেই। ঘরে সে আমাকে জ্বালাতন করে। তুমি কি তোমাদের বিগ্রহগুলো থেকে একটা বিগ্রহ বা একখানা স্তবের বই আমাকে দিতে পারো না? আমি সেটা বেচবো। দেবে?"

মনে পড়লো সেই বুট জুতোর দোকানের কথা। ভাবলাম, "লোকটা আমাকে ফাঁস করে দেবে না তো?" কিন্তু তাকে ফিরাতে পারলাম না। তাকে একটি বিগ্রহ দিলাম! স্তোত্রের বই দিতে পারলাম না। কারণ তার দাম ছিল প্রায় আট-দশ রুবল। মনে হল, তা করা আমার পক্ষে হবে মহা অপরাধ। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অলক্ষ্যে নিহিত থাকে গণিতশাস্ত্র। এই ক্ষুদ্র রহস্যটি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায় "অপরাধীর দণ্ডবিধির" পূত সরলতার মধ্যে। আর তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সম্পত্তির বিরাট ফাঁকিটা।

আবার, আমাদের দোকানদারটি যখন বললে, সেই হতচ্ছাড়াটা আমাকে দিয়ে স্তোত্রের বইও চুরি করাতে পারে তখন আমার ভয় হল। বুঝলাম, সে তার কাছে বিগ্রহটির কথা বলেছে। অবশেষে একদিন ঘটলোও তাই। সে এসে আমার কাছে একখানা স্তবের বই চাইলে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমার মনিবের কাছে বিগ্রহটার কথা বলেছো?"

সে কাতর কণ্ঠে উত্তর দিলে, "বলেছি ভাই। আমি কোন কথাই পেটে রাখতে পারি না।"

সে কথায় একেবারে হতভম্ব হয়ে মেঝেয় বসে পড়ে তার দিকে আহম্মকের মতো তাকিয়ে রইলাম। সে বললে, "দেখ, ওরা বুঝতে পেরেছিল—"

ভাবলাম আমার দফারফা। এই লোকগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। এখন আমার জন্য কিশোর অপরাধীদের বসতিতে একটি জায়গা একেবারে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। যদি তাই হয় তো কুচ পরোয়া নেহি; যদি ডুবতেই হয় তা হলে গভীর জলেই ডোবা উচিত! আমি তার হাতে একখানা স্তোত্রের বই দিলাম। সে জামার হাতার মধ্যে সেখানা লুকিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরই হঠাৎ ফিরে এল। স্তোত্রের বইখানা পড়লো আমার পায়ের কাছে। আর লোকটা এই বলতে বলতে চলে গেল, "আমি নেবো না! তাহলে তোমার দফা রফা হবে।"

কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। আমার দফা রফা হবে কেন? কিন্তু সে বইখানি না নেওয়ায় খুব খুশি হয়ে ছিলাম। তারপর থেকেই আমাদের দোকানদারটি আমাকে বিষ দৃষ্টিতে ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো।

এ সব কথা মনে পড়লো সর্দার কারিগরটি যখন ওপরে গেল। সে একটু পরেই নেমে এসে নিরুৎসাহে বললে, "তোমাকে দোকান থেকে ছাড়িয়ে যাতে কারখানায় দেয় তার চেষ্টা করে ছিলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। মনিব তা চায় না। তোমার ওপর আদৌ খুশি নয়।"

সে বাড়িতে আমার এক শত্রু ছিল—দোকানদারটির বাগদত্তা এক তরুণী। মেয়েটি ছিল বেহায়া। কারখানার

ছোকরারা তার সঙ্গে 'ইয়ারকি' দিত। তারা তার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো, তাকে জড়িয়ে ধরতো। সে তাতে অপমানিত বোধ করতো না, কেবল কুকুরছানার মতো কেঁউ কেঁউ করতো। সে সকাল থেকে রাত অবধি সব সময় কিছু না কিছু চিবোত; তার চোয়াল দুখানা নড়তোই। তার ন্যাড়া মুখখানা ও চঞ্চল চোখ জোড়া বিশ্রী দেখাতো। সে পাভেল ও আমাকে সব সময় হেঁয়ালির মানে জিজ্ঞেস করতো। এই সব হেঁয়ালির মধ্যে থাকতো অশ্লীলতা। তার কথাবার্তাও ছিল বিশ্রী।

একদিন এক বয়স্ক কারিগর তাকে বলে, "তুমি বাপু একেবারে বেহায়া!"

তার উত্তরে সে তৎক্ষণাৎ বলে, "কোন মেয়ে যদি খুব লজ্জাবতী হয় তাহলে কোন পুরুষ তাকে নিয়ে সুখ পাবে না।"

সে ধরনের মেয়ে দেখেছিলাম সেই প্রথম। তার অশ্লীল রসিকতায় আমার বিরক্তি বোধ হত। তার ভাব-ভঙ্গী আমার ভাল লাগে না দেখে আমার ওপর তার হিংসা ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল।

একদিন পাভেল ও আমি যখন তার সঙ্গে কুঠুরিতে পিপে সরাচ্ছি সে বললে, "কি করে চুমোখেতে হয় তোমাদের শেখাবো?"

পাভেল বলে, "আমি তোমার চেয়ে ভালই চুমো খেতে জানি।" আর আমি তাকে বলি, তার ভাবীস্বামীকে গিয়ে চুমো খেতে। কথাগুলো অবশ্য ভদ্রভাবে বলি না।

সে বলে, "কি অশিষ্ট! থাকো তুমি। দেখাবো তোমায়।"

আমার হয়ে পাভেল উত্তর দেয়, "তোমার বর যদি তোমার স্বভাবের কথা জানতে পারে তাহলে তোমাকে মজা দেখাবে।"

সে বলে, "ভয় করি না। আমার যৌতুক আছে, ওর চেয়ে আমার অবস্থা অনেক ভাল।"

তারপর থেকে পাভেলের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে শুরু করে।

দোকানে আমার জীবন ক্রমেই কঠোরতর হয়ে উঠতে থাকে।

দিদিমার সঙ্গে দেখা হত কমই: দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা হতই না। দিদিমা সারা শীতকালটা এক জায়গায় থেকে মেয়েদের লেশ বোনা শিখাতেন। দাদামশাই আবার কুনাভিন স্ট্রীটে ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যেতামই না, তিনিও শহরে এলে আমাকে দেখতে আসতেন না। দাদামশাইকে খাওয়াতে দিদিমা অক্লান্ত পরিশ্রম করছিলেন। দাদামশাই তখন বার্ধক্যজনিত নানা পীড়ায় ভুগছিলেন। দিদিমার স্কন্ধে এসে পড়েছিল আমার মামাতো ভাই-বোনেরা।

তাঁকে সব চেয়ে বেশি কষ্ট দিত মাইকেল মামার ছেলে শাশা। সে এক শালকরের দোকানে কাজ করতো। সে ঘন ঘন চাকরি ছাড়তো। যখন চাকরি থাকতো না তখন দিদিমার স্কন্ধে ভর করতো। এবং যতদিন না তিনি তার জন্য আর একটা চাকরি জোগাড় করে দিতেন ততদিন সে সেখান থেকে নড়তো না। তার বোনটিও ছিল দিদিমার স্কন্ধে। এক মাতাল কারিগরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে ছিল। সে তাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

যখনই দিদিমার সঙ্গে দেখা হত তখনই তাঁর ব্যক্তিত্বে

মুগ্ধ হতাম। কিন্তু অনুভব করতাম, তাঁর সুন্দর অন্তরটি কাল্পনিক গল্প ও কাহিনীতে অন্ধ হয়ে গেছে। তাই জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিকাশকে দেখতে ও বুঝতে পারে না, আমার অশান্তি ও অস্থিরতা তাঁর কাছে অদ্ভুত বোধ হয়।

"ধৈর্য ধরে থাক ওলেশা!"

আমার কাছে লোকের বীভৎস জীবন, যন্ত্রণা ও দুঃখের কাহিনী শুনে উত্তরে তাঁর যা বলবার ছিল তা ওইটুকু। অথচ আমি তাতে বিমূঢ় ও দগ্ধ হচ্ছিলাম।

প্রকৃতিই আমাকে সহিষ্ণু হবার যোগ্য করে নি। সে গুণটি যদি কখন কখন দেখাতাম তাহলে সেটা করতাম আমার শক্তির ভাণ্ডার ও পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের ক্রম পরীক্ষা করতে, নিজেকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার উদ্দেশ্যে। কখন কখন যুবকেরা, যৌবনের নির্বুদ্ধিতা বশে, তাদের পেশী-শক্তির ও দৃঢ়তার অতিরিক্ত ভার উত্তোলনের চেষ্টা করে।

আমিও শারীরিক ও মানসিক, দু-দিকেই তা করতাম। এবং ঘটনাচক্রেই বলতে হবে নিজেকে সারা জীবনের মতো বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু করে ফেলি নি। তা ছাড়া, মানুষকে তার ধৈর্য, বাহ্যিক অবস্থার কাছে তার শক্তির বশ্যতা স্বীকার যতটা বিকৃত, বিকলাঙ্গ করে ফেলে ততটা আর কিছুতে করে না।

যদিও অন্তিমে বিকৃত হয়ে মৃত্তিকা নিম্নে শায়িত থাকবো তবুও গর্বের সঙ্গেই শেষ মুহূর্তেও বলতে পারি, যে গত চল্লিশ বছর ধরে সদ্ব্যক্তিগণ আমার অন্তরকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু তাঁদের শ্রম তেমন সফল হয় নি।

নষ্টামি করবার, লোককে আমোদ দেবার, হাসাবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা আমাকে ক্রমেই বেশি করে পেয়ে বসছিল। তাতে সফলও হয়েছিলাম। বাজারের ব্যবসায়ীদের নকল করে তাদের গল্প বলতে পারতাম; যে-সব কৃষক ও কৃষাণীরা বিগ্রহ কেনা-বেচা করতে আসতো তাদের এবং দোকানদার তাদের কি ভাবে ঠকাচ্ছে তাও নকল করে দেখাতে পারতাম, দালালদের ঝগড়াও হুবহু দেখাতে পারতাম।

কারখানাটা উচ্চ হাসিতে গম গম করতো; কারিগরেরা প্রায়ই কাজ কেলে রেখে আমার নকলরূপ দেখতো! তখন সর্দার কারিগর বলতো, "তোমার অভিনয়টা রাতে খাবার পর করাই ভাল। নাহলে কাজের ব্যাঘাত হয়।"

অভিনয়ের শেষে মন অনেকটা হালকা বোধ হত। যেন একটা ভারী বোঝা ফেলে দিয়েছি! আধঘণ্টা কি ঘণ্টাখানেক আমার মাথাটা বেশ পরিষ্কার বোধ হত। কিন্তু তার খানিক পরেই মনে হত সেটার মধ্যে তীক্ষ্ণ পেরেক নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, গরম হয়ে উঠছে। বোধ হত, এক প্রকার ক্লেদ যেন আমার চারধারে টগবগ্ করে ফুটছে; আর আমি তাতে সিদ্ধ হয়ে গলে যাচ্ছি।

অবাক হয়ে ভাবতাম; জীবন কি বাস্তবিকই এই রকম? আর এরা যে ভাবে বেঁচে আছে আমাকেও কি সেই ভাবে বাঁচতে হবে? ভাল করে কিছু বুঝতে, দেখতে পাবো না?

জিখারেভ আমাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে করতে বলতো, "তুমি রুক্ষ হয়ে উঠছো ম্যাকসিমিচ।"

সিতানভ প্রায়ই জিজ্ঞেস করতো, "তোমার হয়েছে কি?"

তাকে জবাব দিতে পারতাম না। জীবন আমার অন্তরের যাকিছু সবচেয়ে মোহন সেগুলিকে ধুয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর সকলের মতো আমি একই নদীতে ভাসছিলাম। কেবল জলটা আমার পক্ষে ছিল আরও ঠাণ্ডা। এবং অন্যদের তা যে রকম স্বচ্ছন্দে ভাসিয়ে রেখে ছিল আমাকে তেমন করে রাখে নি। কখন কখন মনে হত যে, আমি ধীরে অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

কারিগরেরা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো। আমাকে কখন হয়রান করতো না। পাভেলের সঙ্গে চড়ে কথা বলতো আমার সঙ্গে তেমন ভাবে কথা বলতো না। এটা ভালই ছিল, কিন্তু দেখে বড় কষ্ট হত যে, তাদের মধ্যে কতজন ভদকা খেয়ে বিশ্রী রকমে মাতাল হত। নারীদের সঙ্গে তাদের আচরণও ছিল অস্বাস্থ্যকর। অবশ্য সেই সঙ্গে এটাও বুঝতাম যে, জীবন তাদের একমাত্র আনন্দের সুযোগ দিয়েছে, ভদকায় ও নারীতে!

দুঃখের সঙ্গে ভাবতাম, নাতালিয়ার কজলোভস্কির মতো বুদ্ধিমতী ও সাহসী স্ত্রীলোককেও লোকে বলতো সম্ভোগের বস্তু। আর দিদিমা?

নারীর চিন্তা খুব বেশি করে করতে আরম্ভ করেছিলাম। মনে মনে এই প্রশ্নটিকে বার বার ঘোরাতাম—যেখানে সকলে যায় সামনের ছুটিতে সেখানে যাবো কি? এটা আমার কোন দৈহিক কামনা ছিল না। আমার স্বাস্থ্য ছিল ভাল, প্রকৃতি ছিল বড় খুঁৎ খুঁতে। কিন্তু সময়ে সময়ে কোমল ও বুদ্ধিমতী কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গনের জন্য উন্মাদ হয়ে

উঠতাম। যেমন করে মাতাকে বলা যায় তেম্নি করে তার কাছে অকপটে, অবাধে আমার অন্তরের অশান্তি ভাষায় প্রকাশের ইচ্ছা জাগতো।

পাভেল যখন রাতের বেলা সামনের বাড়ির পরিচারিকাটির সঙ্গে তার 'দোস্তির' খবর আমাকে বলতো তখন তার ওপর হিংসা হত। সে বলতো, "ভারী মজার ব্যাপার ভাই—মাসখানেক আগে ওকে ভাল লাগতো না বলে ওকে বরফের গোলা ছুড়ে মারতাম। এখন বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে ওকে জড়িয়ে ধরি। ও এখন আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়।"

—"তোমাদের মধ্যে কি কথা হয়?"

—"সব বিষয়েরই। সে আমার কাছে তার বিষয় বলে, আমি তার কাছে আমার সম্বন্ধে বলি। তারপর আমরা চুমো খাই। ও মানুষটা সাচ্চা। আরে! তুমি যে সৈনিকের মতো তামাক খাও।"

আমি খুব সিগারেট খেতাম। তামাক আমাকে উত্তেজিত করে তুলতো, আমার চঞ্চল চিন্তা, উদ্বেলিত ভাবরাশিকে শান্ত করতো। আর ভদকা খেলে আমার নিজেরই গন্ধ ও স্বাদে বমি আসতো।

এই চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তির মধ্যে মধুমাসের আহ্বান আমাকে আরও বেশি অস্থির করে তুলতো। ঠিক করলাম, আবার জাহাজে যাবো। আর যদি আস্ত্রাখানে যেতে পারি, পালিয়ে যাবো পারস্যে!

মনে পড়ে না পারস্যকেই কেন বিশেষ করে নির্বাচিত

করেছিলাম। দেখেছিলাম, নিজনির বাজারে পারস্যের ব্যবসায়ীরা, মেহেদী রাঙা দাড়ি উড়িয়ে, পাথরের পুতুলের মতো রোদে বসে বড় বড় কালো চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হুঁকো টানছে। কারণটা এই ছবিখানি হতে পারে।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আমি কোথাও পালিয়ে যেতামই কিন্তু ঈসটার পর্বের মধ্যে একদিন কারখানার কারিগরেরা জন কতক যখন ছুটিতে বাড়ি গেছে, বাকি যারা তারা ভদকা খাচ্ছে, আমি ওকা-নদীর তীরে বেড়াচ্ছি আমার পুরোনো মনিব দিদিমার বোনপোর সঙ্গে দেখা হল।

দু-চার কথা জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, "আমার কাছে আবার তোমার ফিরে যাওয়াই ভাল, পিয়েশকফ। আমি নূতন বাজারের একটা ঠিকাদারি পেয়েছি। সেখানে তোমাকে কাজ দিতে পারি। তুমি সেখানে আমার সরকারের মতো থাকবে, মজুরদের ওপর চোখ রাখবে যাতে ওরা চুরি না করে। তোমার মাইনে হবে মাসে পাঁচ রুবল, রোজ জলখাবারের জন্যে পাবে পাঁচ কোপেক। আর, আমার বাড়ির মেয়েদের নজরেই এনো না। কেবল এইটুকু গোপন রেখো যে, তোমায়-আমায় আগে দেখা হয়েছে। রবিবার দিন দেখা করো।"

তিনি চলে গেলেন। আমিও তারপরই কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম তাঁর কাছে। কারখানার বন্ধুরা আমাকে বিদায় দিলেন ভারাক্রান্ত মনে। বহু কষ্টে তাঁরা চোখের জল সংযত করে রইলেন।

এগারো

সেখানে ছিলাম তিন বছর। এবং নানা বই পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর মিশেছিলাম মজুর ও রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই আমার দিন-রাত কাটতো। তাদের মধ্যে কয়েকটি লোককে পেয়েছিলাম অসাধারণ। ওসিপ নামে যে মিস্ত্রিটি ছিল তাকে দেখে, তার সঙ্গে মিশে মনে পড়তো জাহাজের ইয়াকভকে। সে ছিল তারই মতো।

এখানে থাকতেই শিক্ষিত জন কতকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপও জমে উঠেছিল। একজনের বাড়িতে বৈঠক বসতো। তাতে নানা বিষয়ের আলোচনা হত। তাতেও যোগ দিতাম।

একদিন বাজার থেকে সকাল সকাল, পাঁচটার সময়, বাড়ি এসে খাবার ঘরে গিয়ে একজনকে দেখে চমকে উঠলাম। তাঁর কথা একেবারে মনেই ছিল না। দেখলাম তিনি আমার মনিবের পাশে বসে আছেন। তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "কেমন আছ?"

এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে পিছিয়ে এলাম। অতীতের আগুন হঠাৎ আবার জ্বলে আমার অন্তরকে দগ্ধ করতে লাগলো।

আমার বি-পিতা মুখে হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখখানি ভীষণ শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তাঁকে দেখাচ্ছিল একেবারে জীর্ণ, ভগ্ন। তাঁর শীর্ণ, তপ্ত আঙ্গুলগুলি চেপে ধরলাম।

তিনি কাসতে কাসতে বললেন," তাহলে আবার আমাদের দেখা হল !"

তিনি আমার মনিবের বাড়িতেই থাকতে লাগলেন। তিনিও ছিলেন আমার মনিবের কর্মচারী। আমার মনিবানীরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। তিনি সেই বাড়িতেই থাকতেন, খেতেন। তাঁর বেশ পড়াশুনা ছিল। আমরা দুজনে অবসর সময়ে বসে পাঠ্য বিষয়ের, বইয়ের, গ্রন্থকারের, জীবনের বিষয় আলোচনা করতাম।

একদিন তিনি বললেন, "আমাদের মনিবরা কি বিশ্রী লোক। বিশ্রী !"

বললাম, "মনিবটিকে আমার ভাল লাগে।"

—"হাঁ, লোকটি যোগ্য, তবে অদ্ভুত।"

আর একদিন বইয়ের আলোচনার সময় বললেন, "বইতে সব কিছুকেই মেজে-ঘসে, সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখা হয়। সব কিছুই একভাবে না একভাবে বিকৃত অবস্থায় থাকে। ও সবে ভুলো না। অধিকাংশ গ্রন্থকারই আমাদের মনিবের মতো—সামান্য লোক।"

কখন তিনি বলতেন, "আমি কুকুর ভালোবাসি। কুকুরগুলো বোকা হয়। কিন্তু আমি তাদের ভালোবাসি। ওদের দেখতে সুন্দর। সুন্দরী নারীরাও অনেক সময় নির্বোধ হয়।"

তাই কি? আমি বিপরীত উদাহরণও পেয়ে ছিলাম।

তাঁর আর একটি কথা ছিল, "একই বাড়িতে যদি অনেক দিন বাস করা যায় তাহলে সে বাড়ির সকলের মুখ দেখতে হয় এক রকমের।"

তিনি হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে আমি তাঁর শয্যাপাশে শীর্ণ হাতখানি ধরে বসে ছিলাম। হাসপাতালে একটি মেয়ে তাঁকে দেখতে আসতো। কিন্তু সে কে জানি না। আমার বি-পিতার মৃত্যুর পর সে খুব কেঁদেছিল।

তিনি যখন মারা যান তখন দিন। হাসপাতাল থেকে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি, "তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো কি ?"

সে চারধারে তাকিয়ে বলে, "কেন ? এখন দিনের বেলা, রাত নয়।"

পাশের একটা গলির মোড় থেকে আমি তাকে লক্ষ্য করি। সে চলেছিল মন্থর গতিতে যেন সংসারে তাড়াতাড়ি করবার কিছু তার নেই। তখন অগাস্ট মাস। গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আমার বি-পিতার কবর দেবার সময়ও সময়ের অভাবে উপস্থিত থাকতে পারি নি, মেয়েটিকেও আর কখন দেখি নি।

ছুটির দিনে প্রায়ই বেড়াতে বেড়াতে যেতাম শহরের বাইরে মিলোনি স্ট্রীটে। সেখানে থাকতো ডক-মজুরেরা। আরডালন ছিল এক রাজমিস্ত্রি। আমার মনিবের ঠিকেদারিতে কাজ করতো। সে মানুষটি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু সে কাজ

ছেড়ে এসে যোগ দিয়ে ছিল ডক-মজুরদের সঙ্গে। দেখলাম এক বছরেই সেখানকার কদর্য গুণ্ডাগুলোর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে বেশ আছে। মাত্র বছর খানেক আগে সে ছিল সুখী ও গম্ভীর প্রকৃতির কিন্তু সেই একবছরে সে হয়ে উঠেছিল তাদের যে কারোর মতো 'বক্কুড়ে'। তার চলনও হয়ে উঠেছিল তাদের মতো। সে লোকের দিকে এমন 'কুচ্-পরোয়া নেহি' ভাবে তাকাতো যে মনে হত সে প্রত্যেককে এক হাত লড়বার জন্য ডাকছে। তার মুখেও সর্বদা লেগে থাকতো হামবড়া বুলি, "দেখছো লোকে এখানে আমার কি রকম খাতির করে। আমি এখানে সর্দারের মতো।"

সে যা রোজগার করতো তার সবটুকু ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হত না; ডক্-মজুরদের দরাজহাতে খাওয়াতো। আর মারামারিতে সব চেয়ে দুর্বলের পক্ষ গ্রহণ করতো।

পুরানো, নোংরা থলের মতো সেই রাস্তাতে ঠাসা এইসব লোকদের চরিত্র অতি আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করতাম। তারা সকলেই সাধারণ জীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল। কিন্তু মনে হত, তারা তাদের নিজস্ব এক জীবন গড়ে তুলেছে। সে জীবন আর কারো অধীন নয়। তার সবটুকু জুড়ে বইছে স্ফূর্তির হাওয়া। তারা সকলেই ছিল বেপরোয়া, উদ্ধত। তাদের দেখে মনে পড়তো দাদামশাইয়ের গল্পের নেয়েদের। কাজ না থাকলে বজরা ও স্টীমার থেকে সামান্য চুরি করতে তাদের বাধতো না কিন্তু তাতে আমি বিচলিত হতাম না। কারণ দেখেছিলাম, জীবনটা এই রকম ছোট-খাট চুরিতে পুরানো কোটে কালো সুতো দিয়ে

সেলাইয়ের মতো ভরা। সেই সঙ্গে এটাও চোখে পড়তো যে, সেই লোকগুলো উৎসাহভরে কাজ করতো না। আর ছুটির দিনে লোকে যেমনভাবে কাটায় তাদের আগাগোড়া জীবন ছিল সেই রকমের।

কিন্তু আরডালনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব লক্ষ্য করে ওসিপ আমাকে পিতার মতো সতর্ক করে দিয়েছিল, "বাবা, মিলোনি স্ট্রীটের লোকগুলোর সঙ্গে এমন মাখামাখি কেন করো? সাবধান হবে। তোমার ক্ষতি হতে পারে।"

যতটা সুষ্ঠু ভাবে পারি তাকে বলি, "লোকগুলিকে আমি ভালোবাসি। কাজ না করেই কেমন স্ফূর্তিতে আছে।"

সে সহাস্যে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, "ওরা হল হাওয়ার পাখি। ওরা তাই—কুড়ে, অকেজো। কাজ হচ্ছে ওদের কাছে বিপদ।"

—"কাজের অর্থ কি? লোকে যেমনকথায় বলে, 'সাধুদের কাজের ফলে তাদের কোঠাবাড়ি হয় না।'

কথাটা বলে ছিলাম বাচালের মতো। প্রবাদটা শুনতে শুনতে তার মধ্যকার সত্যকে উপলব্ধি করেছিলাম।

কিন্তু আমার ওপর ভীষণ রেগে উঠে সে বলে, "এ কথা কে বলে? আহাম্মকেরা, কুড়েরা। তুমি ছেলে মানুষ। তোমার ও রকম কথায় কান দেওয়া উচিত নয়! যারা হিংসুটে, অকৃতকাম তারাই এই বাজে কথাটা বলে। যতদিন না তোমার ডানা গজায় অপেক্ষা কর। তারপর উড়তে পারবে। তোমার মনিবকে আমি এই দোস্তির কথা বলবো।"

সে বলেও ছিল। তিনি আমাকে সেদিকে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। বলে ছিলেন, "ওদের কাছে যেও না। পিয়েশ-কক। ওরা চোর, বেশ্যাসক্ত। ওখান থেকেই লোকে জেলে আর হাসপাতালে যায়। ওখানে যেও না।"

মিলোনি স্ট্রীটে আমার যাতায়াতের কথা গোপন রাখতে লাগলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমাকে সেখানে যাওয়া-আসা ছেড়ে দিতে হল। একদিন একটা বাড়ির চত্বরে ছাপ্পড়ের চালের ওপর আরডালন ও তার দোস্ত রোবেনোকের সঙ্গে বসে আছি। দিনটা শুকনো ও রৌদ্রোজ্জ্বল থাকলেও নোংরা, অন্ধকার চত্বরটাতে একটি স্ত্রীলোক এসে ন্যাকড়ার মতো একটা কি যেন তার মাথার ওপর ঘুরিয়ে হেঁকে উঠলো, "পেটিকোট কিনবে কে? ওগো স্যাঙৎরা।"

বাড়িখানার গোপন স্থান থেকে স্ত্রীলোকেরা বেরিয়ে এসে ফেরিওয়ালীকে ঘিরে দাঁড়ালো। আমি তাকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম। সে হল, ধোপানী নাতালিয়া। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। কিন্তু সে প্রথম খরিদদারটিকে পেটি-কোটটা দিয়ে সেখান থেকে ততক্ষণে চলে গেছে।

তাকে ধরলাম ফটকে গিয়ে; বললাম, "কেমন আছ?"

সে আমার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে বললে, "কতই দেখবো!" তারপরই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে রাগের সঙ্গে বলে উঠলো, "ভগবান রক্ষা করুন! তুমি এখানে কি করছো?"

তার সেই আতঙ্ক ও কথাগুলো আমার মর্মে বিঁধে আমাকে বিহ্বল করে ফেললে। বুঝলাম, আমার জন্য তার ভয় হয়েছে। তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিতে ফুটে উঠলো ভয় ও বিস্ময়।

তাড়া-তড়ি বললাম, আমি সে রাস্তায় থাকি না। সেখানে কেবল যাই যা-কিছু দেখবার আছে দেখতে।

সে রাগে ও ব্যঙ্গে বলে উঠলো, "দেখতে? এজায়গাটা এমন কি যে তুমি দেখতে চাও? তুমি এখানে মেয়েদের খোঁজে আস।"

তার মুখখানি কুঁচকে গিয়েছিল, চোখের কোলে পড়ে ছিল কালি, ঠোঁট পড়ে ছিল ঝুলে।

একখানি সরাইয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, "ভেতরে চল। চা খাবো! তোমার পোশাকটা ভালই দেখছি। এখান-কার লোকদের মতো নয়। তবুও তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

কিন্তু সরাইয়ে ঢুকে মনে হল, সে আমার কথা বিশ্বাস করছে। চা ঢালতে ঢালতে সে বলতে লাগলো, মাত্র এক ঘণ্টা আগে সে কেমন করে ঘুম থেকে উঠেছে এবং তখনও কিছু খায় নি।

"কাল রাতে আমি যখন শুতে যাই তখন মদে একেবারে বেহুঁস হয়ে ছিলাম। এমন কি মনেও পড়ছে না কোথায় কার সঙ্গে মদ খেয়েছিলাম।"

তার জন্য বড় দুঃখ হল। ইচ্ছা হতে লাগলো তার মেয়েটি কোথায় জিজ্ঞেস করি। কিন্তু খানিকটা চা ও ভদকা খেয়ে সে স্ফুর্তির সঙ্গে অশ্লীল ভাবে এবং পরিচিতের মতো নিজের কথা বলে যেতে লাগলো। সেখানকার স্ত্রীলোকদের সকলেরই কথা-বার্তার ধরন ছিল সে রকম। কিন্তু তার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে নিমেষে প্রকৃতিস্থ হয়ে

বলে উঠলো, "তার কথা তুমি জানতে চাও কেন ? না বাবা, তাকে বাগাতে পারবে না সে কথা মনেও করোনা ।"

আরও খানিকটা ভদ । খেয়ে সে বললে, "আমার মেয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি কি ? একটা ধোপানী ! তার যোগ্য মা নই। সে ভাল ভাবে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। সে লেখাপড়া জানা মেয়ে। ভাই ! একটি পয়সাওয়ালা বন্ধুর সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীর মতো থাকবে বলে আমাকে ছেড়ে গেছে। সে—"

ক্ষণিক নীরবে থেকে আবার বললে, "এই ব্যাপার ! ধোপানীকে তোমার ভাল লাতো না, কিন্তু পথচারিণীকে ভাল লাগে।"

সে যে পথচারিণী তা তাকে দেখেই নিমেষে বুঝতে পেরেছিলাম। সে রাস্তায় তা ছাড়া আর কোন ধরনের স্ত্রীলোক ছিল না। কিন্তু সে যখন নিজে সেই কথা আমাকে বললে, তার জন্য লজ্জায় ও অনুকম্পায় আমার চোখে জল এল। অনুভব করলাম, তা স্বীকার করে সে যেন আমাকে দগ্ধ করে ফেললো।

সে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, "তোমাকে মিনতি করে বলছি, এখান থেকে যাও। এখানে এস না। এলে তোমার সর্বনাশ হবে।"

তারপর ভাঙা ভাঙা ভাবে, কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলো যেন সে নিজের মনেই কথা বলছে, "কিন্তু আমার মিনতি, আমার পরামর্শ শুনবে কেন ? যখন আমার নিজের মেয়েই আমার কথা শুনতে চাইলো না তখন তাকে বললাম,

'তোমার নিজের মাকে তুমি ঠেলে ফেলতে পারো না। কি ভাবছো?' আর সে, সে বলে, 'আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।' সে চলে গেছে কাজানে। সে ধাত্রী হতে চায়। ভাল। কিন্তু আমার কি হবে? দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন কি? আমি কি নিয়ে থাকবো? তাই পথে বেরিয়েছি।"

তার সঙ্গে আরও বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। নীরবে উঠে দাঁড়ালাম।

—"বিদায়!"

—"যা—যা জাহান্নামে যা।" সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। স্পষ্টই বুঝলাম, কার সঙ্গে সে কথা বলছে ভুলে গেছে।

চত্বরে আরডালনের কাছে ফিরে এলাম। কিন্তু তাকে বা রোবেনেককে ছাপ্পড়ের চালে পেলাম না। তাকে যখন বিশৃঙ্খল চত্বরটাতে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন পথে আরম্ভ হল সোর-গোল। সে রকম চীৎকার সেখানে ঘন ঘন শোনা যায়।

ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে নাতালিয়ার গায়ে আমার ধাক্কা লাগালো। তার থেঁৎলানো মুখখানি মুছতে মুছতে সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। এক হাত দিয়ে মাথার বিশৃঙ্খল চুলগুলি সমান করতে করতে সে অন্ধের মতো ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল, আরডালন ও রোবেনেক বলছিল, "ওকে আর এক ঘা দাও, চল!"

আরডালন ঘুষি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্ত্রীলোকটিকে ধরলে। সেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো; তার মুখখানা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর, চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলছে। বললে, "মারো আমাকে!"

আমি আরডালনের হাত ধরে ঝুলে পড়লাম। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। বললে, "তোমার কি হল ?"

কোন রকমে বললাম, "ওর গায়ে হাত দিও না।"

সে হাসিতে ফেটে পড়লো।

"ও তোমার প্রণয়িনী ? আরে, নাটাশাটা আমাদের ক্ষুদে সন্ন্যাসীটাকে গিলেছে।"

রোবেনেকও দু-হাতে পাঁজরা চেপে ধরে হাসতে লাগলো এবং বহুক্ষণ ধরে তারা দুটিতে তাদের তীক্ষ্ণ, জ্বালাময় অশ্লীল ভাষায় আমাকে দগ্ধ করলে। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু তাদের এই কথাবলার মধ্যে নাতালিয়া সেখান থেকে চলে গেল। আমি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে তার বুকে মাথা দিয়ে মারলাম ঢুঁ। সে পড়ে গেল এবং উঠেই দিল দৌড়।

সেই ঘটনার পর বহুকাল আমি মিলোনি স্ট্রীটের কাছেও যাই নি। কিন্তু আরডালনের সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হয়েছিল, খেয়ানৌকায়।

সে আনন্দজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলে ?"

তাকে বললাম, সেদিনকার কথা বললাম, সে নাতালিয়াকে কি রকম মেরেছিল, আমাকে অশ্লীলভাবে অপমান করেছিল—সে কথা মনে করতেই আমার সমস্ত দেহ-মন বেদনা ও ঘৃণায় ভরে যায়। শুনে সে হেসে উঠলো ; বললে, "তুমি সেটা সত্যি মনে করেছিলেন ? আমরা তোমার সঙ্গে কেবল ঠাট্টা করছিলাম। আর সে—ওকে মারবো না কেন ? ও তো

পথচারিণী। লোকে বউকে ধরে মারে। তাদের চেয়ে ওধরনের মেয়ের ওপর বেশি দয়ার দরকার নিশ্চয়ই নেই। তবুও সেদিনকার আগাগোড়া ব্যাপারটাই ঠাট্টা। বুঝি যে, মার দিলে শিক্ষা দেওয়া হয় না।"

—"তাকে তোমার শেখাবার আছে কি? তুমি তার চেয়ে ভাল কিসে?"

সে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে ঝাঁকি দিয়ে কৌতুক-ভরে বললে, "আমাদের এই শোচনীয় অবস্থায় আমরা কেউ কারো চেয়ে ভাল নয়।"

তারপর হেসে গর্বের সঙ্গে আবার বললে, "ভাই আমি সব জিনিস তলিয়ে বুঝি, সব। আমি কাঠ নই।"

কখন কখন পাভেলের সঙ্গে আমার দেখা হত। সে ছিল তেম্নি স্ফূর্তিবাজ, তার পোশাক ছিল ফুলবাবুর মতো। সে বলতো, "তুমি নিজেকে ওই ধরনের লোকের সঙ্গে মিশে নষ্ট করে ফেলছো। লোকগুলো চাষী ছাড়া আর কিছুই নয়।" তারপর দুঃখের সঙ্গে কারখানার টাটকা খবর দিত। "জিখারেভ এখনও সেই গরুটার সঙ্গে আছে; সিতানভ একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে বেজায় মদ খায়, গোলোভেভকে নেকড়ে বাঘে মেরে ফেলেছে। সে মাতাল হয়ে বাড়ি আসছিল, নেকড়ে বাঘে পথে তাকে মেরে ফেলে।" তারপর হেসে উঠে বলে, "নেকড়েগুলো তাকে মেরে নিজেরাই মাতাল হয়ে ওঠে। তাদের ভারী স্ফূর্তি হয়। তারা সারকাসের কুকুরের মতো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে ঘুরে বেড়ায়। তারপর মারামারি শুরু করে। এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সকলেই মারা যায়।"

তার কথা শুনতে শুনতে আমিও হাসতে থাকি। কিন্তু সেই সঙ্গে অনুভব করতে থাকি যে সেই কারখানা ও সেখানে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করে ছিলাম, সে সব এখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

চিন্তাটা বড় বেদনাদায়ক বোধ হল!

সেই প্রাণহীন শহরটাতে ছিলাম তিন বছর। মনিব আমার ওপর নজর রাখতেন যাতে তাঁর পাঁচ রুবল ঠিকমতো খেটে অর্জন করি। মজুর ও ঠিকাদারেরা নানা দিকে চুরি করে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করতো। কাজটা তারা করতো প্রায় খোলাখুলি। সে বিষয়ে তাদের কিছু বললে, তারা একটুও অসন্তুষ্ট হত না, অবাক হয়ে যেত মাত্র।

মনিব তাদের চুরির কথা জানতেন। বুঝলাম, তাঁর ধারণা ছিল আমিও তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি। যা তাঁর নয় তিনিও তা নিতে ভালোবাসতেন। মেলা বসতো। মেলা ভেঙে গেলে খালি দোকানগুলো দেখতে এসে কখন কখন পেতেন স্যামোভার, কার্পেট, চায়ের সরঞ্জাম বা একজোড়া কাঁচি কি অন্য মালপত্র। মালিক হয়তো সেগুলো নিতে ভুলে গেছে। জিনিসগুলো দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠতো, বলতেন, "জিনিসগুলোর একটা তালিকা করে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

আমি "জিনিসপত্র" ভালোবাসতাম না। সে সব নেবার ইচ্ছাও হত না। এমন কি বইগুলোও আমার কাছে ঠেকতো বোঝার মতো।...

ওসিপ আমাকে বলতো, "কাঠঠোকরা নাগাড় কাঠে ঠোকর দেয়। তবুও সে ভয়ঙ্কর কিছু নয়। কেউ তাকে ভয়

করে না! কিন্তু আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে কোন মঠে যেতে পরামর্শ দিচ্ছি। সেখানে গিয়ে যতদিন না তোমার বয়স হয় থাক। সেখানে সাধুদের সঙ্গে আলাপ করে শান্তি পাবে; সাধুরাও তোমাকে পেয়ে লাভবান হবেন। তোমাকে আমার আন্তরিক পরামর্শ এই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, তুমি সাংসারিক কাজ-কর্মের যোগ্য নও।"

মঠে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। কিন্তু অনুভব করলাম, অজানার মোহন বন্ধনে আমি বন্দী ও বিহ্বল হয়ে পড়েছি। জীবন আমার কাছে ছিল শরতের বনানীর মতো—ব্যাঙের ছাতাগুলো দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেছে। শূন্য অরণ্যে আমার আর কিছু করবার নেই, এবং মনে হত সেখানকার যাকিছু জানবার ছিল জেনে ফেলেছি।

আমি ভদকাই খেতাম না, মেয়েদের সঙ্গেও আমার কোনই সম্পর্ক ছিল না—এই দুটি নেশার স্থান গ্রহণ করে ছিল বই। কিন্তু যতই পড়তাম লোকে যে শূন্য, অকেজো জীবন যাপন করে সেই জীবন আমার পক্ষে হয়ে উঠছিল ততই কঠোর।

তখন আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর কিন্তু কখন কখন আমার নিজেকে মনে হত বয়স্ক লোকের মতো। যে জীবনের মধ্য দিয়ে এসেছিলাম, যা কিছু অধ্যয়ন করেছিলাম, অথবা অস্থির মনে চিন্তা করেছিলাম, যেন সেগুলির ভারে আমি অন্তরে উঠেছিলাম ভারী হয়ে। নিজের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, আমার বহির্জগতের জ্ঞানের আধারটি অন্ধকার কাঠ-রাখবার ঘরের মতো। সেটা নানা রকমের

জিনিসে ঠাসা। সেগুলো সরিয়ে ফেলবার মতো শক্তি বা বুদ্ধি আমার ছিল না।...

দুঃখ, রোগ ও বেদনা আমি কিছুতেই সইতে পারতাম না। যখন নির্মমতা, রক্ত, মারামারি দেখতাম, এমন কি যখন কারো সঙ্গে বচসাও শুনতাম তখন আমার দেহে কেমন এক তিক্ততা জেগে উঠতো। এবং সেটা রূপান্তরিত হয়ে যেতো ক্রোধে। ফলে বন্য পশুর মতো লড়াই করতাম। তার জন্য পরিশেষে অত্যন্ত ব্যথিত লজ্জিত হতাম।

কখন কখন কোন বদমায়েশকে মারবার ইচ্ছা মনে এমন প্রবল হয়ে উঠতো যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মারামারি লাগিয়ে দিতাম। এখনও আমার সেই সব আক্রমণের কথা মনে পড়ে। মন লজ্জায় দুঃখে ভরে ওঠে। সে সব আক্রমণের কারণ ছিল নৈরাশ্য, সে ছিল আমার নিষ্ক্রিয়তা।

আমার মধ্যে ছিল দুটি মানুষ। এক কথায়, একটি ছিল বৈরাগী প্রকৃতির, অপরটি ছিল বীর যোদ্ধা।

সে সময়ে আমার এক শত্রু ছিল, পোক্রোসকি স্ট্রীটের এক গণিকালয়ের দ্বারোয়ান। একদিন সকালে যখন বাজারে যাচ্ছিলাম তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সে তখন বাড়িখানির সামনে যে ছ্যাকরা গাড়িখানি দাঁড়িয়ে ছিল তা থেকে একটি মেয়েকে টেনে নামাচ্ছিল। মেয়েটি ছিল মদে একেবারে বেহুঁস হয়ে। সে তার পা দুখানা ধরে নির্লজ্জের মতো টানছিল। মোজা জোড়া গুটিয়ে গিয়ে মেয়েটির কোমর অবধি হয়ে পড়ে ছিল নগ্ন। তবুও লোকটা টানছিল, রসিকতা করছিল আর হাসছিল। সে তার গায়ে থুথু ফেললে। দেহটি

একটা ঝাঁকি দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে নেমে পড়লো। তার চোখে দৃষ্টি নেই, চুলগুলি বিশৃঙ্খল, মুখখানি হাঁ হয়ে আছে, আর নরম হাত দুখানি এমনভাবে ঝুলছে যেন গ্রন্থিহীন। তার মেরুদণ্ড, ঘাড় ও পাংশু মুখখানি গাড়ির আসনে ও ধাপে ধাক্কা লাগলো। অবশেষে সে পড়ে গেল পেভমেনটের ওপর। মাথাটা ঠুকে গেল পাথরে।

গাড়োয়ান চাবুক ঘুরিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। আর দ্বারোয়ানটা মেয়েটির দুখানি পা দুহাতে ধরে একটু পিছিয়ে গিয়ে তাকে এমনভাবে টেনে নিয়ে চললো যেন সে একটি মৃত দেহ। আমি আত্মসংযম হারিয়ে ফেললাম। লোকটার দিকে গেলাম ছুটে। কিন্তু এমনই কপাল যে ঘটনাচক্রে বৃষ্টির জলের একটা পিপের ওপর গিয়ে পড়লাম। সেটা দ্বারোয়ান ও আমাকে যথেষ্ট অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে বাঁচিয়ে দিলে। আমি তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মরীয়া হয়ে ঘন্টার হাতলটা ধরে দিলাম টান। জনকয়েক রুক্ষ মেজাজী লোক সেখানে এল ছুটে। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হল না। পিপেটা তুলে বসিয়ে চলে এলাম।

পথে গাড়িখানাকে ধরলাম। গাড়োয়ান কোচবাক্সের ওপর থেকে আমার দিকে চোখ নিচু করে তাকিয়ে বললে, "তুমি ওকে একদম কাৎ করে দিয়েছো!"

তাকে রাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, দ্বারোয়ানটাকে মেয়েটার সঙ্গে সে সে-রকমের ব্যবহার করতে দিল কি করে? সে শান্তভাবে উত্তর দিলে,—"আমার কথা, ওরা জাহান্নমে যাক!

ওকে যখন গাড়িতে চড়ায় তখন এক ভদ্রলোক আমাকে ভাড়াটা দিয়েছিলেন। একজন যদি আর একজনকে মারে তাতে আমার কি ?”

—“যদি লোকটা ওকে মেরে ফেলতো ?”

—“আরে তুমিও ও ধরনের মেয়েকে শিগগরিই মেরে ফেলতে শুরু করবে।” যেন সে মাতাল মেয়েদের একেবারে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে !

তারপর থেকে দ্বারোয়ানটাকে প্রায় প্রত্যহই দেখতাম। যখন রাস্তা দিয়ে যেতাম, তখন দেখতাম, সে পেভমেন্ট ঝাঁট দিচ্ছে বা সিঁড়ির ওপর বসে আমার অপেক্ষা করছে। আমি তার দিকে এগোতে থাকলে সে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তিন গুটোতে গুটোতে সহৃদয়তার সঙ্গে বলতো, “আমি তোমাকে ছাতু করে ফেলবো।”

তার বয়স হবে চল্লিশের ওপর ; পা দুখানা ছিল ছোট ও বাঁকা। তার হাত দুখানাও ছিল আমার হাতের চেয়ে ছোট ; ভুঁড়িটা ছিল থলথলে। সে মারামারি করতে পারতো না। দু তিন পাকের পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফটকে হেলান দিয়ে, অত্যন্ত বিস্ময়ে সে বলতো, “আচ্ছা, দাঁড়াও ! দেখাচ্ছি।”

এই সব মারামারি আমার ভাল লাগতো না। একদিন তাকে বললাম, “এই আহাম্মক শোন ! আমাকে এমন বিরক্ত করো কেন ?”

—“তুমি তাহলে মারামারি কর কেন ?”

উত্তরে জিজ্ঞেস করলাম, সে মেয়েটির ওপর অমন খারাপ ব্যবহার করেছিল কেন ?

—"তোমার তাতে কি? তার জন্যে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে।"

—"নিশ্চয়ই।"

সে চুপ করে রইলো। এবং ঠোঁট রগড়ে বললে, "একটা বিড়ালের জন্যে কি তোমার কষ্ট হবে?"

—"হওয়া উচিত।"

—"তুমি আহাম্মক, বদমায়েশ। দাঁড়াও, আমি তোমাকে একটা ব্যাপার দেখাবো।"

সে রাস্তাটা দিয়ে না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। কারণ পথটা ছিল ছোট। লোকটার সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সে জন্য খুব সকালে উঠতে লাগলাম। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই লোকটাকে আবার একদিন দেখতে পেলাম সিঁড়ির ওপর বসে একটা ছাই রঙের বিড়ালকে কোলে রেখে তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। আমি তার কাছ থেকে হাত দশেকের মধ্যে পৌঁছতেই সে লাফ দিয়ে উঠে বিড়ালটার পা ধরে পাথরের প্রাচীরের গায়ে তার মাথাটা আছড়ে ভেঙে ফেললে। তার তপ্ত রক্ত ছিটকে এসে লাগলো আমার গায়ে ও মুখে। তারপর মরা বিড়ালটাকে আমার পায়ের তলায় ছুড়ে ফেলে সে বললে, "এখন?"

আমি আর কি করতে পারি? দুজনে দুটো কুকুরের মতো চত্বরে গড়াতে লাগলাম। তারপর গিয়ে বসলাম একটা ঘাসে ছাওয়া ঢালু জায়গায়। অবর্ণনীয় বেদনায় গিয়েছিলাম পাগল হয়ে। ঠোঁট কামড়ে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে রইলাম। যখন এই ঘটনাটি মনে পড়ে তখন ঘৃণায় শিউরে

উঠি---ভেবে বিস্মিত হই যে, তখন আমি পাগল হয়ে কাউকে খুন করি নি কেন?

এই সব নিরতিশয় ঘৃণ্য ব্যাপার বর্ণনা করছি কেন? হে মহোদয়গণ, যাতে আপনারা জানতে পারেন সে-সব অতীতও নয় এবং সে-সবের শেষও হয় নি। আপনারা বীভৎস, ভীষণ স্বপ্ন পছন্দ করেন। রোমাঞ্চকর গল্পে আপনাদের বড় আনন্দ হয়। যা বিচিত্র, ভয়ঙ্কর তা আপনাদের মনে সুখোন্মাদনা আনে। কিন্তু আমি জানি সত্যকার ভীষণতা ও বীভৎসতা, দৈনন্দিন জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী। এই কাহিনী বলে আপনাদের বেদনায় উত্তেজিত করবার অবিসম্বাদিত অধিকার আমার আছে যাতে আপনাদের মনে পড়ে আমরা কেমনভাবে কি অবস্থায় জীবন যাপন করি। আমাদের জীবন হচ্ছে হীন ও পঙ্কিল। আর এটাই হচ্ছে সত্য।

আমি মানব প্রেমিক। কারোকে দুঃখ দেবার ইচ্ছা আমার নেই। তাই বলে ভাবপ্রবণ হওয়া অথবা রঙ্গিন সত্যের বিচিত্র শব্দে ভীষণ কঠোর শব্দকেও আচ্ছাদিত করে রাখা উচিত নয়। জীবনের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো যাক্! আমাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে যাকিছু মানবতাময় সেগুলিকে নূতন করে নেওয়া প্রয়োজন। সব চেয়ে বেশি করে আমার মাথায় যা ঢুকেছিল তাহা হচ্ছে সাধারণ নারীর প্রতি ব্যবহার। উপন্যাস পাঠে আমি নারীকে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীরূপে দেখতে শিখে ছিলাম। দিদিমাও গল্প বলে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় করে দিয়ে ছিলেন। শত সহস্র চাহনি ও হাসিও আমাকে এ জ্ঞানাহরণে সাহায্য করে ছিল।

সন্ধ্যায় বাজার থেকে ফিরবার পথে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে ভলগা-পারে সূর্যাস্ত দেখতাম। আকাশদিয়ে বয়ে যেত অগ্নি-স্রোত। পার্থিব, প্রিয় নদীটি হয়ে উঠতো গোলাপী ও নীল। এই সব মুহূর্তে কখন কখন ডাঙাকে কয়েদির বজরার মতো দেখাতো যেন একটা শূকরকে একখানি অদৃশ্য জাহাজ অলসভাবে টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু বইয়ে যে সব বিরাট দেশের, নগরের, বিদেশের কাহিনী পাঠ করেছিলাম সে-সব কথাই বেশিকরে ভাবতাম। এই চিন্তা আমার অশান্ত মনকে শান্ত করতো, আমার মনে জাগিয়ে দিতে এক পৃথক জীবনের স্বপ্নময় ছবি।

অনুভব করতাম একদিন এক সরলমতি জ্ঞানীর সঙ্গে আমার দেখা হবে যিনি আমাকে নিয়ে যাবেন আলোকিত প্রশস্ত পথ দিয়ে।

একদিন ক্রেমনের দেওয়ালের পাশে বসে আছি, ইয়াকব-মামা আমার পাশে এসে বসলেন। তাঁকে আমি আসতে দেখিনি এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনতেও পারি নি! একই শহরে দুজনে কয়েক বছর বাস করলেও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হত কদাচিৎ। তাও দৈবাৎ এবং এক পলকমাত্র।

তিনি পরিহাস করে বললেন, "আরে, তুমি কি রকম লম্বা হয়েছো!"

দিদিমার কাছে শুনেছিলাম, তিনি এতকাল ঝগড়া করে ও আলস্যে কাটিয়েছেন। স্থানীয় কারাগারে তিনি সহকারী ওয়ার্ডারের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে গোলমালে তাঁর চাকরিটি যায়।

তাঁর চেহারায় যথেষ্ট বার্ধক্যের ছাপ পড়ে ছিল। তাঁকে দেখাচ্ছিল অপরিচ্ছন্ন ও শীর্ণ। তাঁর সেই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলগুলো হয়ে গিয়েছিল খুব পাতলা, কান দুটো এসেছিল ঠেলে বেরিয়ে। তাঁর চোখের সাদামণিতে ও কামানো গালে ফুটে উঠেছিল মোটা লাল শিরা।

তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কয়েদখানার গল্প হল। দুজনে উঠে গেলাম ভাঁটিখানায়। তিনি কয়েক গ্লাস টেনে খুব চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। চেহারায় দেখা দিল তারুণ্য, কথাবার্তায় ঝরে পড়তে লাগলো স্ফূর্তি। তাকে কয়েদিদের একটি ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বলে উঠলেন, "তুমিও সে কথা শুনেছ ?"

কয়েদিদের নিয়েই তাঁর গোলমাল বেধেছিল। তিনি তাদের কয়েকজনকে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তাদের সঙ্গে জেলের মধ্যেই নাচে-গানের আসর বসাতেন। খানা-পিনা চলতো।

আমার প্রশ্নের উত্তরে চারধার দেখে নিয়ে, স্বর নামিয়ে বললেন, "আমি তাদের বিচারক নই। আমি তাদের দেখতাম মানুষ বলে। তাদের বলি, 'ভাইসব, এস মিলে-মিশে সুখে থাকা যাক্।' তুমি তো জান আমি গান ভালোবাসি। তবে ঐ যে লোকে বলে, আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলাম, তারা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, চুরি করতো, একথা মিথ্যা। ওটা ওরা প্রমাণ করতে পারে নি।"

সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের কথাও বলে গেলেন। শুনে আমার মন বিষাদে ভরে গেল তাঁর। স্ফূর্তিবাজ জীগানকে আমি ভুলতে

পারি নি। মামার শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখের দিতে তাকিয়ে তার কথা মনে উঠলো। ভাবলাম, ওঁর আছে কি জিগানকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হল না।

পরিশেষে তিনি, বললেন, "মনমরা হয়ে থেকো না। তোমার ভাবটা কতকটা ওই রকম। ওটা দূর করে দাও। তুমি ছেলে মানুষ। এখন এই কথাটাই সকলের আগে মনে রাখতে হবে। নিয়তি সুখের কাঁটা নয়। বিদায়। আমি আপসেনে চলে যাচ্ছি।"

আমার স্ফূর্তিবাজ মামাটি কথা-বার্তায় আমাকে আরও বিহ্বল করে গেলেন। আমি হাঁটতে হাঁটতে কাছেরই মাঠে এসে পড়লাম। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। আকাশে ভেসে চলেছে গুরু মেঘভার। তাদের কালো ছায়ায় আমার ছায়াকে মাটি থেকে মুছে ফেলছে। শহর ছাড়িয়ে, মাঠখানি ছাড়িয়ে, এলাম ভলগার তীরে। সেখানে ধূলিধূসর ঘাসের ওপর শুয়ে নিশ্চল ধরণীর বুকে নদী ও প্রান্তরের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ভলগার ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া ধীরে ভেসে যাচ্ছিল। মাঠের বুকে গিয়ে সেগুলোকে দেখাচ্ছিল উজ্জ্বলতর যেন নদীজলে ধৌত হয়েছে। আমার চারধারে সবকিছু আধঘুমে জড়িত ও আবিষ্ট।...

ভাবলাম, "নিজের জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবো।"

ম্লান শারদ দিনে যখন সূর্যকে দেখা যায় না, তার স্পর্শ অনুভব করা যায় না—তার অস্তিত্বও স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়

তেমনি দিনে আমি বহুদিন বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম। রাজপথ ছেড়ে, পায়ে চলা পথের সকল চিহ্ন হারিয়ে ক্লান্ত হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যেতাম সোজা সামনের দিকে; যেতাম পচা, পাতিত গাছগুলোর ওপর দিয়ে, জলাভূমির মাঝে শিথিল টিলাগুলোর পার হয়ে এবং পরিশেষে গিয়ে পড়তাম ঠিক রাস্তাটিতে।

এই ভাবে আমি মনঃস্থির করলাম।

সেই বছরের শরৎকালে গেলাম কাজানে, মনে এই গোপন আশা নিয়ে যে, সেখানে অধ্যয়নের কোন একটা উপায় করতে পারবোই।

শেষ